‘আমি রাসবিহারীকে দেখেছি’

প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী

নারায়ন সান্যাল

‘আমি রাসবিহারীকে দেখেছি’

প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী

নারায়ণ সান্যাল

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

ISBN : 978-81-8437-171-0

প্রথম প্রকাশ ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০ ।। মে ১৯৭৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ বৈশাখ ১৩৮১।। এপ্রিল ১৯৭৪
প্রথম সংস্করণ-(ক) ঃ আষাঢ় ১৩৮৬ ।। জুলাই ১৯৭৯
দ্বিতীয় সংস্করণ-(ক) ঃ বৈশাখ ১৩৯৪ ।। এপ্রিল ১৯৮৭
তৃতীয় মুদ্রণ-(ক) ঃ চৈত্র ১৪০৩ ।। মার্চ ১৯৯৬
তৃতীয় সংস্করণ-(ক) ঃ পৌষ ১৪০৮ ।। জানুয়ারি ২০০২
চতুর্থ মুদ্রণ-(ক) ঃ ভাদ্র ১৪১২ ।। সেপ্টেম্বর ২০০৫
পঞ্চম মুদ্রণ-(ক) ঃ শ্রাবণ ১৪১৯ ।। জুলাই ২০১২

প্রকাশক ঃ
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

লেজার কম্পোজ ঃ
রেজ ডট কম
৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
খালেদ চৌধুরী

অলংকরণ ঃ
সফিউদ্দিন আহমেদ

মুদ্রাকর ঃ
তারকেশ্বর প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কোলকাতা-৬

মূল্য ঃ ১০০.০০

কৈফিয়ৎ

উপন্যাসে এ-যুগে ভূমিকা অচল। জীবনী-গ্রন্থে ভূমিকা লেখার রেওয়াজ আছে। আলোচ্য গ্রন্থ উভচর। এর জাত-নির্ণয় করবেন গ্রন্থাগারিক—কোন আলমারিতে এটি স্থান পাবে তা আমি সকৌতুকে লক্ষ্য করব।

নিঃসন্দেহে এ-গ্রন্থ রচনায় আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছেন ইংরেজ লেখক আর্ভিং স্টোন। তাঁর Lust for Life এবং The Agony and the Ecstacy গ্রন্থ দুটি যথাক্রমে ভ্যান গখ্ এবং মিকেলাঞ্জেলোর তথ্যনির্ভর জীবনী অবলম্বনে উপন্যাস। কিন্তু আর্ভিং স্টোনের একটি সুবিধা ছিল, যা ছিল না আমার। ঐ দুই দিক্‌পাল শিল্পীর পুঙ্খানুপুঙ্খ জীবনেতিহাস পূর্বসূরীরা উত্তর সাধকদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন। বিপ্লবী রাসবিহারীর জীবনে, বিশেষ করে ১৯১৫ পর্যন্ত, সবই কুয়াশায় ঢাকা। সেটাই স্বাভাবিক, বিপ্লবীমাত্রেই নিজের পদচিহ্ন সযত্নে মুছে ফেলতে স্বতই তৎপর। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে চেষ্টা করলে হয়তো অনেক জীবিত বিপ্লবীর কাছে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপর হত—এখন সেটাও অসম্ভব। আলোচ্য গ্রন্থের মাল-মসলা সংগ্রহ করতে আমার তিন বছর সময় লেগেছে, যদিও লিখতে সময় লেগেছে মাত্র এক মাস। এমন সময় গেছে যখন আমি হতাশ হয়ে এ-রচনায় ব্রতী হবার চিন্তা ত্যাগ করেছিলাম। কী করে পুনরায় উৎসাহ ফিরে আসে সে-কথা যথাস্থানে বলেছি। হতাশ হবার একমাত্র কারণ তথ্যের অপ্রতুলতা।

রাসবিহারী সম্বন্ধে আমি ছয়খানি বাঙলা জীবনীর সন্ধান পাই। তার ভিতর তিনটি নিতান্ত চটি বই। বাকি তিনটির একটি—নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বিপ্লবী রাসবিহারী বসু' তাঁর একটি বিশেষ কর্মকাণ্ডের কথা বলেছেন। একটি—অধ্যাপক বিজনবিহারী বসু-র 'কর্মবীর রাসবিহারী' তাঁর বাল্য ও কৈশোর জীবনের অনেক অজানা কাহিনী উৎঘাটিত করেছেন। বিজনবিহারী ছিলেন রাসবিহারীর বৈমাত্রেয় ভাই—কিন্তু তাঁর পরিবেশিত তথ্যের সঙ্গে সুশীলা দেবীর মৌখিক বক্তব্যে যথেষ্ট তফাৎ ছিল—বিশেষত একটি বিষয়ে। আমি সুশীলা দেবীর স্মৃতিচারণকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছি। ছয়খানি জীবনীর মধ্যে পাঁচটির রচনা করেছেন যাঁরা, তাঁরা স্বীকৃত জীবনীকার নন, ফলে অনেক ক্ষেত্রে তথ্যের চেয়ে উচ্ছ্বাসটাই বড় হয়ে উঠেছে। সে দোষ হয়তো আমার এ-গ্রন্থেও থাকল—যদিও আমি ঠিক 'জীবনী' লিখিনি। একমাত্র শ্রীমণি বাগচি-মশায়ের লেখা 'বিপ্লবী রাসবিহারী বসু' গ্রন্থটি প্রকৃত জীবনীকারের রচনা। সাহিত্যের ঐ একটিমাত্র শাখাতেই মূলতঃ বাগচি-মশাই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। ফলে স্বীকৃত-জীবনীকারের লেখা এই গ্রন্থটি তথ্যনিষ্ঠায় আমার দিক্‌দর্শনযন্ত্র হতে পারত; —কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তা হয়নি। বরং এই পুস্তকে পরিবেশিত ভ্রান্তিমূলক তথ্যের জট ছাড়াতে আমাকে রীতিমত বেগ পেতে হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দিই :

১। "এই সুশীলা সম্ভবত তাঁর (রাসবিহারীর) মাসতুতো ভগিনী হবেন, কারণ তাঁর নিজের কোনো সহোদরা ছিল বলে জানা যায় না" (পৃঃ ১৩১)—অত্যন্ত

মর্মপীড়াদায়ক উক্তি। সুশীলা সরকার (বসু) তাঁর একমাত্র সহোদরা ভগিনী। বাগচি-মশায়ের গ্রন্থরচনাকালে তিনি জীবিতা ছিলেন।

২। "তাঁর (রাসবিহারীর) সহচরদের মধ্যে তিনজনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য : যথা—"বিষ্ণু, গণেশ এবং পিংলে। এই তিনজন নির্ভীক সহচর ছিলেন তাঁর বডিগার্ড বা দেহরক্ষী।" (পৃঃ ৯৪)—'বিষ্ণুগণেশ পিংলে' একজন প্রখ্যাত বিপ্লবী। জন্ম—১৮৮৮, ফাঁসি—১৭.১১.১৯১৫। দেশপ্রেমের অপরাধে গোটা মানুষটাকেই ইংরেজ ফাঁসি দিয়েছিল। তাঁকে তিন টুকরা করেনি। মজার কথা, বাগচি-মশাই ওখানেই থামেননি। আমরা দেখলাম, রাসবিহারী কথা-প্রসঙ্গে বাঘা-যতীনকে বলছেন (পৃঃ ৯৫) "যতদিন এই ত্রিমূর্তি আমাকে ঘিরে থাকবে, ততদিন পুলিশের সাধ্য নেই রাসবিহারী বসুর কেশাগ্র স্পর্শ করে।"

৩। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস' একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। তিনি এ বিষয়ে পথিকৃত। বাগচি-মশাই ঐ গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন (পৃঃ ৬২) "এই তারিখটা ভুল। (দিল্লিতে) বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল ১৯১২ সনের ২৫শে ডিসেম্বর।"—সেটাও ভুল!

৪। "রাসবিহারীর অন্যতম সতীর্থ মতিলাল" (পৃঃ ৪৬)। রাসবিহারীর চেয়ে মতিলাল চার বছরের বড় ছিলেন। তাঁরা আদৌ সতীর্থ ছিলেন না।

৫। রাসবিহারী শ্রীশচন্দ্রকে বলছেন, "শ্রীশদা তুমি আনন্দমঠ পড়েছ?" (পৃঃ ৪০)। শ্রীশ বয়সে সামান্য ছোট। দুজনে তুই-তোকারি করতেন। শ্রীশকে রাসবিহারী ডাকতেন 'শিরে' বলে।

৬। "জন্মের অল্পদিন পরেই তিনি মাতৃহীন হন" (পৃঃ ৩২)—'অল্পদিন পরেই' হতে পারে না, কারণ তাঁর সহোদরা সুশীলা দেবী তাঁর চেয়ে দু-বছরের ছোট ছিলেন।

৭। "১৯১৪ সনের শেষভাগে রাসবিহারী লাহোরে উপনীত হলেন"—(পৃঃ ৮৮) হতে পারে না। ১২.১.১৫ তারিখে অমৃতসরের মিটিং-এ মূলা সিং কাশী থেকে রাসবিহারীর পাঞ্জাব আসার রাহা-খরচ বাবদ ৫০০ টাকা শচীন সান্যালকে দেন। ১৫.১.১৫-তেও রাসবিহারী কাশীতে তার প্রমাণ আছে। জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে তিনি অমৃতসরে এবং ৪.২.১৫-তে লাহোরে আসেন।

৮। "লাহোরে দুইমাস থাকিয়া..." (পৃঃ ৮৯)—বস্তুত মাত্র পনের দিন। ৪.২.১৫ থেকে ১৯.২.১৫ পর্যন্ত।

৯। "২৩শে তারিখে, অর্থাৎ বৈপ্লবিক উত্থানের চব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে একটি বোমা সমেত পিংলে ব্যারাকে ধৃত হন" (পৃঃ ৯২)। —পিংলের গ্রেপ্তারের তারিখ ২৩শে মার্চ, বৈপ্লবিক উত্থানের প্রস্তাবিত তারিখ প্রথমে ২১শে ফেব্রুয়ারী, পরে ১৯শে ফেব্রুয়ারী। চব্বিশ ঘণ্টার হিসাব কোথা থেকে এল? তাছাড়া "একটি বোমা" নয়, পিংলের কাছে অন্তত দশটি বোমা ছিল। লাহোর বম্ব-কেশের নথীতে ২৫.৩.১৫ তারিখে দাখিল করা একজিবিট্ [মিস্টার ক্লিভল্যাণ্ড, ডাইরেক্টর জেনারেল অফ ইন্টেলিজেন্স, ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত] দ্রষ্টব্য। বাগচি-মশাই অবশ্য ত্রিমূর্তির বাকি দু-জন বডিগার্ড—'গণেশ' আর 'বিষ্ণু'-র শেষ পর্যন্ত কী হল তা আর পাঠককে জানাননি।

এতকথা বললাম শুধু জানাতে যে, এই সব মাল-মসলা অবলম্বনে রাসবিহারীর জীবনের তথ্যনির্ভর প্রথম পর্যায় লেখা অসম্ভব বিবেচনা করেছিলাম। তবু শেষ পর্যন্ত জাপানী সাংবাদিক বন্ধু য়োকোবরির কথায় এ কার্যে ব্রতী হই। এ-কাজ অসম্ভব হত যদি না ইংরাজী ভাষায় দুটি নিষ্ঠাভরে লেখা বই আমার হাতে আসত। প্রথমটি শ্রীযুক্তা উমা মুখার্জির লেখা "Two Great Indian Revolutionaries"। উচ্ছ্বাস-বিবর্জিত এমন সুন্দর তথ্যনির্ভর জীবনীর বহ্নিশলাকায় রাসবিহারী বৈদূর্য-মণি সমুৎকীর্ণ করা না থাকলে আমার পক্ষে ও রাজ্যে প্রবেশ অসম্ভব হত। উমাদেবীকে আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার। দ্বিতীয় গ্রন্থ—পরমশ্রদ্ধাস্পদ কালীচরণবাবুর কালজয়ী কীর্তি 'The Roll of Honour'। এ ছাড়া কাশীতে সুশীলা দেবী, চন্দননগরে সর্বশ্রী মণীন্দ্রনাথ নায়েক, রেণুকণা ঘোষ, প্রতিমা সিংহ, প্রবর্তক-সঙ্ঘের অরুণচন্দ্র দত্ত অনেক অজানা তথ্য জানিয়েছেন। অরুণবাবু সঙ্ঘের গ্রন্থাগার থেকে অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও নথী দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। পুলিশ-রেকর্ডের সযত্ন-রক্ষিত তথ্য এবং বিভিন্ন মামলার নথীপত্র আমার খুব কাজে লেগেছে। জাতীয় গ্রন্থাগারের অনুজপ্রতিম শ্রীসুভাষ সমাজদার, নির্মাণ পর্ষদের শ্রীহিমাংশু সিংহ এবং শ্রীপরিতোষ রায় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে।

এ-গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি চরিত্র বাস্তব। ফকির-সাহেব, লুইসি এবং ছেদিলাল ছাড়া আর সকলেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনটি নাম আমি সজ্ঞানে সামান্য পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছি। এ-ছাড়া গ্রন্থমধ্যে উল্লেখিত প্রতিটি চরিত্র বাস্তব। জ্ঞাতসারে কোন বাস্তবতথ্য আমি বিকৃত করিনি। বসন্ত বিশ্বাসের গ্রেপ্তারের পটভূমি বিষয়ে মতভেদ আছে। মতান্তরে তিনি পিতৃশ্রাদ্ধের আসর থেকে পালিয়ে এসে কৃষ্ণনগরে ধরা পড়েন, জনৈক আত্মীয়ের বিশ্বাসঘাতকতায়। আমি কালীচরণবাবুর পরিবেশিত তথ্য (The Roll of Honour–p. 235) অনুসরণ করেছি। বস্তুতপক্ষে শিল্পসত্যের উপরে সর্বক্ষেত্রে আমি বাস্তব-তথ্যকে ঠাঁই দিয়েছি—কথাসাহিত্যিকের মনোভূমি নয়, অযোধ্যাই যেন রামের জন্মভূমিরূপে বর্ণিত হয়—এদিকে সর্বক্ষণ আমার সজাগ দৃষ্টি ছিল। তাই প্রথম রচনাকালে কথাসাহিত্যের চিরাচরিত রীতি বর্জন করে পরিশিষ্টে তথ্যসূত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্দেশিকা যুক্ত করেছিলাম—যাতে অনুসন্ধিৎসু এবং গবেষকমনা পাঠক সেগুলি নিজেই যাচাই করে দেখতে পারেন। কাহিনীর খাতিরে অনেক তথ্য আমাকে আগে-পিছে বলতে হয়েছে; পাঠকের যাতে কালভ্রান্তি না হয় তাই তখন পরিশিষ্ট 'গ'-তে ঘটনাপঞ্জী কালানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে দিয়েছিলাম। যাঁরা গবেষণা করতে চান তাঁরা গ্রন্থাগার থেকে প্রথম সংস্করণ সংগ্রহ করে তা যেন করেন। পরবর্তী সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যায় কিছু ভ্রান্তি আছে। এবার ক্রেতা পাঠকের স্বার্থে ওই বৃহৎ পরিশিষ্ট বর্জিত হল।

এ-গ্রন্থে পটক্ষেপণ হয়েছে ১২.৫.১৯১৫ তারিখে। মহাবিপ্লবীর শেষ জীবন সম্বন্ধে জাপান ভ্রমণকালে যে-সব সংবাদ সংগ্রহ করেছি সেগুলি অবলম্বনে একটি পৃথক গ্রন্থ রচনার বাসনা রাখি। অবশ্য সেটা নির্ভর করবে এ-গ্রন্থে বর্ণিত অনারেবল্ জাস্টিস্ কী রায় দেন তার উপর।

পাঠককে আনন্দ দেওয়াই যে এ-গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য নয়,—এ কথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করার প্রয়োজন আছে কি?

নারায়ণ সান্যাল

৮.৪.৭৩

মহানায়ক বিপ্লবী রাসবিহারী বসু

সঙ্ঘগুরু মতিলাল রায়, চন্দননগর, জন্ম ঃ ৬.১.১৮৮২, তিরোধান ঃ ১০.৪.১৯৫৯

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা-যতীন),
জন্ম ঃ কয়াগ্রাম, নদীয়া ৮. ১২. ১৮৮০
শহীদ ঃ বালেশ্বর, উড়িষ্যা ১০. ৯. ১৯১৫

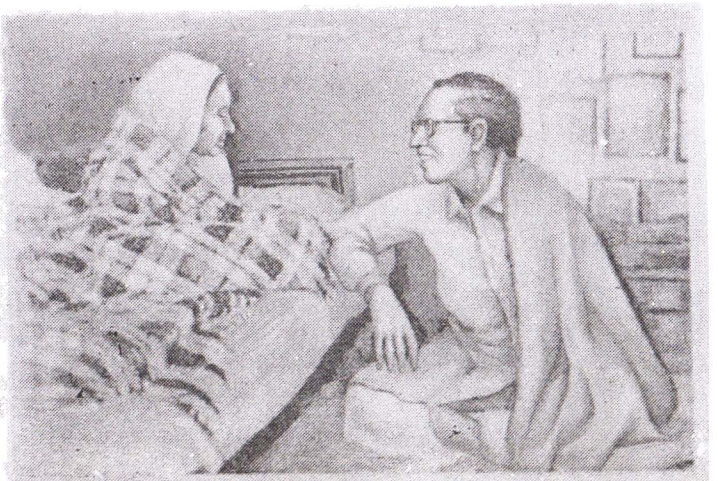

সুশীলা দেবীর সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার —টৌষট্টিঘাট, কাশী। ২৭. ১২. ৭০

শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত এবং শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েক (মাঝখানে)-এর সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার
—প্রবর্তক সঙ্ঘ, চন্দননগর, ২. ৩. ৭৩

অবোধ বিহারী
জন্ম ঃ ১৮৮৯, ফাঁসি ঃ ১৫.৫.১৯১৫

বিষ্ণুগণেশ পিংলে
জন্ম ঃ পুণা, ১৮৮৮, ফাঁসি ঃ ১৭.১১.১৯১৫

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, শেষ জীবনে

রাজা পি. এন. ঠাকুরের ছদ্মবেশে রাসবিহারী

দামোদর চাপেকার
জন্ম ঃ ২৪. ৬. ১৮৬৯
ফাঁসি ঃ ১৮. ৪. ১৮৯

বালকৃষ্ণ চাপেকার
জন্ম ঃ ১৮৭৩
ফাঁসি ঃ ১২. ৫. ১৮৯৯

বাসুদেব চাপেকার
জন্ম ঃ ১৮৮০
ফাঁসি ঃ ৮. ৫. ১৮৯৯

মাস্টার আমীরচাঁদ
জন্ম ঃ ১৮৬৯, ফাঁসি ঃ ৮. ৫. ১৯১৫

অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র রায়, চন্দননগর

শ্রীশচন্দ্র ঘোষের জবানবন্দী

এমন একটা বিচিত্র মামলার সাক্ষী দেবার জন্য আমাকে কেন ডাকা হল তা আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। হ্যাঁ, মামলার বিষয়বস্তুটা আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাকে বলা হয়েছে এটা 'ওয়ানম্যান এনকোয়্যারি কমিশন'। অনারেব্‌ল জাস্টিস্ শ্রীপাঠক একটা এন্‌কোয়্যাবি করতে বসেছেন। আমার বন্ধু রাসবিহারী বোস নাকি উনিশ'শ পঁয়তাল্লিশ সালে একটা আর্জি পেশ করেছিল। ঘটনাটা জাপানে ঘটে। মৃত্যুশয্যায় রাসবিহারী নাকি অন্তিম বাসনা জানিয়েছিল—ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে তার চিতাভস্ম যেন ভারতে এনে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়। ওটুকু মেনে নেওয়া উচিত কি অনুচিত সেটাই বর্তমানে তদন্তের বিষয়বস্তু।

দেখুন, রাসবিহারী আমার বন্ধু; সে আজ থেকে আঠার বছর আগে আদৌ কোন আবেদন করেছিল কিনা আমার তা জানার কথা নয়। তার আগেই আমি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলাম। আমার কাছে ঐ আবেদন একটা 'হেয়ার-সে'। আপনারা বল্‌ছেন তাই শুনছি। সুতরাং ও-বিষয়ে আমার কোন মতামত প্রকাশ করা ঠিক হবে না। তবে শমন-সদন থেকে ফিরে এসে এই কাঠগোড়ায় যখন দাঁড়িয়েছি তখন আমি আমার বক্তব্য নিশ্চয় পেশ করব। আবেদনকারী—যদি আদৌ সে আবেদন করে থাকে—সম্বন্ধে আমি যেটুকু জানি তা আপনাদের জানাব। অনারেব্‌ল্ জাস্টিস্ শ্রীপাঠক যাতে একটা ন্যায়সঙ্গত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারেন—আজ্ঞে হ্যাঁ : 'যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না।'

আমাকে আপনারা চেনেন না। হয়তো নামই শোনেননি। তাতে ক্ষতি নেই—আমার কথা তো এ বিচার্য-মামলার বিষয়বস্তু নয়। যার কথা শুনবার জন্য আমাকে ডাকা হয়েছে সেই রাসুকে, মানে বিপ্লবী রাসবিহারীকে আমি খুব ভালোভাবেই চিনতাম। একেবারে বাল্যকাল থেকে। ও আমার চেয়ে বছর-খানেকের বড় ছিল—সেটা আমি ধর্তব্যের মধ্যেই ধরিনি কোন দিন। ও ছিল আমার 'রাসু', আমি ছিলাম ওর 'শিরে'। আমাদের বন্ধুত্ব সেই প্রাক্‌কষিযুগ থেকে—বলতে পারেন ঘুন্সি-যুগ থেকে! অর্থাৎ মাজায় কষি বাঁধতেও জানতাম না আমরা তখন। রাসুর বাবা বিনোদবিহারী বসু মশাইকে আমি ডাকতাম জ্যেঠামশাই বলে—আসলে সম্পর্কটা ছিল এই রকম : আমার কাকা বামাপদ ঘোষ আর রাসুর বাবা বিনোদবিহারী ছিলেন আপন ভায়রাভাই। পারালা-বিঘাটি গ্রামের নবীনচন্দ্র সিংহ মশায়ের দুটি কন্যাকে দুজনে বিবাহ করেছিলেন। বড় বোন ভুবনেশ্বরী ছিলেন রাসুর গর্ভধারিণী জননী, আর ছোটবোন ব্রজেশ্বরী বা ব্রজসুন্দরী ছিলেন আমার নিজের কাকিমা। বিনোদবিহারীর আদি নিবাস ছিল বর্ধমানের সুবলদহ গ্রামে। দামোদরের ধারে। রাসুর যখন বছর চারেক বয়স তখন ওর মা ভুবনেশ্বরী মারা যান। রাসুর একটি সহোদরা বোনও ছিল—সুশীলা। মাতৃহারা দুটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে বিনোদবিহারী বিপদে পড়লেন। ঐ সময় চন্দননগরের স্বনামধন্য

যোগীন্দ্রনাথ বসু মশায়ের মাধ্যমে বিনোদবিহারী আর বামাপদ চন্দননগর রেল স্টেশনের কাছে ফটকগোড়ায় একলপ্তে একখণ্ড জমি কিনে ফেলেন। দুই ভায়রাভাই একই সঙ্গে চকমেলানো বাড়ি বানালেন। এক অংশ বিনোদবিহারীর অপর অংশ বামাপদর। শেষোক্ত অংশ আবার দুইভাগে বিভক্ত—একদিকে থাকতেন আমার বাবা বিরাজকৃষ্ণ এবং অপর অংশে কাকা বামাপদ। তাই বলি আমাদের বন্ধুত্বটা ঘুন্সি-যুগ থেকে।

বিনোদবিহারী অবশ্য চন্দননগরে থাকতেন না—তিনি সিমলা কমিশরিয়েটের ছাপাখানায় কাজ করতেন। ন'মাসে ছ'মাসে বাঁড়ি আসেন। অল্পবয়সে স্ত্রী-বিয়োগ হওয়ায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন তিনি। চন্দননগরে থাকতেন রাসুর বিমাতা। রাসু আর সুশীলা কখনও কখনও থাকত সুবলদেহে, রাসুর দিদিমণি বিধুমুখীর কাছে। বিধুমুখী বাল্য বিধবা—তিনি ছিলেন রাসুর ঠাকুর্দা কালীচরণ বসু মশায়ের ভ্রাতৃবধূ। ঐ সুবলদহের ভিটেতেই থাকতেন তিনি। রাসুর মা স্বর্গে গেলে ঐ দুটি শিশুকে তিনি বুকে তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু বিনোদবিহারী যখন চন্দননগরে চলে এলেন তখন রাসু আর সুশীলাকেও চলে আসতে হল গ্রাম ছেড়ে শহরে। এবারে ওরা আশ্রয় পেল রাসুর আর এক মাসিমা বামাসুন্দরীর কাছে। বামাসুন্দরীর স্বামী, মানে রাসুর মেসো চন্দননগরেই থাকতেন। তাই ওদের বাল্যকালের অনেকটা অংশ কেটেছে ঐ বামাসুন্দরীর স্নেহচ্ছায়ায়।

অতদিন আগেকার সব কথা আমার স্পষ্ট মনে নেই। আবছা আবছা মনে পড়ে সব কথা। আমাদের বাড়িটা তখনও একতলা। রাসুদের বাড়িটাও তাই। চন্দননগরের স্কুলে ভর্তি হলাম আমরা। রাসু আমার চেয়ে এক ক্লাস উঁচুতে। পড়াশুনায় ওর মন ছিল না। ডানপিটের একশেষ। আমার চেয়ে তার দৈহিক ক্ষমতা ছিল অনেক বেশী। আমি ছিলাম ওর শাগরেদ। মায়ের কথা ওর মনে পড়ত না। মায়ের প্রসঙ্গ উঠলেই ও কেমন যেন নিবে যেত। নতুন-মা সংসারে আসার পর আর কেউই বোস-বাড়ির বড় বউ-এর কথা তুলতেন না—বোধকরি ছোট ছোট দুটি শিশুর কথা ভেবেই। অথবা হয়তো ওঁরা আড়ালে চোখের জল ফেলতেন আমরা জানতে পারতাম না। মোটকথা ভুবনেশ্বরী মুছে গিয়েছিলেন বোসবাড়ি থেকে।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলি : মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর তো আটদশখানি জীবনী আছে—কিন্তু আপনারা কোথাও তার গর্ভধারিণী জননীর নামটা দেখেছেন? আমি তো দেখিনি। মাত্র আঠার বছর বয়সে তিনি দু-কুড়ি সাতের খেলা শেষ করে ওপারে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর নামটা সবাই ভুলে গেছে; কিন্তু ঐ আঠেরোটি বসন্তের ভিতরেই তিনি এমন একটা কাজ করে গিয়েছিলেন যা কোটি কোটি ভারতীয় নারী যুগ যুগ ধরে পারেনি—তিনি রাসবিহারীকে এনে দিয়েছিলেন এই পৃথিবীতে। আজ আপনারা তাঁর নামটা প্রথম শুনলেন হয়তো,—আমি তো ছাপার অক্ষরে তাঁর নামটা ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি—তা সে যাই হোক, তাঁকে প্রণাম করুন—তিনি ভুবনেশ্বরী দেবী! আমি তাঁকে—না, আমার কথা থাক। আপনারা রাসবিহারীর কথা শুনতে চান, আমার কথা নয়।

কোথা থেকে শুরু করি? আচ্ছা, ১৯৯৪-এর একটি দিনের কথা বলি :

কলেজের দিকে যতই এগিয়ে আসছেন ততই গতি শ্লথ হয়ে আসছিল বামাপদর। ফটকগোড়ার বাড়ি থেকে ডুপ্লে কলেজ বড়জোর আধঘন্টার পথ। অন্তত বামাপদ যে দ্রুতগতিতে হাঁটতে অভ্যস্ত তাতে আধঘন্টার ভিতরই তাঁর লক্ষ্যস্থানে পৌঁছানোর কথা; কিন্তু যতই কলেজের কাছে এগিয়ে আসছেন ততই যেন তাঁর পদযুগল দেহভার বইতে চাইছে না। ক্লান্তি তাঁর দৈহিক নয়, মানসিক। ঐ ডুপ্লে কলেজের অধ্যক্ষ চারুচন্দ্রের মুখোমুখি দাঁড়াবার

সাহস তিনি মনে মনে সঞ্চার করে উঠতে পারছিলেন না। মা বোড়াইচণ্ডী জানেন—বাঁদরটা আসলে কী করেছে! বিনোদদার যেমন কাণ্ড! নিজে দিব্যি বিদেশে চাকরি করছেন, আর তাঁকে করে গেছেন ঐ ডানপিটে ডাকাতটার লোকাল গার্জেন! অপরাধ করল একজন আর সমন পেলেন ছা-পোষা মানুষ ঐ বামাপদ! যত্ত সব!

ফটকগোড়া থেকে বাগবাজার পর্যন্ত হন্‌হন্ করে চলে এসেছিলেন মনে মনে বাঁদরটার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে করতে। অরলেয়াঁ দুর্গের কাছাকাছি আসতেই উৎসাহ নিভে এল তাঁর। রু দ্য বেনারস-এর [গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের যে অংশ ফরাসী চন্দননগরের অন্তর্ভুক্ত সে-আমলে তার নাম ছিল 'রু দ্য বেনারস।'] কাছে ডাইনে মোড় নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন কলেজের দিকে। বারোদুয়ারী ক্লক টাওয়ারের কাছে মুখটা উঁচু করে দেখলেন—সাড়ে দশটা বাজে। এতক্ষণে ছাত্ররা সবাই যে-যার ক্লাসে বসে পড়েছে। অধ্যক্ষ চারুচন্দ্রকে বামাপদ ইতিপূর্বেও দেখেছেন—কলেজে, সুহৃদ সম্মিলিনীর সভাতে—একাধিকবার। রাশভারী লোক। তাঁর চরিত্রে কী যেন একটা আছে যাতে তাঁর চোখে চোখ রেখে কথা বলা যায় না। মনে হয় লোকটা অনেক দূরে, অনেক উঁচুতে। সে দূরত্ব শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞান গরিমারই শুধু নয়, সে দূরত্ব ব্যক্তিত্বের। কতই বা বয়স চারুবাবুর? বছর পঁয়ত্রিশ হবে, অর্থাৎ বামাপদর চেয়ে বছর পাঁচ-সাত বেশী হতে পারে। কিন্তু তফাত তো বয়সের নয়, তফাতটা—

ডুপ্লে-কলেজে এফ. এ. ক্লাস পর্যন্ত পড়ানো হয় বলে গৌরবে ওর নাম কলেজ। প্রায় বছর চল্লিশ আগে চন্দননগরের বুকের উপর এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনা করেছিলেন ফাদার বার্থ। সে-আমলে এর নাম ছিল Ecol de Santa Maria। মাতা মেরীর নামে উৎসর্গীকৃত এই বিদ্যায়তনের পরিচালনভার পাদরীদের হাত থেকে ফরাসী সরকার গ্রহণ করেছিলেন বছর কুড়ি আগে। সদাশয় ফরাসী সরকার সে-সময় এর নাম পরিবর্তন করে নূতন নামকরণ করেন Ecol des Garcon—ছেলেদের স্কুল। তারও চৌদ্দ বছর পর, মাত্র তিন বছর আগে—যে বছর ঐ বাঁদরটা এখানে এসে ভর্তি হল, অর্থাৎ ১৯০১ সালে সরকার এই স্কুলে এফ. এ. ক্লাস খুললেন। ফলে স্কুল হল কলেজ। তার নাম হল ডুপ্লে কলেজ। অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র রায় তখন থেকেই আছেন এ কলেজের কর্ণধার হয়ে। বোধকরি আজ সকালে আমার ঐ পূজ্যপাদ কাকামশায়ের মস্তক চর্বণ করতে।

ডেপুটি ডাইরেক্টারের ঘরের সামনে টুলে বসে আছেন একজন ভোজপুরী দারোয়ান। বামাপদ চন্দননগরেরই বাসিন্দা। তিনি জানেন ডেপুটি ডাইরেক্টার শব্দের অর্থ প্রিন্সিপাল। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন চান্সেলারকে খুঁজে পাওয়া যাবে না—ভাইস-চান্সেলারই সেখানে সব রকম ভার্চু ভাইস-এর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—এখানে তেমনি এই ডেপুটি-ডাইরেক্টারই সর্বেসর্বা। ডাইরেক্টার আছেন খাতা-কলমে—তিনি ফরাসী চন্দননগরের ডাইরেক্টার জেনারেল কাম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। বর্তমানে অর্থাৎ এই ১৯০৪ সালে যিনি হচ্ছেন ডক্টর মারাত্রে। চারুচন্দ্র হচ্ছেন কলেজের ডেপুটি-ডাইরেক্টার অর্থাৎ প্রিন্সিপাল। এক-চিলতে কাগজে বামাপদর নাম লিখে নিয়ে দারোয়ানটি ভিতরে খবর দিতে গেল এবং পরমুহূর্তেই ফিরে এসে পর্দাটা উঁচু করে ধরে বললে—যাইয়ে!

বামাপদ শেষবারের মত কোঁচার খুঁটে মুখটা মুছে নিয়ে ছাতাটা বগলদাবা করে গুটি গুটি ভিতরে প্রবেশ করেন এবং যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বলেন—নমস্কার স্যার! আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?

প্রকাণ্ড টেবিলের অপর প্রান্তে বসে আছেন অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র রায়। সোনালী চশমার

ভিতর দিয়ে এক জোড়া মর্মভেদী দৃষ্টি। কি একটা কাগজে লিখছিলেন তিনি। কলমটা চেয়ারের দিকে নির্দেশ করে শুধু বলেন—বসুন।

উপবেশন তো নয়, চেয়ারের যূপকাষ্ঠে আত্মদান করলেন বামাপদ।

কলমটা রেখে চারুচন্দ্র প্রশ্ন করেন, রাসবিহারী আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র?

বামাপদ তৎক্ষণাৎ অপরাধ অস্বীকার করে বলেন,—না, স্যার!

—না? কিন্তু সে তো আপনারই ওয়ার্ড?

ওয়ার্ড! ওয়ার্ড কি? বামাপদ তাঁর সীমিত ইংরাজি জ্ঞানের লগিতে আর একবাঁও পান না। 'ওয়ার্ড' মানে কি ভাইপো? হাত দুটি গরুড়পক্ষীর ভঙ্গিতে একত্র করে বামাপদ নির্বাক রইলেন। টানা পাখার ক্যাঁচকোঁচ শব্দটা মুখর হয়ে উঠল,। চারুচন্দ্র চশমাজোড়া নাক থেকে খুলে টেবিলের উপর রাখতে রাখতে বললেন, বলছিলাম কি, আপনিই তো তার লোকাল গার্জেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তা বলতে পারেন।

—অথচ সে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র নয়?

—আজ্ঞে না। শিরে হচ্ছে আমার আপন ভাইপো।

—শ্রীশচন্দ্রের কথা হচ্ছে না। রাসবিহারী আপনার কে হয়?

—রাসুর বাপ আমার ভায়রাভাই।

চারুচন্দ্র চশমাজোড়া আবার নাকের উপর চড়াতে চড়াতে বলেন, কিছু মনে করবেন না বামাপদবাবু, ঐ 'শিরে,' 'রাসু' প্রভৃতি শব্দগুলো আপনারা ব্যবহার না করলেই আমি খুশী হব। বালক-মনে নিজের নামের উপর একটা মমতা থাকে, নামের মর্যাদা রাখতে মানুষে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেয়, জানেন তো? মানে পিতৃদত্তনামের ভিতরেই শিশুরা একটা ব্যঞ্জনা খুঁজে পায়। সেগুলির অপভ্রংশ করলে সেই ব্যঞ্জনাটা হারিয়ে যায়। এবিষয়ে লংফেলোর একটি ভারি সুন্দর কথা আছে—'A torn jacket is soon mended, but hard words and names may bruise the heart of a child beyond repairs.'

বামাপদ মনে মনে বাঁদরটার উর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষের শ্রাদ্ধায়োজন করতে করতে প্রকাশ্যে হাসি মুখে বলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, সে তো বটেই। বলছিলাম কি, ঐ শ্রীমান রাসবিহারীর পূজ্যপাদ পিতৃদেব শ্রীযুক্ত বিনোদ হচ্ছেন আমার ভায়রাভাই! পারলা-বিঘাটি গ্রামের শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র সিংহ মশায়ের দুটি কন্যাকে আমরা দুজন বিবাহ করেছিলাম। ফলে শ্রীমান রাসবিহারীর মেসোমশাই হই আমি।

—বুঝলাম। তা বিনোদবিহারী মশাই কোথায়? ছাত্রের পিতা?

তিনি সিমলা কমিশেরিয়েটে ছাপাখানায় চাকরি করেন। এখানে থাকেন না। তাঁর পিতৃদেব অর্থাৎ শ্রীমান রাসবিহারীর পিতামহ শ্রীযুক্ত কালীচরণ বসু মশাই অবশ্য বর্তমান; কিন্তু তিনি বৃদ্ধ—অধিকাংশ সময়ে ওঁদের দেশ সুবলদহে থাকেন। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে লোকাল গার্জেন করা হয়েছে।

—ও আপনার বাড়িতেই থাকে?

—না। ও থাকে ওর মাসীমার বাড়ি।

—তা আপনিই তো তার মেসোমশাই। মাসীমার বাড়ি তো আপনারই বাড়ি?

—আজ্ঞে না। সে অন্য একজন মেসোমশাই।

—বুঝলাম। তা রাসবিহারীকে সঙ্গে করে আসতে বলেছিলাম যে! একা এসেছেন কেন?

বামাপদ গলাটা সাফা করে নিয়ে বলেন, কি করব বলুন? কাল স্কুল ছুটির পর থেকে রাসু, মানে ঐ শ্রীমান রাসবিহারী বেমালুম নিরুদ্দেশ!

চারুচন্দ্র একটু চঞ্চল হয়ে পড়েছেন মনে হল। তবু সংযত হয়ে সংক্ষেপে বললেন, রাসবিহারীকে এ কলেজে আমি রাখতে পারব না বামাপদবাবু। তার বাবাকে আপনি জানিয়ে দিন। এখান থেকে ওর নাম কাটিয়ে দেওয়া হবে।

একটা ঢোক গিলে বামাপদ বলেন—সে কী করেছে?

—ইতিহাসের শিক্ষক কামালুদ্দীন চৌধুরী সাহেবকে প্রহার করেছে!

বামাপদ স্তম্ভিত! বাঁদরটা যে একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে এটা আশঙ্কা করাই ছিল। না-হলে ছাত্রের লোকাল-গার্জেন সমন পেতেন না। হতভাগা ছেলেটা সারা রাত বাড়ি ফেরেনি শুনেও বুঝেছিলেন অপরাধ রীতিমত গুরুতর; কিন্তু সেটা যে এমন আকাশচুম্বী হতে পারে তা ছিল বামাপদর দুঃস্বপ্নেরও অগোচর। তিনি দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন করতে পারলেন না।

—বুঝলেন? ওর বাবাকে আপনি চিঠি লিখে জানিয়ে দিন। মিড সেশানে এখন অন্যত্র ভর্তি হতেও পারবে না। একটা বছর নষ্ট হল ওর।

বামাপদর মনে হল লোকাল গার্জেন হিসাবে একবার প্রিন্সিপালের দয়া ভিক্ষা করা শোভন হবে। চারুবাবুর কথার মধ্যেও যেন একটা ইঙ্গিত রয়েছে যে, ছাত্রটির গোটা বৎসরটা লোকসান করানো তাঁর মনঃপূত নয় তাই একবার শেষ চেষ্টা করেন ঃ ওকে অন্য কোন শাস্তি দেওয়া যায় না স্যার?

—কি করে দেব? সে তো এলোই না আপনার সঙ্গে?

—তবু ও যে নিতান্ত ছেলেমানুষ।

—ছেলেমানুষ সম্বন্ধে ঐটাই শেষ কথা বলে আমি মানি না।

বামাপদ হালে পানি পান না। বলেন ঃ আজ্ঞে?

—When you say, 'Boys will be boys' you forget to add, 'Boys will be men!'

অগত্যা উঠে পড়েন বামাপদ। করজোড়ে বলেন, তাহলে চলি স্যার!

—না, বসুন। আচ্ছা, রাসবিহারীর বাড়িতে ব্যবহার কেমন? মা-ভাই বোনের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে?

—ওর মা নেই, এক সহোদরা ভগ্নী আছে, সুশি—মানে শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী। আর বৈমাত্রেয় এক ভাই আছে ঘেঁটু.....মাপ করবেন, সে নিতান্ত শিশু, তার পিতৃদত্ত ব্যঞ্জন-ওয়ালা নামটা আমার ঠিক স্মরণ হচ্ছে না এখন.....

চারুচন্দ্র একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন বোধ হয়। বললেন, মা নেই, বাপ বিদেশে, মানুষ হচ্ছে মাসির বাড়ি? অথচ সেই মাসি আপনার স্ত্রী নন?

—আজ্ঞে না। আমি হচ্ছি ওর আপন মেসো। ও আছে ওর বিমাতার বোন বামাসুন্দরীর কাছে।

—বুঝলাম। তা এদের সঙ্গে সে কেমন ব্যবহার করে? বিমাতার সঙ্গে, ভাইবোনের সঙ্গে, পরিবারের অন্যান্য গুরুজনের সঙ্গে তার ব্যবহারটা কেমন?

বামাপদ এতক্ষণে বিষোদ্গার করবার সুযোগ পান। বলেন—অতি হারামজাদা বকাটে ছোকরা স্যার! পড়াশুনার নামগন্ধ নেই! দিনরাত্তির শুধু বদমায়েসি করে বেড়ায়। এর গাছের আম, ওর গাছের লিচু, তার পুকুরের মাছ। নিজের তো পরকালটি ঝরঝরে, এখন

শিরেটাকে শেষ করছে। ওকে আর শোধরানো যাবে না।

ম্লান হেসে চারুচন্দ্র বললেন : বুঝলাম! আপনার কথা থেকে বেশ বুঝতে পাবছি the heart has been bruised beyond repairs!

—আজ্ঞে হ্যাঁ! একেবারে beyond repairs!

—আচ্ছা! এবার আসুন আপনি।

যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বেরিয়ে আসেন বামাপদ এবং ঘরের বাইরে এসেই দেখেন শ্রীমান শিরে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছে। ওঁকে বাইরে আসতে দেখেই ঘনিয়ে এসে বলে—রাসু এসেছে কাকা।

—কই?

—ঐ যে!

হ্যাঁ, থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে রাসু, রাসবিহারী। এক মাথা অবিন্যস্ত ঝাঁকড়া চুল, হাঁটু পর্যন্ত ধুলোর প্রলেপ, রাত্রি জাগরণে চোখ দুটো টকটকে লাল। বামাপদ বিরাশি-সিক্কা ওজনের একটি থাপ্পড় বসানোর শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে হাতটা তুলেছিলেন, কিন্তু মাঝপথেই থেমে পড়তে হল তাঁকে। পিছন থেকে শুনলেন বজ্রগম্ভীর নির্ঘোষ : ওকে ভিতরে নিয়ে আসুন।

পর্দা সরিয়ে স্বয়ং চারুচন্দ্র বের হয়ে এসেছেন। বোধকরি শ্রীশের কণ্ঠস্বর কানে গিয়েছিল তাঁর।

প্রিন্সিপ্যালের ঘরের ভিতর। বামাপদ পুনরায় বসে পড়েছেন তাঁর আসনে। চারুচন্দ্র তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারে। শ্রীশচন্দ্র পর্দার ওপারে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর অধ্যক্ষের টেবিল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সতের বছরের একটি সতেজ শালের চারা, অপরাধী স্বয়ং। চওড়া কাঁধ, পুষ্ট হাতের গুলি, বোতামহীন কামিজের তলায় অধোবাস নেই, দেখা যাচ্ছে বুকের পাটা। হঠাৎ দেখলে বয়সের তুলনায় তাকে বেশি বড় মনে হয়। চোখ দুটি উজ্জ্বল। সর্বাবয়বে একটা দার্ঢ্য, একটা উদ্ধত ভঙ্গিমা। বর্তমানে সে অপরাধীর মত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে বটে, যেন তবু ওর চরিত্রগত সেই দার্ঢ্য ঢাকা পড়েনি।

টানা পাখার একঘেয়ে আওয়াজ ছাড়া চরাচর স্তব্ধ। হঠাৎ বজ্রগম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করেন চারুচন্দ্র—কামালুদ্দীন সাহেবের গায়ে হাত তুলেছ কেন?

আয়ত দুটি চোখ তুলে কিশোর পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখল চারুচন্দ্রের দিকে। পরক্ষণেই আনত হয়ে পড়ে তার দৃষ্টি। অস্ফুটস্বরে বলে : আমি তো তাঁর গায়ে হাত তুলিনি স্যার?

—না, হাত তোলনি। তাঁর হাত থেকে বেতটা কেড়ে নিয়েছিলে শুধু!

মৌনতা যদি সম্মতির লক্ষণ হয়, তবে বলতে হবে অভিযোগটা অপরাধী স্বীকার করে নিল।

—এবং তাঁব গায়ে কালি ঢেলে দিয়েছিলে!

এবার আবার ও মুখটা তোলে। আবার অস্ফুটে বলে : দূর থেকে স্যার!

চারুচন্দ্র এবার ভাষা হারিয়ে ফেলেন। ইংরাজি ছাড়া ফার্স্ট আর্টস্ ক্লাসে তিনি লজিকের ক্লাস নেন। গায়ে হাত না-তোলার যে যুক্তি ঐ ছেলেটি এইমাত্র পেশ করেছে তা ভাববার। শিক্ষকের নির্দেশমত সে ডান হাতটা পেতে দিয়েছিল। প্রথম বেতটা পড়তেই সে সেটা চট করে ধরে ফেলে এবং কেড়ে নেয়। অতঃপর দূর থেকে কালির দোয়াতটা পূজ্যপাদ

মাস্টারমশায়ের পিরান লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিয়ে সে ক্লাস ছেড়ে চলে যায়। সারা রাত তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। এবং আজ সকালে এসে সওয়াল করছে : দূর থেকে স্যার!

না। ভক্তিভাজন শিক্ষকের গাত্রস্পর্শ করার কোন এভিডেন্স নেই। কিন্তু চারুচন্দ্রও চারুচন্দ্র। মুহূর্তপরে তিনি পুনরায় বজ্রগম্ভীর স্বরে বলেন—দূর থেকেই বা তুমি কালির দোয়াতটা ওঁর গায়ে ছুঁড়ে মারলে কেন?

রাসবিহারী এবার নিরুত্তর।

—কী হল? জবাব দাও! বল, তোমার কী বলার আছে?

—উনি স্যার, আমাকে রাসভ বলেন কেন?

—কী বলেন?

—রাসভ! উনি বরাবর আমাকে ডাকেন রাসভ বলে।

চারুচন্দ্র বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, ক্লাসে এত ছেলে থাকতে তোমার নামটাই বা উনি বিকৃত করেন কেন, তা বলতে পার?

—না স্যার, এটা ওঁর স্বভাব। উনি সবাইকে অমন বিশ্রী নামে ডাকেন। মকরকেতনকে ডাকেন মর্কট বলে, অংশুমানকে ডাকেন অনড়ান বলে, বারীন্দ্রকে ডাকেন বাঁদরেন্দ্র বলে—

চারুচন্দ্র চশমাজোড়া চোখ থেকে খুলে কাচটা মুছতে থাকেন।

বামাপদ সুযোগ পেয়ে এতক্ষণে ফোড়ন কাটেন, এটা কিন্তু ঠিক নয় স্যার! শিশুমনে পিতৃদত্ত নামের একটা ইয়ে থাকে—কি-বলে-ভাল, একটা ব্যঞ্জন.....

চারুচন্দ্র বিনা চশমাতেই তাঁর দিকে একবার মর্মভেদী দৃষ্টিতে তাকালেন। বামাপদর সব গুলিয়ে গেল। চারুচন্দ্র চশমাজোড়া নাকে চড়িয়ে অপরাধীর দিকে ফিরে বলেন : তাই বলে তুমি ওঁর গায়ে কালি ঢেলে দেবে?

রাসবিহারী এতক্ষণে সহজভাবে বলে : শুধু সেজন্য তো নয় স্যার। উনি বাঙালী জাতটাকেই অপমান করেছেন। তাই আমার মাথার ঠিক ছিল না।

চারুচন্দ্র একটু ঝুঁকে পড়েন সামনের দিকে—কী বললে? বাঙালী জাতটাকে অপমান করেছেন, মানে?

—উনি বললেন, মাত্র সতেরজন অশ্বারোহী নিয়ে বক্‌তিয়ার খিলিজি এদেশ জয় করেছিল—কারণ বাঙালীরা সব ভেড়ুয়া ছিল! এ কী বিশ্বাসযোগ্য!

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারুচন্দ্র দেখছিলেন অপরাধী কিশোরটিকে। বললেন, তাই তো লেখা আছে ইতিহাসে।

—ও তো স্যার, যারা জিতেছিল তাদের লেখা ইতিহাস।

উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছেন তীক্ষ্ণধী চারুচন্দ্র! বলেন, কিন্তু কামালুদ্দীন সাহেবও তো বাঙালী। তিনি মিছিমিছি কেন স্বজাতের অপমান করবেন?

রাসবিহারী অবাক হয়ে বলে : কামালুদ্দীন স্যার বাঙালী?

—নয়? পাঁচ-পুরুষে তিনি তো এই হুগলী জেলাতেই বাস করছেন বলে শুনেছি। হুগলী জেলাটা এই বাংলাদেশে, তা জান তো?

এবার আর রাসবিহারী হালে পানি পায় না। চারুচন্দ্রের যুক্তিতে একটা ফাঁক আছে, প্রকাণ্ড ফাঁক—কিন্তু সেটা যে কী, তা ঐ কিশোর বয়সী অপরাধী ধরতে পারে না।

চারুচন্দ্র বলেন, তুমি রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা' পড়েছ?

—না স্যার।

—রমেশচন্দ্রের নাম শুনেছ?

—হ্যাঁ স্যার। তাঁর মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত, রাজপুত জীবনসন্ধ্যা পড়েছি.....

—আচ্ছা! বঙ্কিমের কী কী বই পড়েছ?

ফৌজদারী আদালতের অভিজ্ঞতা ভাল রকমই ছিল বামাপদর। এইখানে তাঁর মনে হল ফটকগোড়ার বিখ্যাত ক্রিমিনাল ল-ইয়ার রায়সাহেব অটলবিহারী সরকার মশায় যদি ঐ সময়ে চারুচন্দ্রের ঘরে উপস্থিত থাকতেন তবে তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে হাঁকাড় পাড়তেন। অব্‌জেকশান ইয়োর অনার! বিচার্য-মামলার সঙ্গে সহযোগী পাবলিক প্রসিকিউটারের এ প্রশ্ন সম্পর্কবিমুক্ত—সুতরাং প্রশ্ন অবৈধ! এবং বিচারক বলতেন : অবজেকশান সাসটেইনড্! কিন্তু এখানে সেসব কিছুই হল না। বিচার্য-মামলার সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে চারুচন্দ্র অনেকগুলি প্রশ্ন পেশ করলেন। সূত্রটি খুঁজে বামাপদ যখন পুনরায় মামলার সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে চারুচন্দ্র অনেকগুলি প্রশ্ন পেশ করলেন। সূত্রটি খুঁজে বামাপদ যখন পুনরায় মামলার .....I mean এ পর্যন্ত যত বই পড়েছ তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কোনখানি?

বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে অপরাধী বললে : আনন্দমঠ।

বিচারক এবার আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠেন। এ উত্তরের মধ্যে কী অন্যায় স্বীকারোক্তি ছিল বামাপদ তা আন্দাজ করে উঠতে পারেন না—কিন্তু মনে হল চারুচন্দ্র অপরাধীর দিকে এক পা এগিয়ে এলেন। তারপর কি ভেবে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। ও পাশে গিয়ে একটা কাঠের আলমারি খুলে বার করে আনেন মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো একটি বই। অপরাধীর দিকে সেটা বাড়িয়ে ধরে গম্ভীর স্বরে বলেন, বইটা আজ সমস্ত দিনে পড়ে শেষ কর। রমেশচন্দ্রের 'বঙ্গবিজেতা'। সন্ধ্যাবেলায় সুহৃদ সম্মিলনীতে এসে বইটা আমাকে ফেরত দেবে এবং তখন আমাকে বলবে, তোমার কৃতকর্মের জন্য তুমি কামালুদ্দীন সাহেবের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত আছ কি না।

রাসবিহারী বইটা বগলদাবা করে বললে, আমি ক্লাস করব না?

—না! তুমি যতক্ষণ তোমার শিক্ষকের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা না চাইছ ততক্ষণ তোমাকে ক্লাসে বসতে দেওয়া হবে না। এবার তুমি যাও!

মামলা অ্যাডজর্ন হয়েছে বুঝে বামাপদ উঠে পড়েন। রাসবিহারী বোধ হয় সেটা বুঝতে পারেনি। বলে, সুহৃদ সম্মিলনী কোথায়? আমি চিনি না।

চারুচন্দ্র একই রকম বজ্রনির্ঘোষে বললেন, আমি ডিরেক্‌শান দিয়ে দিচ্ছি। এইঘর থেকে বেরিয়েই বাঁ দিকে মোড় নেবে। দেখবে বাঁ-দিকের চৌকাঠ ধরে তোমার ভাই শ্রীশচন্দ্র থামের আড়ালে লুকিয়ে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা কর, সে তোমাকে নিয়ে আসবে সুহৃদ সম্মিলনীতে। সে চেনে।

বামাপদ দোদুল্যমান পর্দাটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন একবার। অধ্যক্ষ চারুচন্দ্রের মত রনৎজেন-সাহেবের রশ্মির রেশ যদি তাঁরও দৃষ্টিতে থাকত তাহলে দেখতে পেতেন পর্দার ও-প্রান্তে তাঁর এই অধম ভ্রাতুষ্পুত্রটি একেবারে মা কালিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আধহাত জিব বার হয়ে পড়েছে তার!

সন্ধ্যার একটু আগে বইখানা বগলদাবা করে রাসু এল সুহৃদ সম্মিলনীতে। সঙ্গে আছে শ্রীমান শ্রীশচন্দ্র। সূর্য যেদিন মেঘের আড়ালে সেদিন রাসুভায়ার ছায়াটা আর তার নাগাল

পায় না, পথ হারিয়ে ফেলে। এদিক থেকে তার মন্ত্রশিষ্য 'শিরে' রাসবিহারীর ছায়াটার উপর তুরুপের টেক্কা ঝেড়েছে। আকাশ মেঘলা থাক আর না থাক শিরে সেঁটে আছে বাসুর সঙ্গে। ফটকগোড়া থেকে কথা বলতে বলতে ওরা দুজন আসছিল সুহৃদ সম্মিলনীতে। শ্রীশের কাছ থেকে রাসু জেনে নিয়েছিল এই সুহৃদ সম্মিলনীতে ছেলেরা ব্যায়াম করে, এখানে সুন্দর একটি লাইব্রেরী আছে। শ্রীশ ওখানে প্রায়ই আসে। ওরা বলে, 'আখড়া'। তা সেই আখড়ার গেটটা পার হয়ে প্রাঙ্গণে পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে রাসবিহারী। হঠাৎ তার নজরে পড়ে লাইব্রেরীর উঠানে একটা বিশ্রী মারামারি হচ্ছে। বছর কুড়ি-বাইশের একজন বলিষ্ঠ যুবক একটি শ্যামবর্ণ কিশোরকে ধরে বেধড়ক ঠেঙাচ্ছে। দু-জনেরই মালকোচা সাঁটা ধুতি, খালি গা, হাতে চামড়ার দস্তানা। মার খাচ্ছে যে ছেলেটি সে শ্রীশের বয়সী, মানে বছর পনের বয়স। দু-হাতে সে নিজের মুখটা আড়াল করতে চাইছে। আর তার প্রহারকর্তা ঐ ধেড়ে ছেলেটা নির্মমভাবে ঘুষি মেরে চলেছে। আশ্চর্য! আশেপাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে কোথায় তারা মারামারিটা বন্ধ করবে—তা নয় হিহি করে হাসছে, আর মজা দেখছে। স্থান কাল মুহূর্তে হারিয়ে গেল রাসবিহারীর। কী সূত্রে এই মারামারি, ছোট ছেলেটির কী অপরাধ তা জানবার জন্য কোন প্রশ্নই জাগল না ওর মনে। অসহায় মার-খানেওয়ালা আর একজন উদ্ধত মারনেওয়ালা! বাঁধানো বইটা সে বিদ্যুৎগতিতে গছিয়ে দিল শ্রীশের হাতে এবং পরমুহূর্তে একটা হুঙ্কার দিয়ে সে লাফিয়ে পড়ল মল্লভূমে : এ্যাই! খবরদার!

সঙ্গে সঙ্গে বিরাশি-সিক্কা ওজনের একটা ঘুষি গিয়ে লাগল ঐ বড় ছেলেটির চোয়ালে। যুবকটি তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়াল। সাধারণ যে কোন মানুষ রাসুর সে ঘুষি হজম করতে পারত না, মাটি নিত—কিন্তু ঐ যুবকটি যেন একটা অসুর। এতবড় ঘুষি খেয়েও সে ভারসাম্য হারায়নি। একটা টাল খেয়ে রাসবিহারীর দিকে ফিরল। বয়সে সে রাসুর চেয়ে বছর পাঁচ ছয় বড় হবে, মাথাতেও এক বিঘৎ লম্বা, স্বাস্থ্যও তার ভাল; কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে বসে রাসবিহারীর সে সব খেয়ালই নেই। তার চোখের সামনে থেকে তখন দুনিয়া মুছে গেছে। কালবৈশাখীর শিলাবৃষ্টির মত সে মুষলধারে কীল চড়-ঘুষি বর্ষণ করে চলেছে তার প্রতিপক্ষের উপর। কিন্তু আশ্চর্য! ঐ অসতর্ক প্রথম আঘাতটি ছাড়া একটাও তার প্রতিপক্ষের গায়ে লাগল না। ইতিমধ্যে চার পাঁচ জন এসে জড়িয়ে ধরেছে রাসুকে।

—কী ব্যাপার হে! এমন বেমক্কা খেপে গেলে কেন তুমি? ভিড়ের মাঝে কে যেন প্রশ্ন করে।

রাসু এক ঝট্‌কায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তার প্রতিপক্ষ ঐ যুবকটিকে কঠিন স্বরে প্রশ্ন করে—ওকে অমনভাবে মারছেন কেন? ছোট ছেলে পেয়ে?

যুবকটি জবাব দেয় না। দস্তানা খুলে সে নিজ চিবুকে হাত বুলাচ্ছিল।

এবার এগিয়ে আসে ঐ শ্যামবর্ণ ছেলেটি, যে মার খাচ্ছিল এতক্ষণ। একগাল হেসে বলে, ইয়ে, উনি আমাকে মারছিলেন না মোটেই! আমরা বক্সিং শিখছিলাম।

আমি খিলখিল করে হেসে উঠি।

রাসুভায়া চারিদিকে তাকিয়ে দেখে। তার চোয়ালে আঘাত লাগেনি, তবু তার চোয়ালের নিম্নাংশটা ঝুলে পড়ে। বেচারা একেবারে নিবে যায়।

যুবকটি বলে, তোমার ঘুষির জোর আছে হে ছোকরা!

রাসবিহারী আমতা আমতা করে বলে, ছি ছি, আমি একেবারে বুঝতে পারিনি। আমাকে মাপ করবেন।

যুবকটি উঠে দাঁড়ায়। বলে—ওটি হচ্ছে না। ওটা আমার ধাতে নেই। আমার নাম নরেন বাঁড়ুজ্জে। মার খেয়ে হজম করতে শিখিনি। নাও হে, গ্লাভস্-জোড়া পরে নাও। ঐ আণ্ডারকাট্‌টার জবাব তোমাকে নিতে হবে!

রাসবিহারী মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে বলে, কিন্তু আমি তো বক্সিং জানি না!

—ন্যাকামি কর না! এখনও চোয়ালটা টনটন করছে। নাও—

গ্লাভস্-জোড়া এগিয়ে দেয়। রাসবিহারীর আত্মসম্মানে লাগে বোধহয়। বলে, আমি লাঠি ধরতে রাজি আছি। বক্সিং আমি জানি না। লাঠি ধরবেন?

যুবক জবাব দেবার আগেই এ-পাশ থেকে কে যেন ভারি গলায় বলে ওঠে, ঠিক হ্যায় নরিনবাবু! হামি দেখছি ছোকরাকে—

নরেন্দ্র বলেন, বেশ তুমিই দেখ মূর্তজা! শির নেওয়া চাই কিন্তু। ওকে হাসপাতাল পৌঁছে দিয়ে বাড়ি যাব একেবারে।

রাসু এপাশে ফিরে দেখে একজন দশাসই জোয়ান দাঁড়িয়ে আছে হাসি হাসি মুখে! হাতে তার প্রমাণ মাপের একখানা তেলপাকা লাঠি! ঊর্ধ্বাঙ্গে হাতকাটা কামিজ, নিম্নাঙ্গে ব্রিচেস ধরনের পোশাক। টকটকে ফর্সা রঙ, মাথার চুলগুলো সোনালী। লোকটা কে, রাসু জানত না।

ও না জানুক, আমি জানতাম। ও হচ্ছে মূর্তজা! দুর্দান্ত লাঠিয়াল! তখন অবশ্য আমিও জানতাম না—এই মূর্তজাই ভবিষ্যতে হবে ঢাকা-অনুশীলন দলের দেশবিখ্যাত লাঠিয়াল পুলিন দাসের গুরু; তবে এটুকু জানতাম যে মাস্টারমশাই, মানে অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের লাঠির উপর প্রবন্ধ পড়ার পর ওকে আমদানি করেছেন এই আখড়ায়—আমাদের লাঠিখেলা শেখানোর জন্য। রাসু লাঠি খেলা যত্ন নিয়ে শিখেছিল, কিন্তু তাই বলে একজন প্রফেশনাল ট্রেনারের বিরুদ্ধে! তায় নরেনদা একেবারে নিদান হেঁকে বসলেন—রাসুকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি যাবেন! আমার হাত পা হিম হয়ে এল!

রাসুর কিন্তু কোন ভাবান্তর নেই। পিরানটা সে খুলে ফেলল। মাল কোঁচা দিয়ে সাঁটাল ধুতিটা। আমি একপা এগিয়ে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলাম, নরেনদা আমার ঘাড়টা ধরে সরিয়ে আনলেন। পরমুহূর্তে একটা তেলপাকা লাঠি বাড়িয়ে ধরলেন রাসুর দিকে, নাও ধর।

অকুতোভয়ে রাসু দাঁড়ালো তার প্রতিপক্ষের সামনে।

নরেন্দ্রনাথ হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন : সামাল হো!

শুরু হয়ে যায় লাঠি খেলা! মিনিটখানেকের ভিতরেই বুঝতে পারলাম যে, রাসুও অনুধাবন করেছে—দুর্ধর্ষ লাঠিয়ালের সামনে উপস্থিত হয়েছে সে আজ। কিন্তু লাঠি যারা চালায় তারা মন্ত্রশক্তিতে কাজ করে চলে। রাসবিহারীর মুখে আতঙ্কের কোন চিহ্ন দেখলাম না। দুর্বার গতিতে সে উপর্যুপরি আঘাত করে চলেছে মূর্তজার গায়ে। রাসবিহারী তার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ক্রমশঃ বুঝতে পারল তার প্রতিপক্ষের চতুর্দিকে ঘূর্ণ্যমান লাঠির এক ইন্দ্রজাল! মিনিট তিনচার ক্রমাগত যষ্টিবর্ষণ করে এবং একবারও ওর গাত্র স্পর্শমাত্র না করতে পেরে রাসবিহারী থমকে দাঁড়ায়। মূর্তজা এতক্ষণে একবারও আক্রমণ করেনি। ক্রমাগত আত্মরক্ষা করে গেছে শুধু। যে মুহূর্তে রাসবিহারী দম নিতে থামল ঠিক সেই মুহূর্তেই হুঙ্কার দিয়ে উঠল মূর্তজা : অব লেও ভাইসাব!

—রাম-দো-তিন!

রাসবিহারীর বাঁ-কাঁধে, দক্ষিণ বাহুমূলে এবং সবশেষে মাথায় লাগল লাঠির ছোঁওয়া

ভীমবেগে নেমে এল প্রতিটি আঘাত, কিন্তু রাসুর দেহ স্পর্শ করল তেলপাকা লাঠি নয়, অবনঠাকুরের তুলি! মাথায় লাঠিটা এসে ওর ঢেউ খেলানো চুলে আলতো করে ছোঁওয়া মাত্র দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল লাঠিটা মুর্তজা। হুঙ্কার দিয়ে উঠল : ফতে!!

না। মুর্তজা আঘাত করেনি একবারও। সে শুধু দেখিয়ে দিল কিভাবে লাঠি ধরতে হয়। দুহাতে রাসবিহারীকে জড়িয়ে ধরে বললে, শাব্বাশ! কোন্ ওস্তাদের কাছে লাঠি ধরতে শিখেছ হে?

— আমার ঠাকুরদার কাছে!

—তাজ্জব! তা তুমি এবার থেকে রোজ এখানে আসবে তো? তাহলে তোমাকে আমি পয়লা-নম্বর লাঠিয়াল করে ছেড়ে দেব। তোমার কব্জির জোর আছে। চাই অভ্যাস, চাই সাধনা!

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে রাসবিহারী—আলবৎ!

শ্যামবর্ণ ছেলেটি এগিয়ে এসে বললে, তুমি ...তোম রাসবিহারী আছ, তাই নয়?

রাসবিহারী ওর ঐ খাজা বাংলা শুনে একটু ঘাবড়ে গেল। ওকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে : আছি!

এ-পাশ থেকে আমি খিলখিল করে হেসে উঠি। কানাইকে বলি, এই কানাই 'You are Rashbehari?'-র বাংলা 'তুমি তো রাসবিহারী?' বুঝলে? 'Are' এর বাঙলা 'আছ' বলতে নেই, বুঝেছ?

তারপর রাসুর দিকে ফিরে বলি—ও হচ্ছে কানাই। রোড-সাকিমের সরিষাপাড়া গলিটা যেখানে রু দ্য বেনারসে পড়েছে সেখানে ওদের বাড়ি। দত্ত বাড়ির ছেলে। একেবারে ছেলেবেলায় বাপের সঙ্গে বোম্বাই চলে গিয়েছিল। এবছরই ও ভর্তি হয়েছে আমাদের ক্লাসে। ইংরেজি খুব ভাল জানে, কিন্তু বাংলা জানে না।

কানাই বলে, তোর চেয়ে ভাল বাংলা জানি, বুঝেছিস?

ফলে আমি হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙে দিই। বলি, রাসু, ওর কীর্তি শুনবি? স্যার ট্রানস্লেশান করতে দিয়েছিল—"বিখ্যাত একটি নগরীর উপকণ্ঠে এই বিজন বন।" কানাই তার উত্তরে লিখেছিল—"This forest called Vijana was at the outskire of the renowned city named Ekatee.!"

সবাই অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে।

কানাই সলজ্জে বলে—এখন আর অমন ভুল করি না আমি।

রাসবিহারী বলে, আমি প্রথমটা বুঝতেই পারিনি হে, তোমরা আপসে লড়ছ!

নরেন্দ্রনাথ বলেন, তা কিছু না বুঝেই অমন বেমক্কা আণ্ডারকাট্‌টা ঝাড়লে?

রাসবিহারী পুনরায় সসঙ্কোচে বলে, আমাকে মাপ করবেন।

নরেন্দ্রনাথও পুনরায় বলন, মাপ করা আমার ধাতে নেই, তোমাকে আগেই বলেছি। নেহাত মুর্তজা তোমার শির-তমেচা দুইই নিয়েছে, টেক্‌নিক্যালি তুমি এখন হাসপাতালে, তাই তোমাকে আজ ছেড়ে দিলাম।

কানাই বলে, উনি আমাদের নরেনদা, বক্সিং শেখান। উপীনদার নাম শুনেছ তো? উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়? উনি তাঁর ছোট ভাই।

—কে উপীনদা?—প্রশ্ন করে রাসু।

—বাঃ! উপীনদা একজন বিখ্যাত—!

তারপর নরেন্দ্রনাথের দিকে চোখ পড়ায় ঢোক গিলে কানাই চুপ করে যায়।

—উপীনদা একজন বিখ্যাত কী? প্রশ্ন করে রাসবিহারী।

কানাই ইতস্তত করে। নরেন্দ্রনাথ এগিয়ে এসে রাসবিহারীর কাঁধে একখানা হাত রেখে বলেন, অত সহজে উপীনদার পরিচয় পাওয়া যায় না ভাই। আজ তো তুমি আখড়ায় প্রথম এলে। দু-চারদিন এখানে যাতায়াত কর। বক্সিং শেখ, লাঠিখেলা শেখ, কুস্তি শেখ,—তারপর একদিন তাঁর পরিচয় পাবে।

রাসবিহারী গম্ভীর হয়ে গেল।

কানাই যেন কী একটা ভুল করে ফেলেছে। প্রসঙ্গটা চাপা দিতে তাড়াতাড়ি নরেনদাকে বলে, রাসবিহারী আপনাকে আণ্ডারকাট্ ঝেড়েছে বলে আপনিও কিন্তু মনে মনে রাগ পুষে রাখবেন না। ও আমাদের কিন্তু প্রকাণ্ড একটা উপকার করেছে।

নরেন্দ্রনাথ বলেন, কিন্তু তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি এইমাত্র রাসবিহারীকে চিনলে, সে কেমন করে—

কথাটা শেষ করতে দেয় না কানাই। বলে ওঠে—কামালুদ্দীন-স্যার ক্লাসে এসে আমাকে আজ ডাকলেন 'বাবা-কানাই' বলে। আমি তো স্টান্ট!

—কেন তাজ্জব কেন? কানাইকে তো 'কানাই' বলেই ডাকার কথা।

কানাই বলে, আপনি জানেন না তাই বলছেন। কামালুদ্দীন-স্যার কাউকে নাম ধরে ডাকেন না। আমাকে এতদিন ডেকে এসেছেন ' কেন্নো' বলে। শিরের কাছে শুনলাম, আজ সকালে রাসবিহারী নাকি হেড-স্যারের কাছে কমপ্লেন করেছে। হেড-স্যার ওঁকে কি বলেছেন জানি না। তারপর থেকেই উনি আমাকে ডাকছেন—'বাবা কানাই'!

হোহো করে হেসে ওঠে রাসবিহারী।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। যারা ব্যায়াম করছিল তারা জামা কাপড় পরে একে একে চলে যেতে থাকে। আকন্দের ঝোপে জোনাকি পোকা জ্বলছে। আর ঝাঁক ঝাঁক মশার দল এসে মাথার উপর চক্রাকারে পাক খেতে থাকে। কী মশা ছিল তখন চন্দননগরে! যারা গায়ে কালো বা রঙিন জামা চড়িয়েছে তাদের মাথার উপরেই ওরা বেশী করে জমে। আখড়া ক্রমশঃ খালি হয়ে আসছে। মাঠের ওপাশে শেয়াল ডেকে উঠল। মূর্তজা যাবার আগে রাসুর পিঠে একটা থাপ্পড় মেরে বললে, কাল ফিন আনা!

নরেন্দ্রনাথও বিদায় নিলেন। লাইব্রেরীতে লণ্ঠন জ্বলল। ডিরেক্টার জেনারেলের তোষাখানা থেকে ভেসে এল পেটা-ঘন্টার আওয়াজ। পর পর ছয়টা।

রাসবিহারী বললে,—হেড-স্যার সন্ধ্যাবেলা এখানে আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই তো এলেন না।

কানাই বলে, তিনি ভুলে যাননি, তাবলে। আমাকে খবর পাঠিয়েছেন তোমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতে। তাঁকে একটা জরুরী মিটিং-এ যেতে হয়েছে বলে উনি আজ সুহৃদ-সম্মিলনীর আখড়ায় আসতে পারেননি। না হলে রোজ আসেন। চল যাই।

রাসু বলে, তোমাকে কষ্ট করতে হবে না ভাই। ওঁর বাড়ি আমি চিনি।

—না, সন্ধ্যাবেলা উনি আমাকে বাংলা পড়ান। আমি রোজই যাই।

অতঃপর রাসু, কানাই আর আমি চলতে থাকি মাস্টার মহাশয়ের বাড়ি।

অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র রায়। ঐ আর একজন মানুষ! ওঁর কথাও তোমরা জান না বোধহয়, না? নামই শোননি। কিংবা শুনেছ—বিপ্লবীযুগের কোন ইতিহাসে হয়তো পড়েছ ১৯১০

সালে যখন অরবিন্দ চন্দননগরে আশ্রয়ভিক্ষা করতে আসেন তখন তাঁকে আশ্রয় দিতে উনি স্বীকৃত হননি। হ্যাঁ, ঠিক কথা। কিন্তু তার কারণটা কী তোমরা জান? ঠিক তার আগেই চারুচন্দ্রের পরিবারের উপর দিয়ে কী প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় বয়ে গিয়েছিল সে খবর তোমরা রাখ? সদ্যমুক্ত চারুচন্দ্র তখন নূতন করে জীবন শুরু করতে চেয়েছিলেন। ঐ প্রত্যাখ্যানটুকুই তাঁর জীবনের শেষ কথা নয়, যেমন নয় যুধিষ্ঠিরের 'ইতিগজ' অনৃতভাষণ। আমি তো তাতে মাস্টারমশায়ের দোষের কিছু দেখি না। যেমন বিপ্লবী অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় একবার পুলিশের তাড়া খেয়ে অনেক দিন পরে ফরাসী পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে আশ্রয় নিতে গিয়েছিলেন। সেবার স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দও তাঁকে আশ্রয় দিতে রাজি হননি। তাতে তিলমাত্র ক্ষুব্ধ হননি অমরেন্দ্র। অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র ছিলেন চন্দননগরের বিপ্লব-জাহ্নবীর ভগীরথ। নিজ হাতে তিনি কানাইকে বন্দুক ছোঁড়া শিখিয়েছিলেন। চন্দননগর বিপ্লবীদের আদিগুরু—

নাঃ! উল্টোপাল্টা বকতে শুরু করেছি! কী বলছিলাম? হ্যাঁ, আমরা তিনজনে পথে নামলাম। পথে নেমে রাসু কানাইকে প্রশ্ন করে, তুমি ছেলেবেলা থেকে বুঝি বোম্বাইতে ছিলে?

—হ্যাঁ, তবে বোম্বাই নয়, পুণায়। সেখানে আর্য মিশনে পড়তাম।

—প্লেগের হিড়িক তাহলে তুমি দেখেছ?

—দেখি নি আবার? বাপরে!

—পুণার চাপেকার-ব্রাদার্স-এর নাম শুনেছ তুমি? দামোদর হরি চাপেকার?

পথের মাঝখানেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কানাই। সন্ধানী দুটি চোখের দৃষ্টি মেলে দিয়ে বলে, ও নাম তুমি কোথায় শুনলে?

আমি তখনও ও-নামটা শুনিনি। কানাই এ-ভাবে কেন চমকে উঠল বুঝলাম না। রাসু হেসে বলে, তোমাদের আখড়ায় আজ আমি প্রথম আসছি, তাই উপীনদা কী কারণে বিখ্যাত তা সঠিক জানি না, আন্দাজ করতে পারি মাত্র। কিন্তু তাই বলে দামোদর আর বালকৃষ্ণ চাপেকারের নাম জানব না?

আমি প্রশ্ন করি, ওঁরা কে ভাই?

আমার সে-প্রশ্নে ওরা কর্ণপাত করে না। রাসু বলে, ওদের দেখেছ?

—তা কেমন করে দেখব? দুজনেরই যখন ফাঁসী হয়েছে তখন আমার বয়স বছর দশেক। তবে আমাদের ক্লাসের একটি ছেলে ওদের গল্প করত। আমি সব জানি।

—ক্লাসের ছেলে? মারাঠী?

—হ্যাঁ, সেও আমার সঙ্গে আর্য মিশনে পড়ত, পুণায়। আমারই বয়সী। ভারী তেজী ছেলে। পড়াশুনাতেও খুব ভাল, ক্লাসে ফার্স্ট হ'ত পিংলে।

—পিংলে?—আমি হেসে ফেলি, বলি, 'পিংলে-পটাস?'

—না। ছেলেটার স্বাস্থ্যও ছিল ভাল। পুরো নাম বিষ্ণুগণেশ পিংলে। সেই আমাকে বলেছিল চাপেকার ব্রাদার্সের কথা। তুমি দামোদর আর বালকৃষ্ণের কথাই শুধু বললে। বাসুদেবের কথা তো বললে না রাসবিহারী?

—বাসুদেব? ও নামটা তো জানি না আমি। তার কথা বলবে?

—বলব। কারণ আমার আদর্শ ঐ দামোদর আর বালকৃষ্ণ নয়, আমার হিরো ঐ সর্বকনিষ্ঠ কিশোর—বাসুদেব!

সেজবাতির সামনে খালি গায়ে বসে চারুচন্দ্র কী একখানা ফরাসী গ্রন্থ পড়ছিলেন। আমাদের দেখে বইটা রেখে অভ্যর্থনা করেন, হ্যালো, এথোস, পোর্থোস অ্যাণ্ড অ্যারেমিস। হোসার্স ডা'-টাগ্ নান্?

আমরা তিন বন্ধু মুখ তাকাতাকি করি। প্রণাম করতেও ভুলে যাই। মাস্টারমশাই বইটা দেখিয়ে বলেন, আলেকজাণ্ডার ডুমার 'থ্রি মাস্কোটিয়ার্স' পড়ছিলাম—গ্র্যাণ্ড বই! একদিন তোমাদের গল্পটা বলব। দারুণ জমাটি গল্প!

ইনি এখন দু-নম্বর চারুচন্দ্র!

আনন্দমঠের মঁায়ের মত চারুচন্দ্রের তিন ভাবমূর্তি। একনম্বর চারুচন্দ্রকে যদি দেখতে চাও, চলে যাও ডুপ্লে কলেজে। সেখানে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকানো যায় না। রাশভারী, গম্ভীর, কড়া মেজাজী অ্যাডমিনিস্ট্রেটর! পান থেকে সেখানে চুন খস্‌বে না। অথচ ওঁর বৈঠকখানায় অথবা সুহৃদ সম্মিলনীর আখড়ায় এস; সেখানে দেখতে পাবে দু-নম্বর চারুচন্দ্রকে। সেখানে তিনি প্রাণবন্ত, উচ্ছল, হাসিখুশি—কথায় কথায় দরাজ-গলায় অট্টহাস্য। আমাদের মধ্যে যাদের ষোড়শবর্ষ বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটেছে তাদের তিনি বন্ধু সেখানে। এ-ছাড়া ছিলেন আর একজন—তিন নম্বর চারুচন্দ্র। তাঁকে সবাই চিনত না—দু-চারজন জানত মাত্র! তাঁকে দেখা যেত শিকারের আসরে। বাছা বাছা কয়েকটি শিষ্যকে নিয়ে মাঝে মাঝে তিনি নৌকা করে শিকারে যেতেন। বেলেহাঁস স্নাইপ আর চোখাচোখী-পাড়া সেদিন সরগরম হয়ে উঠত। সেখানে সেই তিন নম্বর চারুচন্দ্রের রূপ আমি স্বচক্ষে দেখিনি—কানাই দেখেছিল। সেখানে তিনি নাকি ছাত্রদের ঘাড়ে হাত দিয়ে আড্ডা মারতেন। ঐ শিকার ছিল তাঁর সাপ্তাহান্তিক ব্যসন—বিশেষ বিশেষ কয়েকটি শিষ্যের কাছে। তখনও আমরা জানতাম না, তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল শিকারের অছিলায় বাছা বাছা ক'জনের বন্দুকের নিশানা ঠিক করে দেওয়া। ঐ তিন নম্বর চারুচন্দ্রের কাছে টার্গেট প্র্যাক্‌টিশ করা না থাকলে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কানাইয়ের পিস্তলও লক্ষ্যভ্রষ্ট হত— যেমন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল আমাদের সত্যেন। কিন্তু কানাইয়ের তা হয়নি। সার্জেন্ট বজ্রমুষ্টিতে হাত চেপে ধরা সত্ত্বেও অব্যর্থ সন্ধানী লক্ষ্যে কানাই সেদিন নরেন গোঁসাইকে—

আহ্! আবার উল্টোপাল্টা বক্‌ছি!

রাসবিহারী মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো বইটি বাড়িয়ে ধরে। সেটা নেড়েচেড়ে দেখে চারুচন্দ্র বলেন, ব্যাপার কি? পড়েছ বলে তো মনে হচ্ছে না?

—না স্যার, পড়েছি। আদ্যোপান্ত সবটা।

—কিন্তু শাস্ত্রবাক্য তাহলে মিলছে না কেন? উদ্ভটসাগর বলেছেন, 'লেখনী পুস্তিকা জায়া পরহস্ত গতং হতা। যদি সা পুনরায়াতি ভ্রষ্টানষ্টাচমর্দিতা।'

আমাদের তিন জনের সংস্কৃত জ্ঞান ঐ—'নরঃ নরৌ নরাঃ' পর্যন্ত। বোকার মত তাকিয়ে থাকি। মাস্টারমশাই বলেন, অস্যার্থ ঃ

কলম কেতাব কবিপ্রিয়া ধার দিও না কাউকে ভাই।
ধার দিলে আর ফিরে আসার কোন রকম চ্যান্সই নাই॥
নেহাত যদি ঘরে ফেরেন, দেখবে কয়লা হলেন ছাই॥

বলেই ছাত ফাটানো অট্টহাস্য। আমরাও হেসে উঠি।

আবার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলেন, হাসছ কেন? ও, ঐ 'ভ্রষ্টানষ্টাচর্মিদিতা' সমাসবদ্ধ পদটার অনুবাদ করলুম না বলে? তোমরা নেহাত চ্যাঙড়া-বাচ্চা বলে তার আক্ষরিক অনুবাদ করিনি।

এতক্ষণে আমরা বুঝেছি। কান লাল হয়ে ওঠে আমাদের।

—বস, বস, তোমরা। তা আজ কী পাঠ হবে আমাদের, শ্রীমান কেন্নো?

কানাই চমকে উঠে বলে, আমার ও নামটা কেমন করে জানলেন স্যার?

—জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার প্রথম খোঁচাটা মেরেছিলেন শ্রীমান রাসভ। পরে অনুসন্ধান করে সবই জেনেছি। সে যাই হোক—Jokes apart আজ কী পড়ার কথা?

—আগের দিন বলেছিলেন, আজ নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' শুরু করবেন।

—Exactly! পলাশীর যুদ্ধ। তবে কোন ক্ল্যাসিক্যাল লিটারেচার স্টাডি করতে হলে, বুঝলে কানাই, সেই সাহিত্য-কর্মকে হিস্‌টরিক্যালি, জিওগ্রাফিক্যালি এবং ক্রনোলজিক্যাল প্রথমে এস্‌ট্যাব্‌লিস্‌ করতে হবে। আমি আজ প্রথমে তোমাদের এই মহাকাব্য, মানে এপিক-এর পটভূমিকাটা বুঝিয়ে বলি।

এ ভাষায় চারুচন্দ্র সচরাচর কথা বলতেন না। পরে বুঝেছি, কানাই ছেলেবেলা থেকে মহারাষ্ট্রে মানুষ হওয়ায় উনি ঐ খিচুড়ি ভাষাতেই ওকে পড়াতেন। ক্রমে ক্রমে ইংরাজি শব্দ কমিয়ে উনি কানাইকে পুরোপুরি বাঙালি করে তুলেছিলেন।

এমনি অদ্ভুত মানুষ ছিলেন চারুচন্দ্র। তিল তিল করে মুছে গেল হাস্য পরিহাসের আসর। নিবিড় হয়ে ঘনিয়ে এল ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণ। হারিয়ে গেলাম চারজন। সেজবাতিজ্বলা সন্ধ্যায় তরুণ পণ্ডিতের সামনে বসা তিনটি কিশোর তাঁর হাত ধরে পেছিয়ে গেল দেড়শ বছর। গঙ্গা পার হয়ে ওপারের শ্যামনগর—জগদ্দল—নবদ্বীপকে পিছনে ফেলে আমরা উত্তরে আরও উত্তরে যেতে যেতে অবশেষে উপনীত হলাম মুর্শিদাবাদে, পলাশীর আমবাগানে। ফরাসী চন্দননগরের সেই স্তব্ধ সন্ধ্যাটি মুহুর্মুহু কামান গর্জনে সচকিত হয়ে উঠল। মীরজাফর—উমিচাঁদ—রাজবল্লভ—রায়দুর্লভের ষড়যন্ত্রজালে একদিকে রুদ্ধ হয়ে এল শ্বাস, অপরদিকে মৃত্যুঞ্জয়ী মীরমদন মোহনলালের আত্মবলিদানে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আমাদের চোখ। ডিরেক্টার-জেনারেলের তোষাখানার পেটা-ঘড়িতে যখন রাত আটটার ঘন্টা বাজল ততক্ষণে পলাশীর প্রান্তরে স্বাধীন ভারতের শেষ স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হয়েছে। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। মাস্টার মশায়ের গলা ধরে এল—যেন সেই সন্ধ্যার পূরবীর তান ভেসে এল আমাদের মনে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করলেন কথক। চারিদিক থেকে আমাদের ঘিরে ধরল সান্ধ্য নৈঃশব্দ্য!

ইতিমধ্যে একটি বিধবা মেয়ে, চারুচন্দ্রের পাচিকাই হবেন বোধ হয়, আমাদের সামনে একটা রেকাবিতে গুটি দশেক নারকেল নাড়ু রেখে গিয়েছিলেন, ঝক্‌ঝকে কাঁসার গ্লাসে খাবার জল। আমরা গল্পে এমন তন্ময় হয়েছিলাম যে খেয়াল করিনি। চারুচন্দ্র এবার থালাটা আমাদের দিকে ঠেলে দিয়ে বলেন, Let's now celebrate the victory of our conqueror!

নিজেও একটি তুলে মুখে দিলেন।

আমি নেবার জন্য হাত বাড়িয়েছি কথাটা শুনে হাতটা টেনে নিলাম।

হঠাৎ চারুচন্দ্র বললেন Boys! Now tell me frankly, তোমরা তিনজনে যদি সেদিন সেই পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধ শেষে উপস্থিত থাকতে, তাহলে কী করতে?

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি কানাইয়ের চোখ দুটো জ্বলছে। একদৃষ্টে সে তাকিয়ে আছে মাস্টারমশায়ের দিকে। পলক পড়ছে না তার চোখে। সেজবাতির আলোয় তার চশমার কাচটা চক্‌চক্‌ করছে। আর রাসু বসে আছে, মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টি। সাড়া নেই তারও। আমি আর স্থির থাকতে পারিনি। বলে উঠলাম, আমি স্যার, ক্লাইভের কাছে জীবন্ত ধরা দিতাম

না! যুদ্ধে নিঃশেষে হেরে গেছি জানলে আমি আত্মহত্যা করতাম! ঐ মীরমদন মোহনলালের সঙ্গী হতাম!

চারুচন্দ্র এবার তাকালেন কানাই-এর দিকে : আর তুমি? কানাই?

ধক্ করে জ্বলে উঠল কানাইয়ের চোখ দুটো। দাঁতে দাঁতে চেপে সে বললে, আমি স্যার, আমার বন্দুকের শেষ গুলিটা ওভাবে অপব্যয় করতাম না। সেটা নিয়েই ফিরে আসতাম মুর্শিদাবাদে, যতদিন না মীরজাফরের সাক্ষাৎ পেতাম, গুলিটা জিইয়ে রাখতাম!

চারুচন্দ্র হাসলেন। তারপর ফিরলেন রাসবিহারীর দিকে। সে তখনও মাটির দিকে তাকিয়ে বসে আছে। মাস্টারমশায়ের চোখে চোখ রাখতে পারছে না। একটু যেন চঞ্চল হয়ে পড়েছে।

—And lastly you? রাসবিহারী! তোমার কী মন্তব্য?

রাসু চট করে উঠে দাঁড়ায়। হাত দুটি জোড় করে বলে, আমি স্যার কামালুদ্দীন-স্যারের কাছে ক্ষমা চাইতে পারব না!

কী প্রশ্নের কী উত্তর! চারুচন্দ্র চোখ থেকে চশমাটা খুলে কাচটা মুছতে থাকেন। আমরা নির্বাক দাঁড়িয়ে আছি। একবার ভাবলাম, রাসুকে বুঝিয়ে বলি, এখন, এই মুহূর্তে ও-প্রশ্নের উত্তর শুনতে চাইছেন না স্যার। কিন্তু তার আগেই উনি হাত নেড়ে আমাদের চলে যেতে বললেন।

তিনজনে পথে নেমে আসি।

যে-কথাটা আমি বলতে পারিনি, পথে নেমে সেই কথাটাই বললে কানাই। বললে, স্যার কিন্তু ও প্রশ্ন করেননি রাসু। উনি জানতে চেয়েছিলেন, পলাশীর যুদ্ধ শেষে বেঁচে থাকলে তুমি কী করতে?

ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে রাসুর সেই ম্লান হাসিটা আমি আজও ভুলিনি। ও মৃদু হেসেই বললে, সেটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি আমার আছে কানাই।

—আছে! তবে সে কথার জবাব দিলে না কেন?—রুখে ওঠে কানাই।

—কারণ জবাবটা মাস্টারমশায়ের আদৌ ভাল লাগত না! অথচ কি জানি কেন, মিথ্যা কথাটাও বলতে বাধল মুখে।

—তবে সত্য কথাটা কী? —তীক্ষ্ণ কণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন করে কানাই।

—আমি যদি সেদিন পলাশীর যুদ্ধ শেষে বেঁচে থাকতাম, তবে শিরের মত আত্মহত্যা করতাম না এটা নিশ্চিত! আমি...বরং...আমি...

—হ্যাঁ, কী করতে তুমি?

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায় রাসু। এতক্ষণে ওর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। বলে, শুনবে? আমি ট্রেইটার হতাম—হ্যাঁ, ঐ ক্লাইভের দলে নাম লেখাতাম।

কানাই অস্ফুটে শুধু বলল : Traitor !!

অনেক অনেক দিন আগেকার কথা। তবু আমার স্পষ্ট মনে আছে আমার পায়ের নিচে মাটিটা দুলে উঠল। কী বলছে ও! এই আমার আজন্মের বন্ধু রাসবিহারী, রাসু! আমার বাক্যস্ফূর্তি হল না; কিন্তু কানাই থামতে পারল না। বললে আজই তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল রাসবিহারী! আজই তো শেষ হল!

রাসবিহারী শুধু বললে : আমি জানতাম!

তিনজনে তিন দিকে চলে গিয়েছিলাম আমরা।

আকাশের মেঘ যা পারে না, মনের মেঘ তা পারে। রাসুর ছায়াসঙ্গী শিরে এরপর তিনটি দিন তার কাছে ভেড়েনি। চতুর্থ দিন রাসু নিজেই এল।

—কিরে শিরে, কথা বলবি-না না কি?

—কথা না বলার কী আছে?—আমার নির্লিপ্ত উত্তর।

ও আমার পিঠে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিয়ে বলে, তবে আজ তিনদিন আমাদের বাড়ি যাসনি কেন?

—রোজ রোজ তোমার বাড়ি গিয়ে ধর্না দিতে হবে এমনই বা কী কথা?

রাসবিহারী ও প্রসঙ্গ আর তুলল না। ঘাসের উপরেই বসে পড়ে। চোরকাঁটার একটা ডাঁটা চিবাতে চিবাতে বলে, আমার নির্বাসনদণ্ড হয়েছে, শুনেছিস বোধ হয়? কাল আমি চলে যাচ্ছি।

নির্বাসনদণ্ড! কী বলতে চাইছে রাসু?

ও নিজেই পরিষ্কার করে দিল রহস্যটা। অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র রায় তাঁর রায় দিয়েছেন। ইতিহাস শিক্ষকের প্রতি অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করার অপরাধে রাসবিহারীর নাম কাটা গেছে। ডুপ্লে কলেজে তাকে আর পড়তে দেওয়া হবে না। এখানকার অন্য কোনও স্কুলেও এ-ক্ষেত্রে তার পক্ষে ভর্তি হওয়া অসম্ভব। বামাপদ দুঃসংবাদটা সিমলায় জানিয়েছেন। সেখান থেকে এখনও কোন নির্দেশ আসেনি। আমার মনে অভিমানের মেঘ ইতিমধ্যে অনেকটা সরে গেছে। বললাম, নাম কেটে দিয়েছে? তুই তাহলে কি করবি?

—কী আবার করব? ভ্যাবাগঙ্গা ভাজব! মাছ মারব খাব ভাত, লেখাপড়া কী উৎপাত?

কী জবাব দেব বুঝে উঠতে পারি না। রাসু নিজে থেকেই বললে, না রে! একেবারে পড়াশুনা ছেড়ে দিচ্ছি না। কলকাতায় যাচ্ছি। মর্টন স্কুলে ভর্তি হব।

—তোকে নেবে কেন? এখন বছরের মাঝামাঝি—তাছাড়া—

—নেবে। হেড-স্যার সুপারিশ করে চিঠি দিয়েছেন।

মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা গেল না। হেড স্যার যদি ওকে তাড়িয়েই দেবেন তাহলে আবার অন্যকে সুপারিশ করে চিঠি দেবেন কেন? জিজ্ঞাসা করলাম সে কথা। রাসু বললে, আজ সকালেই তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন চারুচন্দ্র। কলেজে, মানে এক-নম্বরের চারুচন্দ্র। সেখানে নিভৃত কক্ষে অনেক কথা হয়েছে দুজনের। শেষ পর্যন্ত চারুচন্দ্র তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে রাজি হননি। হয়নি রাসবিহারীও। রাসু মনে করে না সে কোনও অন্যায় করেছে। চারুচন্দ্রও মনে করেন এক্ষেত্রে রাসুকে কলেজে রাখা যাবে না। তবু তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটি চিঠি রাসুকে দিয়েছেন, মর্টন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে। অনুরোধ করেছেন রাসুকে ভর্তি করে নিতে। মর্টন স্কুলের প্রধান শিক্ষক চারুচন্দ্রের সহপাঠী এবং বন্ধু। শেষ পর্যন্ত রাসু বললে, কানাইকে বলিস, সে আমার সঙ্গে বন্ধুত্বে ছেদ টেনেছে বটে, কিন্তু মাস্টারমশাই আমার অ্যাটিচুডে রাগ করেননি!

—তোর অ্যাটিচুডে মানে?

—পলাশীর যুদ্ধ শেষে বেঁচে থাকলে আমি ক্লাইভের দলে নাম লেখাতাম শুনে।

অবাক হয়ে বলি, সে-কথাও হয়েছে ওঁর সঙ্গে?

রাসু হেসে বলে, তা হয়েছে।

বিস্তারিত বললে সে আমাকে সব কথা।

মাস্টারমশাই ওকে নাকি সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন, সেদিন আমার প্রশ্নটার জবাব তুমি

ইচ্ছে করে এড়িয়ে গিয়েছিলে কেন বলত?

রাসু প্রতিপ্রশ্ন করেছিল, কোন প্রশ্নটা স্যার?

—পলাশীর যুদ্ধ শেষে বেঁচে থাকলে তুমি কী করতে?

—এড়িয়ে গিয়েছিলাম স্যার, জবাবটা আপনার ভাল লাগত না বলে।

চারুচন্দ্র কুঞ্চিত ভ্রূভঙ্গে গম্ভীর হয়ে বলেন, তা হোক, তুমি বল।

রাসবিহারী অকুতোভয়ে পেশ করছিল তার জবাব, আমি স্যার ক্লাইভের দলে গিয়ে নাম লেখাতাম। আমি traitor হতাম!

আমরা যতটা বিচলিত হয়েছিলাম চারুচন্দ্র কিন্তু ততটা হননি। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করেন, কিন্তু কেন?

—আমি দেখতাম, কী মন্ত্রে সে সিরাজউদ্দৌলার অতবড় বাহিনীকে পরাস্ত করল। কেমন করে—

একটু অধৈর্য হয়ে পড়েন চারুচন্দ্র। ওকে শেষ করতে না দিয়েই বলে ওঠেন, কী আশ্চর্য! সেই কথাই তো শোনালাম সেদিন! ক্লাইভ কৌশলে ভাঙন ধরিয়েছিল সিরাজের বাহিনীতে। মীরজাফরদের উৎকোচে বশীভূত করে—

এবার রাসুও ওঁকে বাধা দিয়ে মাঝপথে বলে ওঠে, সেই কৌশলটা শিখতেই তো ওর সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে, ওর বিশ্বাস অর্জন করে, তারপর ধনে-প্রাণে ওকে পথে বসাতাম! ট্রেইটার হব বলেই আমি ট্রেইটার হতাম!

অনেকক্ষণ জবাব দেননি চারুচন্দ্র। তারপর তাঁর অভ্যাসমত চশমাটা খুলে নিয়ে কাচটা মুছতে মুছতে বলেন, A double-edged sword, eh? শাঁখের করাত?

—আলবাৎ! যে কাঠায় মাপ, সে কাঠায় শোধ—

চারুচন্দ্র একটু অন্যমনস্কের মত বলেন, ওদিক দিয়ে আমি ভেবে দেখিনি!

রাসবিহারীর মনের বাঁধন এতক্ষণে ভেঙে যায় সহানুভূতি পেয়ে। উৎসাহ-ভরে বলতে থাকে, ভেবে দেখুন স্যার—শিরে একটা গাধা। হাজার হাজার মৃতদেহের ভিড়ে শহীদ হওয়ায় কোন মানে হয়? কানাইয়ের যুক্তিটাও অর্থহীন। মীরজাফর কি একটা? শত শত মীরজাফরকে কি গুপ্তহত্যা করে শেষ করা যায়? সবার আগে চাই স্বাধীনতা! ছলে-বলে-কৌশলে যেমন করে হোক! তারপর শত শত মীরজাফরকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করানোটা আর শক্ত কি?

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন চারুচন্দ্র। অনেকক্ষণ তিনি কোন কথা বলেননি। রাসবিহারীও নির্বাক। হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে নিম্নস্বরে চারুচন্দ্র প্রশ্ন করেন What's your ambition, young man?

এবারও স্বয়ংসিদ্ধ জবাব তৎক্ষণাৎ দাখিল করেছিল রাসবিহারী, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মিতে যোগ দিতে চাই স্যার।

—You are too practical. আমি ভেবেছিলাম, তুমি জবাবে বলবে—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন।

রাসবিহারী নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে।

—তুমি উদয়পুরের ঠাকুরসাহেবের নাম শুনেছ?

—না, স্যার। কে তিনি?

—বরোদার যতীন বাঁড়ুজ্জের নাম শুনেছ?

—আজ্ঞে না।

—যতীন্দ্রনাথ গোয়ালিয়ার রেজিমেন্টে ছিলেন। তুমি হয়তো জান না, বাঙালীকে ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান আর্মিতে নেওয়া হয় না—

কথার মাঝখানেই অন্যমনস্ক হয়ে যান। তারপর হঠাৎ টানা ড্রয়ার থেকে একখণ্ড কাগজ বার করে খস্‌খস্ করে কি যেন লেখেন। একট খামে চিঠখানা ভরে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন, কলকাতার গিয়ে যতীনবাবুর সঙ্গে তুমি দেখা কর। ওঁকে তোমার মনের কথা নিঃসঙ্কোচে বলতে পার। ব্যবস্থা যা করার উনি করবেন।

রাসবিহারী বললে, খামের উপর ওঁর নাম ঠিকানা তাহলে লিখে দিন।

চারুচন্দ্র হাসেন। বলেন, এতক্ষণে তুমি বোকার মত কথা বললে রাসবিহারী। নাম ঠিকানা লিখতে নেই। ওটা মুখস্থ করে নাও। আপার সার্কুলার রোডে ওঁর একটা আখড়া আছে। এই আমাদের সুহৃদ সম্মিলনীর মত। এর চেয়ে আরও বড়। সেখানে কুস্তি, বক্সিং ছাড়া তরোয়াল খেলাও শেখানো হয়। সেখানেই তাঁকে দেখা পাবে।

খামটা আমাকে দেখিয়ে রাসু বলেছিল, এই সেই চিঠি। মা বোড়াইচণ্ডী জানেন, কী লেখা আছে এই চিঠিতে।

তা চিঠিতে কী লেখা ছিল সেটাও জানতে পেরেছিলাম একদিন। মাস কয়েক পরে। সে বছর জগদ্ধাত্রী পূজার ছুটিতে রাসু চন্দননগরে ফিরে আসে। চন্দননগরে সব চেয়ে বড় উৎসব হচ্ছে জগদ্ধাত্রী পূজা। দুর্গা পূজাতেও খুব ধুমধাম হত। এ ছাড়া প্রতি বছর চৌদ্দই জুলাই হত 'ফ্যাস্তা'। ফরাসী উৎসব; Feste Nationale. গঙ্গার ধারে 'কে-ডুপ্লেক্স' মাঠে ঐ একটা দিন আলোয়, নিশানে, পতাকায়, ফেস্টুনে ফরাসী চন্দননগর উৎসবের সাজে সাজত। নানারকম খেলা আর প্রতিযোগিতার আসর বসত। সবচেয়ে মজা ছিল গঙ্গাবক্ষে বাইচ প্রতিযোগিতা! সন্ধ্যার পর অ্যাডমিনিস্ট্রেটার সাহেবের বাঙলোতে বিশিষ্ট অতিথিদের ভোজসভা। ঐ চৌদ্দই জুলাই তাই সে আমলে চন্দননগরের একটা বিশেষ দিন। তা সে ফ্যাস্তাই বল আর দুর্গাপূজাই বল—চন্দননগরের আসল উৎসব জগদ্ধাত্রী পূজা। দেশের মানুষ এদিন দেশে ফিরবেই। রাসুও এসেছিল সে বছর। গোঁসাই ঘাটের সিঁড়ির ধারে দুজনে বসেছিলাম গল্পের ঝুড়ি নিয়ে। গত ছয় মাসের ইতিহাস সে শুনিয়েছিল আমাকে। আর সেই প্রসঙ্গে ঐ চিঠিটার কথাও।

সেটাও উনিশ শ চার সালের শেষাশেষি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জোয়ার তখনও আসেনি। রাসবিহারী মর্টন স্কুলে ভর্তি হয়েছিল! ও থাকত ঠনঠনে বাজারের কাছে। উত্তর কলকাতার ঠনঠনে বাজারে সুবলদহ গ্রামের অনেকে মিলে একটা টিনের চালা ভাড়া নিয়েছিলেন। সে আমলে এমন বাসাবাড়ি ছিল পাড়ায় পাড়ায়। এক গাঁয়ের লোক এমনিভাবে বাসাবাড়িতে থেকে পড়াশুনা অথবা চাকরি-ব্যবসা করতেন। ছুটি-ছাটায় দেশের সঙ্গে যোগাযোগ হত। এ বাসাবাড়িতে রাসু-পরিবারে অনেকেই ছিলেন। রাসুর দুই কাকা সতীশ ও যতীশ এখানে থেকেই চাকরি করতেন। রাসুর জেঠামশাই অভয়বিহারীর ছেলে নরেন্দ্র ছিল রাসুর সমবয়সী। সেও ও-বাসায় থেকে লেখাপড়া করত। রাসুও ঐ মেসের একান্তে একটি মাদুর বিছিয়ে ছিল। এমনিতে ভালমানুষটির মত স্কুলে যায় আসে, টেমি জেলে সন্ধ্যাবেলা পড়তে বসে, আঁক কষে—কিন্তু তার মন পড়ে আছে গড়ের মাঠের ও-প্রান্তে মাটির নিচে বানানো এক পাতাল-রাজ্যে—যাকে তোমরা বল গড়, যার নামে ঐ মাঠটার নাম গড়ের মাঠ!

স্কুলে ছুটির প'র ও চলে যায় ঐ গড়ের মাঠে। না, ফুটবল খেলা দেখতে নয়, কোট

-প্যান্ট গাউন-পরা সাহেব-মেম দেখতে নয়, চৌ ঘুড়ি-হাঁকানো কাপ্তেনবাবুদের বে-পর্দা বিবিদের নিয়ে হাওয়া খাওয়া দেখতে নয়—সে নির্নিমেষ নয়নে দেখত ঐ গড়ের সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ। গুর্খা, পাঞ্জাবী, বালুচ, শিখ! একটাও বাঙালী নেই! ত্রিশকোটি মানুষকে শাসন করছে মুষ্টিমেয় ইংরাজ—ঐ ওদের ভরসায়। যে চাবিকাঠি খুঁজতে সে বেরিয়েছে সেটা আছে ওখানেই—কিন্তু সেখানে ওর প্রবেশাধিকার নেই।

এক শনিবার চিঠিখানা পকেটে করে রাসু রওনা হল যতীন বাঁড়ুজ্জের সন্ধানে। মাস্টারমশাই বলেছেন, যতীন্দ্রনাথ নাকি নাম লিখিয়েছিলেন গোয়ালিয়ার রেজিমেন্টে। কেমন করে? স্বনামে? বাঙালী পরিচয়ে? অসম্ভব! যদি ছদ্মনামে ঢুকে থাকেন তবে বলতে হবে তাঁর কৃতিত্ব ঐ কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের কীর্তিকেও ছাপিয়ে গেছে। এ তো দক্ষিণ আমেরিকার কোন স্বাধীন রাজ্য নয়, এ যে পরাধীন ভারতবর্ষ।

ঠনঠনে কালীবাড়ির সামনেই একটা কাঁচা সড়ক। ঝামাপুকুরকে বাঁ-হাতি রেখে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছালো আপার সার্কুলার রোডে। আখড়া খুঁজে বার করতে বেশি বেগ পেতে হয়নি তাকে। রাস্তার যে কোন লোককে জিজ্ঞাসা করলেই বলে দিচ্ছে, ব্যারিস্টার পি. মিত্রের আখড়া তো! একটু আগিয়ে ডান হাতি!

ব্যাপার কি? ব্যারিস্টার পি. মিত্রটা আবার কে? ব্যারিস্টার মানুষ আবার আখড়া বানায় নাকি? এ কেমনতর ব্যারিস্টার রে বাবা? কিন্তু সবাই তাকে চেনে। অবশেষে রাসু এসে পৌঁছালো মিত্র সাহেবের আখড়ায়।

তোমরা হয়তো এই আখড়ার নাম শোননি, নয়? এই শতাব্দীর ঊষাযুগে বিপ্লবীদের কাশুকারখানা কেমন করে তিল তিল করে দানা বেঁধে উঠছিল এবার সংক্ষেপে সেটা বলে নিই। সেটা জানা না থাকলে রাসুভায়ার এই আখড়া অভিযানের তাৎপর্যটা তোমরা ঠিকমত বুঝতে পারবে না। ভাবছ, বুড়ো মানুষ এবার ধান ভানতে শিবের গাওনা ধরল? তা কি করবে বল? যেমন গুরু তেমন চেলা হবে তো? আমার গুরু বলতেন, গল্প বলার আগে তার পটভূমিকাটা হিস্টরিক্যালি, জিওগ্রাফিক্যালি আর ক্রনোলজিক্যালি এস্টাব্লিস করতে হবে।

উনিশ শতকের একেবারে শেষাশেষি পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা, ফিরোজশাহ্ মেহতা অথবা গোবিন্দ রাণাডে প্রভৃতি স্বপ্ন দেখতেন—আবেদন নিবেদনেই ইংরাজ প্রভুর মন গলবে। ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসন দিয়ে ওরা এদেশ থেকে পাততাড়ি গোটাবে। এটা যে নেহাত স্বপ্নবিলাস তা প্রথম অনুধাবন করলেন মহারাষ্ট্রের লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক। বাংলায় বিপ্লব-বহ্নি এসেছিল ঐ মহারাষ্ট্র থেকে। আমরা "What Bengal thinks to day"-টুকুই মনে রেখেছি। কিন্তু 'yesterday'-র কথাটা যদি ভুলে থাকি তবে তাতে ইতিহাসকে অস্বীকার করা হবে। মহারাষ্ট্র থেকে সে হোমাগ্নিশিখাকে বঙ্গদেশে প্রথম বহন করে এনেছিলেন অরবিন্দ আর যতীন্দ্রনাথ। কেমন করে, সে কথাই বলব। ধান ভানতে শিবের গীত নয় ভাই—সব পূজার আগেই গণেশপূজার বিধি আছে।

মহারাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত কেশরী পত্রিকায় উদ্দীপনাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন তিলক মহারাজ। একবারে নতুন সুরে, তিনি প্রথম ঘোষণা করলেন—"আবেদন-নিবেদন নয়, আপন পৌরুষে যদি আত্মসম্মান রক্ষা করতে পার তবেই পারবে, নচেৎ নয়।" গজাসুরদলন গণপতিকে তিনি প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করলেন—প্রবর্তন হল গণপতিপূজা। পূজার যে মন্ত্র উচ্চারিত হল তাতে 'অসুর' শব্দের পরিবর্তে 'যবন' ব্যবহার করলেন তিনি। সমস্ত দেশ

একটা নতুন আলোর সন্ধান পেল। এর পরেই তিনি আয়োজন করলেন শিবাজী উৎসবের। যে শিবাজী খণ্ডছিন্ন-বিক্ষিপ্ত-ভারতকে একসূত্রে বেঁধে দেবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন! রায়গড় দুর্গে ছত্রপতি শিবাজীর দেহাবশেষের উপর যে ভগ্নাবশেষ স্মৃতিমন্দির মহাকালের শেষ হস্তাবলেপনের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিল সেটার সংস্কারে উদ্‌যোগী হলেন তিলক। কেশরী পত্রিকায় লিখলেন—'আফজল খাঁকে অতর্কিত হত্যা করে কি অন্যায় করেছিলেন শিবাজী মহারাজ? আমি বল্‌ব—না! তোমার ঘরে যদি নিশীথরাত্রে সশস্ত্র তস্কর প্রবেশ করে এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার যদি তুমি অন্ধকারে খুঁজে না পাও তবে কৌশলে ঘরে শিকল তুলে দিয়ে পরস্বাপহারীকে জীবন্তে দগ্ধ করার নৈতিক অধিকার তোমার আছে! আমি তো জানি না—সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর কোন তাম্রপত্রের অনুশাসনে ঐ যবন-ম্লেচ্ছদের এমন কোনও সনদ দিয়ে গেছেন যাতে ওরা ভারতবর্ষের শোণিত পান করার অধিকার দাবি করতে পারে। সুতরাং পিনালকোডের ধারাগুলিকে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াও! শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে কথা বলেছেন সেই বাণী স্মরণ কর ঃ 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। হে ব্রতী! নিষ্কামকর্মে আত্মদান কর! শত্রুদলন তোমার জন্মগত ক্ষাত্র অধিকার!'

থমকে গেল সারা দেশ! এ কী ভাষা? এ কী নির্দেশ!

একদল তরুণ গোপনে এসে সমবেত হল তিলক মহারাজের পদপ্রান্তে—তারা নির্দেশপ্রার্থী, তারা পথের সন্ধান চায়। গড়ে উঠল মহারাষ্ট্রের মিত্রমেলা, পরে যা পরিণত হয়েছিল—'অভিনব ভারতে'।

দৈবের নির্দেশেই বল আর ঈশ্বরের করুণাই বল—এই সময় ঘটনাচক্রে পর পর দুটি ভয়াবহ ধূমকেতু আবির্ভূত হল মহারাষ্ট্রের ভাগ্যাকাশে। যুগল-ধূমকেতুর প্রথমটি হচ্ছে মহামারী প্লেগ রোগ, দ্বিতীয়টি ইংরাজ শাসক সাতারার অ্যাসিটেন্ট কালেক্‌টার র‍্যাণ্ড। প্রথমটির পরিচয় নিষ্প্রয়োজন : দ্বিতীয়টিও—ঐ সাতারার মানুষদের কাছে! মহামারীর আক্রমণে হাজারে হাজারে মানুষ মরতে শুরু করল বোম্বাই আর পুণাতে। কুকুর বেড়াল ইঁদুরের মত। প্লেগ-দমনের নামে সাতারা থেকে বদলি করে র‍্যাণ্ড-সাহেবকে পাঠিয়ে দেওয়া হল প্লেগ কমিশনার করে। র‍্যাণ্ড-সাহেবের মত কুশাসক ভারতবর্ষে অল্পই এসেছে। খামখেয়ালি এই র‍্যাণ্ড-সাহেবের স্বেচ্ছাচারে স্তম্ভিত হয়ে গেল সারা দেশ। প্লেগদমনের নামে সে শুরু করল অকথ্য অত্যাচার। তার উদ্দেশ্য শুধু একটি : প্লেগ যাতে সাহেব পাড়ায় ছড়িয়ে না পড়ে। কালা আদমিরা ধনে-প্রাণে মরে তো মরুক! যে বস্তিতে একটিমাত্র প্লেগ রুগী পাওয়া গেছে সেই বস্তির ঘরে আগুন দিতে শুরু করল ফিরিঙ্গি সেপাই—র‍্যাণ্ড সাহেবের হুকুমে। দীনাতিদীনের ঘরেও থাকে তার প্রিয় জিনিস, কিন্তু সেগুলি সরিয়ে নেবারও সময় দিল না ওরা। আবেদন, নিবেদন শেষে প্রতিবাদ করল দেশের মানুষ। মহারাষ্ট্রের 'কেশরী' থেকে কলকাতার 'অমৃতবাজার পত্রিকার' সম্পাদকীয়তায় তা ছাপা হল। শেষ পর্যন্ত সদাশয় সরকার বাহাদুর একটি কমিশন বসাতে বাধ্য হলেন। কমিশন খুঁজে দেখবে প্লেগ দমনের নামে কোনও অন্যায় কেউ করছে কিনা!

আশ্চর্যের কথা, কমিশন তাঁদের রিপোর্টে বললেন : "The system of discovering plague cases by house-visitation is absolutely intolerable to the people who looked upon the plague-measures as more horrible than the plague itself."

[বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্লেগ রোগের অনুসন্ধানের কাজটি আজ সাধারণ মানুষের কাছে

সহ্যের একেবারে অতীত—তারা মহামারীর চেয়ে বেশী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এই মহামারী-দূরীকরণের ব্যবস্থাপনায়]

তার চেয়েও আশ্চর্যের কথা—কমিশনের এই রিপোর্টখানি লালফিতা দিয়ে ফাইলে বেঁধে কোন সরকারী দপ্তরের রেকর্ড-রুমে সযত্নে সাজিয়ে রাখা হল তা কেউ জানতেও পারল না। ইংরাজ সরকার র‍্যাণ্ড-সাহেবকে কোন তিরস্কার তো করলেনই না, সতর্ক, এমন কি অনুরোধ পর্যন্ত করলেন না যাতে সে সংযত হয়। অপরপক্ষে ইংরাজবাচ্চা র‍্যাণ্ড ঐ কমিশন নিয়োগে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কালা-আদমিগুলো ভেবেছে কী? র‍্যাণ্ডসাহেবের বিরুদ্ধে কমিশন বসাবে? তার অত্যাচারের মাত্রা সে বাড়িয়ে দিল এক কাঠি। নূতন খেলায় মাতল সে। হুকুম দিল, এরপর সন্দেহের বশবর্তী হয়ে প্লেগরোগীর প্রতিবেশীর ঘরে আগুন দেবার পূর্বে সে বাড়ির প্রতিটি বাসিন্দাকে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করাতে হবে; দেখতে হবে তারা রোগাক্রান্ত কিনা। নরমপন্থীরা বললেন, দেখ, আবদনে কাজ হয়েছে। র‍্যাণ্ড-সাহেবের সুমতি হয়েছে।

আসলে কিন্তু এর পিছনে ছিল এক নারকীয় বীভৎস পরিকল্পনা। আপাত-দৃষ্টিতে ঐ আদেশ মানা যুক্তিপূর্ণ হলেও কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগবিধির পিছনে দেখা গেল বিকৃতকামীর এক ন্যক্কারজনক মনোবিকার! রাইফেলে বেয়নেট চড়িয়ে ফিরিঙ্গি সেপাই ঘিরে ফেলে এক এক মহল্লা। নরনারী নির্বিশেষে প্রতিটি বাসিন্দাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে উন্মুক্ত স্থানে তাদের ওরা জড়ো করে! তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা একদিকে চলে পরীক্ষাকার্য, অন্যদিকে একদল সেপাই গিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয় খালি বস্তিতে! বিবস্ত্র নরনারী ছুটে যায় তার শেষ সম্বলটুকু আগুনের লেলিহান শিখা থেকে রক্ষা করতে! সে এক অপূর্ব দৃশ্য! এমন সার্কাস দেখে উল্লাসে ওরা হোহো করে হাসতে থাকে।

অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে? না? কিন্তু এই হচ্ছে রূঢ় বাস্তব। বিশ্বাস না হয় চলে যাও ন্যাশানাল লাইব্রেরীতে, খুলে দেখ ১১ই মার্চ, ১৮৯৭ সালের পত্রিকা 'মিত্র'। মহারাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত। মিথ্যা কথা ছাপার অক্ষরে লেখার মত দুটো মাথা তখন ছিল না কোন সম্পাদকের ঘাড়ে ঃ

"The men are completely stripped in presence of others and made to wait in that position for some time while the women are asked to undo their cholies (bodices) and to hold up their wearing apparel in presence of others."

[পুরুষদের সর্বসমক্ষে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে সার দিয়ে দাঁড় করানো হত! ঐ অবস্থায় তাদের অপেক্ষা করতে বলা হত এবং তাদের সামনেই স্ত্রীলোকদের আদেশ দেওয়া হত বক্ষাবরণী উন্মোচন করে দিতে, এমন কি অধোবাস উঁচু করে ধরতে!]

এই পৈশাচিক খেলার অবসান দাবি করে শহরের গণ্যমান্য কয়েকজন প্লেগ-কমিশনার র‍্যাণ্ড-সাহেবের এজলাসে এক গণডেপুটেশন নিয়ে সাক্ষাৎ করলেন, বারই এপ্রিল তারিখে। এর আগেই গণপতি পূজা আর শিবাজী উৎসব হয়ে গিয়েছিল—তাই র‍্যাণ্ডসাহেব হাসতে হাসতে বললেন, বাপু, দেখুন, মুসলমান পর্দানশীন মহিলাদের ক্ষেত্রে আমি একান্তে পরীক্ষার নির্দেশজারী করতে রাজী আছি, কিন্তু হিন্দু নারীর ক্ষেত্রে প্রকাশ্য দিবালোকে এবং সর্বসমক্ষেই পরীক্ষাকার্য চালাতে হবে! এ আদেশের কোন পরিবর্তন হবে না।

ঐ বারই এপ্রিলের পর থেকে দেখা গেল, কি জানি কেন সিপাহী ডাক্তারদের ধারণা হয়েছে প্লেগ রোগ মুসলমান নয়, হিন্দুদেরই বেশী হয় এবং পুরুষ নয় নারীদেহেই ঐ আক্রমণের

সম্ভাবনা—শুধু তাও নয়, ষোলো থেকে ত্রিশ বছরের মহিলার দেহেই একমাত্র প্লেগের আক্রমণ হতে পারে! তাদের পরীক্ষাকার্য থেকে এমন সিদ্ধান্তে আসা চলে। জননী-জায়া ভগিনী-বনিতার অপরিসীম অবমাননায় আগুন ধরে গেল মহারাষ্ট্র তারুণ্যের ধমনীতে! রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসছে সারা দেশ—প্রতিশোধ চাই! প্রতিশোধ চাই!

লোকমান্য তিলকের লেখনী সেই বারুদের অগ্নি সংযোগ করল। মহাপণ্ডিতের কলম থেকে বেরিয়ে এল এক অন্তিম আর্তনাদ ঃ "তোমরা দেখ! দুঃশাসন আজ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করে পৈশাচিক উল্লাসে হাসছে! দর্পহারী মধুসূদন। কোথায় তুমি? তোমার সুদর্শনচক্র নেমে আসার সময় কি আজও হয় নি চক্রপাণি?"

নাটকীয় মনে হবে তোমাদের, মনে হবে বানিয়ে বলছি—কিন্তু বিশ্বাস কর ভাই : ঐ দুঃশাসনের রক্তপান করতে যে তিন ভাই এগিয়ে এল তারা তিনজনেই সুদর্শন। তারা সত্যই মধুসূদনের অবতার রূপ। তাদের তিনজনের নামই খুঁজে পাবে দর্পহারী মধুসূদনের অষ্টোত্তর শতনামে। তারা আপন তিন ভাই—দামোদর, বালকৃষ্ণ আর বাসুদেব। চাপেকার ভ্রাতৃত্রয়।

দামোদর সবার বড়। বোম্বাইয়ের ছেলে। কিশোর বয়স থেকেই কুস্তি, লাঠিখেলায় পারদর্শী। দু-দুবার সে ঢুকতে চেষ্টা করেছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার সৈন্যবাহিনীতে—কিন্তু তার রক্তে আগুনের স্পর্শ থাকায় সেখানে তার স্থান হয়নি। তিলক মহারাজের প্রবন্ধ পড়ে সে স্থির করে ফেলল তার জীবনের লক্ষ্য! মহারাষ্ট্রীয় মা-বোনের ইজ্জত বাঁচাতে সে র‍্যাণ্ড-সাহেবকে হত্যা করবে। দুই ভাই আর প্রিয় বন্ধু রাণাডেকে সে জানালো তার সংকল্পের কথা। ওরা রাজি হয়ে গেল। এই হচ্ছে ওদের জীবনের ব্রত। ওরা চারজনে একদিন মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এল বোম্বাই থেকে পুণায়।

পুণাতে তখন মহামারীর প্রচণ্ড প্রকোপ। তা হোক, এখানেই ওদের থানা গাড়তে হবে—কারণ এখানেই যে দুঃশাসনের সমর শিবির। ওরা এসে আশ্রয় নিল পুণার লৈখদিপুল মহল্লার একটি বস্তিতে। নিতান্ত ঘটনাচক্রেই বলতে হবে, ঐ মহল্লায় ছিল মহাদেবী লক্ষ্মীমাঈর মন্দির—পুরোহিত মন্দির ছেড়ে পালিয়ে গেছে মহামারীর ভয়ে। মায়ের পূজা বন্ধ আছে। দামোদর জাতে ব্রাহ্মণ। ওকে সবাই অনুরোধ করল মায়ের ভার নিতে। কিংবা হয়তো মহাদেবীর ইচ্ছা হয়েছিল অমন একটি নিষ্ঠাবান মাতৃপূজারীর হাতে শেষ পূজা নিতে! মোটকথা দামোদর পুরোহিতের কাজটা পেল—আশ্রয় নিল মন্দিরে। পাশের মাঠেই বোম্বাই নেটিভ ইন্‌ফ্যান্ট্রির চতুর্দশবাহিনী ছাউনি ফেলেছে। দামোদর ওদের বাহিনীর কয়েকজনের সঙ্গে ভাব জমালো। কদিন পরেই মিলিটারি ছাউনি থেকে চুরি গেল দুটি মার্টিন হেনরি রাইফেল এবং দুটি তলোয়ার। কড়া প্রহরা বসল। হৃত সম্পদ ওরা খুঁজে পেল না। কারণ মহাদেবী মায়ের আসনের নিচেটা ওরা খোঁজেনি। এদিকে বালকৃষ্ণ আর রাণাডে প্রতিদিন সকালে বেরিয়ে যায়, মন্দিরে ফিরে আসে গভীর রাত্রে। তারা দিবারাত্র সংবাদ রাখছে র‍্যাণ্ড-সাহেব কখন কোথায় যায়, তার বাড়িতে কখন কজন প্রহরী থাকে, কখন তাদের ডিউটি বদল হয়। সবার ছোট ভাই বাসুদেব—সে প্রায় কিশোর। তাকে ওরা কোন কাজের দায়িত্ব দিতে চায় না। ক্ষুব্ধ হয় বাসুদেব—কিন্তু বড়দা আর মেজদার হুকুমের প্রতিবাদ সে করে না। চুপ করে বসে থাকে মন্দিরের চাতালে—পাহারা দেয় প্রতিমার আড়ালে লুকিয়ে রাখা মারণাস্ত্রগুলিকে।

কিন্তু প্রকাশ্য রাস্তায় তো রাইফেল তলোয়ার নিয়ে বার হওয়া যায় না। লোকের নজরে পড়বেই। তাহলে? একদিন কোথা থেকে দামোদর নিয়ে এল দুটি রিভলভার। হাতে স্বর্গ পেল ওরা।

বালকৃষ্ণ বললে—টার্গেট প্র্যাকটিশ নেই। নিশানা ঠিক থাকবে তো?

দামোদর বললে—সে তোকে ভাবতে হবে না! লক্ষ্যবস্তুর গায়ে পিস্তলের নল লাগিয়ে ট্রিগার টানব আমি।

—কিন্তু অমন সুযোগ পাবে কেমন করে?

—সেইটেই তো ভাবছি!

পুরো তিন মাস দামোদর, রাণাডে আর বালকৃষ্ণ ছায়ার মত অনুসরণ করেছে র‍্যাণ্ড আর তার সহকারী আয়ার্স্টকে। সুযোগ যে একেবারে আসেনি তা নয়; কিন্তু দামোদরের স্থির সঙ্কল্প ঃ অগ্নিমন্ত্রের এই প্রথম অর্ঘ্য যেন ঠিক মায়ের পায়েই পৌঁছায়। অ্যাটেম্প্ট-টু-মার্ডার নয়—ইন্সট্যান্টেনিয়াস ডেথ্ হওয়া চাই।

তারপর এল সেই সুযোগ ঃ ২২শে জুন ১৮৯৭।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী-উৎসবের রাত্রে।

সারা পুণা শহরে সেদিন আলোর মেলা। ভারত সম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসব। গভর্নমেন্ট হাউস থেকে রাত সাড়ে সাতটায় বার হয়ে এল পর পর দুখানি ব্রুহাম গাড়ি প্রথমটায় উৎসব-সজ্জায় সজ্জিত কমিশনার র‍্যাণ্ড; দ্বিতীয়টায় তার সহকারী সস্ত্রীক আয়ার্স্ট। দুটি গাড়ির দূরত্ব প্রায় পঞ্চাশ হাত। সন্ধ্যা থেকেই রাজবাড়ির সামনে, ফটক থেকে একটু দূরে গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল দামোদর আর তার সহকারী রাণাডে। এগিয়ে আসছে র‍্যাণ্ড-সাহেবের ওয়েলার ঘোড়া—টগ্‌বগ্ করে। ঐ একই ছন্দে নাচছে দামোদরের বুকের মৃদঙ্গে রক্তের ঢেউ। জামসেদজী জীজীবয়ের বাড়ির কাছাকাছি গাড়িটা এগিয়ে আসতেই গতি একটু শ্লথ হল, এবার বাঁয়ে মোড় নিতে হবে। তৎক্ষণাৎ বিদ্যুদ্‌গতিতে অন্ধকারের বুক চিরে বার হয়ে এল দামোদর। পিছন থেকে শোনা গেল মেজ ভাই বালকৃষ্ণের সঙ্কেত—ন্যারা, ন্যারা!

ব্রুহাম-গাড়ির পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল তক্‌মা আঁটা সহিস। অন্ধকারের ভিতর প্রচণ্ড একটা মুষ্ট্যাঘাতে ছিটকে পড়ল রাস্তায়। দামোদর লাফ দিয়ে উঠল পিছনের পাদানিতে। পিছনের ফোকর দিয়ে বাড়িয়ে দিল সে বজ্রমুষ্টি। চকিতে র‍্যাণ্ড দেখতে পেল রিভলভারের কালো নলটা। চীৎকার করে উঠতে গেল সে; কিন্তু তার আগেই অনলবর্ষী রিভলভার গর্জন করে উঠল। রিভলভারের নল স্পর্শ করেছিল ওর মাথার খুলি—উড়ে গেল সেটা। তৎক্ষণাৎ লুটিয়ে পড়ল র‍্যাণ্ড। মৃত্যু মুহূর্তমধ্যে! ইন্সট্যানটেনাস্ ডেথ্!

কিন্তু নাটকের ওখানেই শেষ নয়। পঞ্চাশ হাত পিছনে আসছিল যে গাড়িটা তার সওয়ার মিসেস্ আয়ার্স্ট স্বামীকে বলে ওঠেন ঃ সামনে গাড়িতে একটা ফায়ার হল না?

আয়ার্স্ট চলন্ত গাড়ি থেকেই মুখ বাড়িয়ে দেখতে গেল। এই সুযোগই খুঁজছিল রাণাডে। লক্ষ্যবস্তুকে পরিষ্কার দেখতে পেল সে। এবার গর্জে উঠল তার পিস্তল! স্ত্রীর কোলে লুটিয়ে পড়ল আয়ার্স্ট। তার মৃত্যু হল হাসপাতালে—এগারো দিন পরে।

দামোদর ধরা পড়ল নয়ই আগস্ট। সম্পূর্ণ নির্বিকার সে। ধর্মাধিকরণে সে স্বীকার করল অকপটে ঃ হ্যাঁ, নিজ হাতে সে র‍্যাণ্ডকে হত্য করেছ। শুধু তাই নয়, ইতিপূর্বে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মর্মর মূর্তির গলায় যে জুতোর মালাটি একদিন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল সেটাও সে স্বহস্তে পরিয়েছে!

পুলিস তখন সমস্ত রাজ্য তোলপাড় করে খুঁজছে দামোদরের সহকারীদের। অকথ্য নিপীড়নেও দামোদর মুখ খোলেনি। আয়ার্স্টকে কে হত্যা করেছে তার নাম সে বলবে না। পুলিস সন্ধান করে ফিরছে ওর দুই পলাতক ভাইকে। বালকৃষ্ণকে জীবিত বা মৃত ধরে দিতে

পারলে বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে—ঘোষণা করল ইংরাজ সরকার। বালকৃষ্ণ তখন হায়দ্রাবাদে। সেখানেই সে ধরা পড়ে। ছোট ভাই বাসুদেব চমকে উঠল খরব শুনে। কে ধরিয়ে দিল মেজদাকে? কেমন করে ধরা পড়ল সে? নিজামের কাছে ইতিমধ্যে নির্দেশ গেল—বন্দীকে ইংরাজ সরকারে সমর্পণ কর। মহামহিম নিজাম বাহাদুর ক্ষীণ স্বরে প্রতিবাদ করলেন, জানালেন ১৮৬৭ সালের চুক্তি অনুসারে তিনিই তাঁর রাজ্যে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। হুঙ্কার দিয়ে উঠল ব্রিটিশ সিংহ ঃ ছেলেখেলা কর না! অতঃপর নিজাম বালকৃষ্ণকে সমর্পণ করলেন ইংরাজ-পুলিশের কাছে। ঐ সঙ্গে আবেদন করলেন—ঘোষিত বিশ হাজার টাকা তাঁকে দেওয়া হোক। কিন্তু শোনা গেল ইংরাজ সরকার নিজামকে ঘোষিত অর্থের মাত্র অর্ধেক দিয়েছে, বাকি অর্ধেক দেওয়া হয়েছে যে ধরিয়ে দিয়েছিল তাকে। বালকৃষ্ণের বিচার শুরু হল দামোদরের সঙ্গে।

তখনও পালিয়ে বেড়াচ্ছে আয়ার্স্ট-হত্যাকারী রাণাডে আর চাপেকার ভাইদের সর্বকনিষ্ঠ বাসুদেব। বড়দা, মেজদা দুজনেই ধরা পড়েছে। এবার কী করবে বাসুদেব? মায়ের কাছে ফিরে যাবে? কিন্তু সেখানে তো ওৎ পেতে বসে আছে টিকটিকি! বাসুদেবকে এতদিন দাদারা কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেয়নি—ছোট ছেলে বলে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল। আজ দাদাদের নেতৃত্ব নেই—বাসুদেব নিজেই স্থির করল তার কর্তব্য। কেমন করে মেজদা ধরা পড়ল এটাই সে খুঁজে বার করবে। বিভীষণটি কে? হায়দ্রাবাদে যাবার জন্য প্রস্তুত হল কিশোরটি। কিন্তু প্রয়োজন হল না। ২রা ফেব্রুয়ারী টাইম্‌স্‌-অফ-ইণ্ডিয়া পত্রিকায় 'সম্পাদক সমীপেষু' বিভাগে ছাপা হল একটি বিচিত্র পত্র। পত্র-প্রেরক গণেশশঙ্কর দ্রাভিদ্‌। পত্রলেখক সগর্বে নিজ কীর্তি ঘোষণা করে তার দাবী পেশ করেছে :

'It will be remembered that soon after the tragedy of the Jubilee night a reward of Rs. 20,000 was offered by the Govt. through a public proclamation to any person or persons who could give the police a clue, leading to the detection and final conviction of the murderer. The clue was supplied by me but only half of the amount was divided between me and my brother.... The lynx-eyed officials even did not forget to deduct from the amount Rs. 260 as income-tax ! Surely, I have a right to claim all the ducats offered by the Govt....'

[আশাকরি আপনাদের স্মরণ আছে যে জুবিলী রাত্রের দুর্ঘটনার পর সরকার ২০,০০০ টাকার একটি পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। হত্যাকারীকে যে বা যারা ধরিয়ে দিতে পারবে তাকে ঐ অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে। যে সূত্রবলে পুলিস আততায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে সেটি সরবরাহ করেছিলাম আমি। অথচ বিজ্ঞাপিত পুরস্কারের মাত্র অর্ধাংশ আমাকে ও আমার ভাইকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে.....তা থেকে আবার মক্ষিচুষ আয়কর বিভাগের অফিসারেরা ২৬০ আয়কর হিসাবে কেটে নিয়েছে! নিঃসন্দেহে, পূর্বঘোষিত সমস্ত অর্থের দাবী করবার অধিকার আমার আছে...]

বাঃ বাঃ বাঃ! হেসে উঠল বাসুদেব আপন মনেই। গণেশ দ্রাভিদ্‌ তার অনেকটা পরিশ্রম লাঘব করে দিয়েছে। কিন্তু ওর ভাইটি কে? অনুসন্ধান করে সহজেই সংগ্রহ করল বাসুদেব দু-ভাইয়ের ঠিকানা। ওরা পুণাতেই আছে। মামলায় সাক্ষী দিতে হবে তাদের। সনাক্তকরণ করতে হবে। আরও সংবাদ পেল, ঐ দুই দ্রাভিদ্‌ ভাই নাম করা গুণ্ডা। ইতিপূর্বে জালিয়াতী ও মিথ্যাসাক্ষী দেওয়ার অপরাধে তাদের শাস্তি হয়েছে।

পুণার একান্তে একটি বাড়ি। গণেশ আর রামচন্দ্র এখানেই থাকে। বাসুদেব রোজই রাতের অন্ধকারে ওখানে যায়—ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করে। চিনে নেয় দুভাইকে। ভুল না হয়। শেষে একদিন সন্ধ্যাবেলা কয়েকজন জুয়াড়িকে নিয়ে দু-ভাই রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসে তাস খেলছে। চারিদিকে ছড়ানো মদের বোতল, বার্ডস-আইয়ের টুকরো। খুচরা সিকি-দোয়ানি পয়সার ঝনৎকার। দরজায় কে যেন টোকা দিল। বেরিয়ে এল ওদের মা। দেখল তক্‌মাধারী অল্পবয়সী একটি চাপরাশি।

—কি চাই?

সেলাম করে চাপরাশি ছোকরা বললে, এস্. পি. সাহেব রামচন্দ্র আর গণেশবাবুকে সেলাম দিয়েছেন। কালকের মামলায় কি ভাবে সাক্ষী দিতে হবে তার তালিম নেওয়ার জন্য।

ওদের মা ঘরে গিয়ে খবরটা দিল। গণেশ বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করল চাপরাশিকে, বড়-সাহেব কোথায় আছেন?

—থানায় অপেক্ষা করছেন স্যার।

—ও আচ্ছা, আমরা এখনই আসছি!

এমন আহ্বান প্রায়ই আসে। ওদের সন্দেহ করার কারণ নেই। তৈরী হয়ে নিতে ওরা ঘরের ভিতর ঢুকল। ছদ্মবেশী চাপরাশিও সরে দাঁড়াল অন্ধকারে। পকেট থেকে বার করল বড়দার ফেলে যাওয়া রিভলভারটা।

একটু পরেই বেরিয়ে এল দু-ভাই—গণেশ আর রামচন্দ্র। দু দুবার গর্জন করে উঠল বাসুদেবের পিস্তল। গণেশ মারা গেল তৎক্ষণাৎ, রামচন্দ্র পরদিন।

বাসুদেব এবং রাণাডে ধরা পড়ল অনতিবিলম্বে। বাসুদেব কী খুশি? আর তাকে পালিয়ে বেড়াতে হবে না। বড়দা আর মেজদা দেখে নিক—সেও কম যায় না। জবানবন্দীতে সে দৃঢ়স্বরে বললে—হ্যাঁ, দুই ভাইকেই সে বধ করেছে স্বহস্তে। উদ্দেশ্য ঃ প্রতিশোধ নেওয়া। বলেছিল, he claimed all the ducats offered by the Govt. but forgot to pay his own due to his motherland!

জ্যেষ্ঠ দামোদর হরি চাপেকার-এর ফাঁসি হল : আঠারই এপ্রিল, ১৮৯৮।

কনিষ্ঠ বাসুদেব মেজদার আগে এগিয়ে গেল : আটই মে, ১৮৯৯।

দামোদরের বন্ধু আয়ার্স্ট-হত্যাকারী রাণাডে : দশই মে, ১৮৯৯।

মধ্যম ভ্রাতা বালকৃষ্ণ তার দুদিন পর : বারই মে, ১৮৯৯।

বিচারক যখন বাসুদেবের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করলেন, তখন চট করে দাঁড়িয়ে উঠেছিল কিশোর ছেলেটি। হাত দুটি জোড় করে বলেছিল : ধর্মাবতার আমার একটি আর্জি আছে।

মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ আর্জি শোনার নিয়ম আছে। বিচারক বলেন, বল!

আপনি দয়া করে আমাকে দুবার ফাঁসি দেবার হুকুম দিন ধর্মাবতার। একবার মাত্র ফাঁসি হলে আমি কেমন করে বুঝব, কোন হত্যাকাণ্ডের জন্য ফাঁসি হল আমার—রামচন্দ্র না গণেশ!

বিচক্ষণ বিচারক ঐ কিশোর মৃত্যুপথযাত্রীর প্রশ্নের জবাব দিতে পেরেছিলেন বলে মামলার নথীতে কিছু লেখা নেই।

তবে জেলখানার ইতিহাসে লেখা আছে ফাঁসির দিন সকালে যখন প্রহরীরা ওকে ফাঁসির মঞ্চের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তখন করিডরের অন্ধ প্রাচীরের সামনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে সে হাঁকাড় দিয়েছিল ঃ মেজদা, আমি আজ চললাম!

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল প্রহরীর দল।

পাষাণ প্রাচীর ভেদ করে ভেসে এল বালকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর ঃ ঠিক আছে রে বাসুদেব! বড়দাকে বলিস, এ হপ্তার শেষাশেষিই আমি আস্‌ছি!

এতকথা আমি সে-যুগে কিছুই জানতাম না। যারবেদা জেলের সংবাদ কিংবা মামলার নথীপত্র তো আমরা তখন দেখিনি। আমি তো তখন ওদের নামই জানতাম না। রাসু জানত। আর জানত কানাই। কানাই পুণাতেই পড়াশুনা করেছে। সে নাকি এইসব ঘটনা বিস্তারিতভাবে শুনেছিল তার সহপাঠী একটি মারাঠি ছেলের কাছে, ঐ যার নাম ছিল—বিষ্ণুগণেশ পিংলে! অগ্নিযুগের ইতিহাসে ঐ চারজন হচ্ছেন শহীদ। দামোদর-রাণাডে-বালকৃষ্ণ আর বাসুদেব। আমি তো আজও ওদের বীরত্বে, ওদের নিঃস্বার্থ আত্মদানের মধ্যে কোন ফারাক দেখি না। কানাই কিন্তু দেখেছিল। তার হিরো ছিল ঐ কিশোর বয়সী বাসুদেব, চাপরাশি সেজে যে দু'দুটো মীরজাফরকে সরিয়ে দিয়েছিল দুনিয়া থেকে। বিচারককে যে অন্তিম-মিনতি জানিয়েছিল দু-বার ফাঁসির হুকুম জারি করতে!

মহারাষ্ট্রে যখন এই নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছিল তখন বরোদা রাজ্যে অলক্ষ্যে ঘনিয়ে উঠছিল আর এক নতুন নাটক। অরবিন্দ তখন সেখানে শিক্ষকতা করতেন। তিলক মহারাজের আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বটে কিন্তু গুপ্তসমিতি গঠনের প্রেরণা তিনি বোধহয় প্রথম পান ঠাকুরসাহেবের কাছে। এই ঠাকুরসাহেব যে আসলে কে, তা ইতিহাস জানে না আজও। শ্রীঅরবিন্দ অনেক পরে বলেছিলেন যে, উনি ছিলেন উদয়পুরের একজন বিশিষ্ট জায়গীরদার এবং তাঁর কৌলিক উপাধি ছিল ঠাকুর। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন ঃ

"The Thakur was not a member of the council in Bombay : he stood adove it as the leader of the whole movement while the council helped him to organise Maharastra and the Marharta states. He himself worked principally upon the Indian Army of which he had already won over two or three regiments."

অরবিন্দ ঠাকুরসাহেবের অনুরোধে মধ্যপ্রদেশে গিয়ে ওই সব সামরিক ব্যক্তিদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথাবার্তা বলেছিলেন—মিলিটারীর মধ্যে ভাঙন ধরানো যায় কিনা তা দেখতে গিয়েছিলেন। আহমেদাবাদ কংগ্রেসে তিলক মহারাজের সঙ্গেও তাঁর কিছু গোপন আলাপচারী হয়েছিল।

এর পরেই বরোদা থেকে অরবিন্দের নির্দেশে বাঙলাদেশে গুপ্তসমিতি গঠন করবার ব্রত নিয়ে এসে হাজির হলেন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০১)। বরোদার গায়কোয়াড বাহিনীতে একজন সৈনিক ছিলেন তিনি। মিলিটারি ট্রেনিং ও নিয়মানুবর্তিতা তাঁর জানাই ছিল। কলকাতায় এসেই যতীন্দ্রনাথ আপার সার্কুলার রোডে একটা আখড়া খুলে বসলেন। শুভ উদ্দেশ্য ঃ 'তস্কর ও পরস্বাপহারীদিগের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যুবকবৃন্দকে শিক্ষিত করিয়া তোলা।' বক্সিং, কুস্তি, অশ্বারোহণ, সন্তরণ—ক্রমে ছোরাখেলা, লাঠিখেলা এমন কি ফেন্সিং বা তরোয়াল-চালানো। একবছরের ভিতরেই যতীন্দ্রনাথ সুন্দর একটি প্রতিষ্ঠানের বীজবপন করেছিলেন। পর বৎসর উৎসাহিত হয়ে অরবিন্দ তাঁর ভাই বারীন্দ্রকে পাঠালেন যতীন্দ্রকে মদৎ যোগাতে (১৯০২)। অরবালিয়ার অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য এসে যোগ দিলেন ওঁদের সঙ্গে। ওঁরা তিনজনে কাজ ভাগ করে নিলেন। অবিনাশ দেখেন অর্থনৈতিক দিক—চাঁদা আদায় করার ব্যাপারটা। যতীন্দ্র আখড়ার পরিচালনা এবং বারীন্দ্রের কাজ ছিল প্রচার। অনতিবিলম্বে দেশের এখানে ওখানে গড়ে উঠল একই ধরনের আখড়া—কটকে, বাঁকুড়ায়, রাঁচিতে, দিনাজপুরে, রংপুরে, মৈমনসিংহ, ঢাকায়, বসিরহাটে এবং নদীয়ার কৃষ্ণনগরে। যতীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন এই

বিভিন্ন সংগঠনগুলি একটি কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালনায় থাকলে ভাল হয়। মূলতঃ তাঁরই প্রচেষ্টায় এমন একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হল, যার প্রেসিডেন্ট হলেন ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র, যুগ্ম-ভাইস-প্রেসিডেন্ট অরবিন্দ ও চিত্তরঞ্জন এবং কোষাধ্যক্ষ হলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভগ্নী নিবেদিতা এই কেন্দ্রীয় সমিতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হলেও তাঁর সক্রিয় সহানুভূতি ছিল এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি। অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন সে-যুগের বেশ কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যক্তি—যাঁদের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী, মৈমনসিংহের সূর্যকান্ত আচার্যচৌধুরী, যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সখারাম গণেশ দেউস্কর এবং রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে অরবিন্দকে পরে পণ্ডিচেরীতে অর্থাভাবে অর্ধাশনে দিন কাটাতে হয়েছিল তিনিও প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন এই প্রতিষ্ঠানে—প্রাথমিক পর্যায়ে। প্রতিষ্ঠানের আপাত উদ্দেশ্য—যা লিখিতভাবে ঘোষিত হয়েছিল তা, আগেই বলেছি : যুবকবৃন্দকে আত্মরক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা—কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিল আখড়া থেকে বেছে কয়েকজনকে নিয়ে গুপ্তসমিতি গঠন করে তাদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করে তোলা।

এইখানে উল্লেখ করে যাওয়া উচিত—অরবিন্দ-যতীন্দ্র-বারীন্দ্র দলের এই সংগঠনের প্রায় সমসময়েই (১৯০২) সতীশচন্দ্র বসু মশাই অনুশীলন সমিতি নামে একটি আখড়া খোলেন, বছর তিনেক পরে যেটি ৪৯ নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে স্থানান্তরিত করা হয়। ব্যারিস্টার পি. মিত্রের সঙ্গে এই অনুশীলন সমিতির যোগাযোগ প্রথম থেকেই ছিল এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় দুটি প্রতিষ্ঠান পরে এক নেতৃত্বে আসে।

সে যাই হোক, বারীন্দ্রনাথ বরোদা আসার পরই তাঁর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের মতবিরোধের সূত্রপাত হয়। দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রভেদ ছিল এ কথা অনস্বীকার্য। যতদূর আন্দাজ করা যায়, বারীন্দ্র বৈপ্লবিক শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করতে চেয়েছিলেন—দর্শনধারী একটা বৈপ্লবিক বিস্ফোরণে দেশের মানুষকে জাগাতে চেয়েছিলেন। অপরপক্ষে যতীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা ছিল বৈপ্লবিক শক্তির বিকেন্দ্রীকরণ—সিঙ্গাপুর থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত একসূত্রে গাঁথা একটি বৈপ্লবিক শক্তির বিকাশ দেখতে চেয়েছিলেন তিনি—তাঁর মতে বিস্ফোরণের দিন আরও কয়েকবছর পরে হলেই ভাল হয়।

এক বছরের মধ্যেই বারীন্দ্র বরোদায় তাঁর সেজদার কাছে ফিরে যান (১৯০৩)। অল্প কিছু দিন পরে যতীন্দ্রও এ বিষয়ে নির্দেশ নিতে বরোদায় চলে আসেন। অরবিন্দ তাঁদের কী নির্দেশ দিয়েছিলেন জানা যায় না—কিন্তু ইতিহাস বলছে পর বৎসর বারীন্দ্র আবার কলকাতায় ফিরে আসেন এবং কাজ শুরু করেন। এবার অবিনাশচন্দ্র, দেবব্রত বসু, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতিকে তিনি সহকারীরূপে পান। যতীন্দ্রের মত কর্মবীরের কথা চিন্তা করে অরবিন্দ স্বয়ং এবার (১৯০৪) কলকাতায় আসেন। গ্রে-স্ট্রীটের বাড়িতে তিনি বারীন্দ্র, যতীন্দ্র, অবিনাশ এবং দু-জন মহারাষ্ট্রীয় যুবকের সঙ্গে দীর্ঘসময় আলোচনা করেন। শেষ পর্যন্ত স্থির হয় বারীন্দ্রই কলকাতা কেন্দ্রের পরিচালনা করবেন। যতীন্দ্রনাথ এরপরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং নিরলম্বস্বামী নাম নিয়ে উত্তরভারতে বৈপ্লবিক কাজের নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত করবার ব্রত নিয়ে চিরদিনের মত বাঙলাদেশ ছেড়ে যান।

আপার সার্কুলার রোডের আখড়ায় যখন এসে পৌঁছাল রাসু তখন বেলা পড়ে এসেছে। ভিস্তিতে রাস্তায় জল দিচ্ছে। আপার সার্কুলার রোডের খোয়া বাঁধানো রাস্তায় বাবুদের চৌঘুড়ি, ব্রুহাম বার হয়েছে সাহেব-বিবিদের সান্ধ্যভ্রমণের আয়োজন। কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা

একটা ফাঁকা মাঠ। একান্তে একটি টালির ছাদ। ওটাই আখড়ার অফিস। মাঠের একদিকে কয়েকজন কুচকাওয়াজ করছে। তাদের সকলের ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন, নিম্নাঙ্গে কপনি। ও-প্রান্তে খানিকটা জায়গায় মাটি কোপানো—কুস্তির আখড়া। জন-চারেক লোক সেখানে কুস্তি লড়ছে। রাসু একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে ওদের লড়াই দেখল। একজন যুবক এসে বললে, কাকে খুঁজছ ভাই?

—এটা কি ব্যারিস্টার পি. মিত্রের আখড়া?

—হ্যাঁ, কেন?

—যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে আছেন?

—না, যতীনদা তো এখানে থাকেন না। তুমি কোথা থেকে আসছ?

—যতীন্দ্রনাথের আখড়া কোনটা বলতে পারেন?

—না, না, তুমি ভুল বুঝেছ। এটাই যতীনবাবুর আখড়া। তবে তিনি এখন এর পরিচালক নন। এখন আমিই ছেলেদের শেখাই। আমার নাম শ্রীবারীন্দ্রনাথ ঘোষ। তুমি কোথা থেকে আসছ ভাই?

রাসু একটু চিন্তা করে বললে, আমি আসছি চন্দননগর থেকে। সেখানকার ডুপ্লে-কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়মশাই আমার হাতে যতীনবাবুর নামে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন।

বারীন্দ্রনাথ বললেন, তুমি আমার সঙ্গে অফিসে এস।

অফিস-ঘরে রাসুকে বসিয়ে বারীন্দ্র বললেন, চারুবাবুর সঙ্গে তাঁর যদিও প্রত্যক্ষ আলাপ নেই তবু তাঁর নাম উনি শুনেছেন। যতীনবাবুই বলেছেন। উপেন্দ্রনাথও বলেছেন। সবশেষে বললেন, তুমি যতীনবাবুর চিঠিখানা আমাকে দিতে পার, আমিই এখন যতীনবাবুর কাজকর্ম দেখাশুনা করছি।

রাসু একটু ইতস্তত করে। বারীন্দ্রনাথ কে, তা সে জানে না। তবে এটুকু নিশ্চিত যে, তিনি গোয়ালিয়ার রেজিমেন্টের ভূতপূর্ব সৈনিক নন। তিনি কেমন করে হদিস বাতলাবেন—ঐ চক্রব্যূহে ঢোকার সুড়ঙ্গপথ কোথায়?

বারীন্দ্রনাথ ওকে ইতস্তত করতে দেখে বললেন, বন্ধ খাম?

—আজ্ঞে না। খোলা চিঠি।

—তবে দেখি।

খোলা চিঠি বটে, তবে সৌজন্যবোধে রাসু সেটা পড়ে দেখেনি। নাম না-লেখা খোলা খামটা এবার সে বাড়িয়ে ধরে।

বারীন্দ্র চিঠিখানা পড়লেন। তারপর হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, কই, কী জিনিস তিনি তোমার হাতে পাঠিয়েছেন দেখি?

রাসু অবাক হয়ে বলে, জিনিস? নাতো! ঐ চিঠি ছাড়া আর কিছু তো মাস্টারমশাই হাতে দেন নি।

বারীন্দ্র রাসবিহারীকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে খোলা চিঠিখানা বাড়িয়ে ধরেন ওর সামনে। বলেন, পড়ে দেখ।

রাসবিহারী এতক্ষণে চিঠিখানা পড়ল :

"প্রীতিনিলয়েষু,

যতীনবাবু, আপনি সেবার বলিয়াছিলেন তস্কর ও পরস্বাপহারীদিগের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় উপযুক্ত করিতে আপনি দেশের যুবকবৃন্দকে তরোয়ালখেলা শিখাইতেছেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে এইরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠা বাঞ্ছনীয়। দুষ্কৃতকারীদিগের দমনে সদাশয় ইংরাজ ও ফরাসী

সরকার পুলিশ ও ফৌজ মোতায়েন করিয়াছেন বটে, তবু তাহাদের সাহায্য করিতে যুবকবৃন্দকে আত্মরক্ষায় শিক্ষিত করা একান্ত প্রয়োজন। একই উদ্দেশ্যে আমি এখানে একটি আখড়া খুলিয়াছি। তরোয়াল খেলার ব্যবস্থা করিতে পারি নাই—বক্সিং ও কুস্তি শিখাই মাত্র। প্রসঙ্গত আমি একটি ভাল ইস্পাতের টুকরা পাইয়াছি। শান দিতে পারিলে ইহা একটি double edged sword হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আপনার আখড়ায় তরোয়াল খেলার ব্যবস্থা আছে জানিয়া ঐ ইস্পাতের টুকরাটি পত্রবাহকের হস্তে পাঠাইলাম। দেখুন, আপনার কাজে লাগে কি না।

শুভার্থী

শ্রী চারুচন্দ্র রায়। ৭.৫.১৯০৪।

রাসবিহারী দুবার পড়ল চিঠিখানা। তারপর মুখ তুলে বললে, বিশ্বাস করুন, ইস্পাতের টুকরোটা উনি আমার হাতে দেননি। হয়তো দেবেন ভেবেছিলেন, শেষ পর্যন্ত ভুলে গেছেন।

বারীন্দ্র বিশ্বাস করলেন কিনা বোঝা গেল না। কিন্তু হঠাৎ তাঁর নজর গেল দরজার দিকে। চকিতে চোখ তুলে বললেন, একী আপনি?

খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন বছর ত্রিশ বয়সের একজন দীর্ঘদেহী যুবাপুরুষ। একমুখ ঘনকৃষ্ণ দাড়ি-গোঁফ, চুলগুলো অবিন্যস্ত। চোখে উজ্জ্বল দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি। পরনে ধুতি ও পিরান।

—হ্যাঁ, যাওয়া হয় নি। ফিরে এলাম। তোমার সেজদা কলকাতায় আসছেন। ভাবলাম, এখানেই তাঁর সঙ্গে দেখাটা করে যাই!

বারীন্দ্র, অবাক হয়ে বলেন, সেজদা কলকাতায় আসছেন। কে বললে?

— চারুবাবু!

—চারুবাবু? কোন চারুবাবু? চন্দননগরের চারুচন্দ্র? কিন্তু.....

— আরে না না। চারুচন্দ্র দত্ত, আই.সি.এস। সেজদার বন্ধু, চেন না? আমাদের রাজা সুবোধ মল্লিকের ভগ্নিপতি।

— ও! দত্ত-সাহেব!

আগন্তুক কথা বলছিলেন বারীন্দ্রের সঙ্গে কিন্তু তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল রাসবিহারীর উপর। কি জানি কেন রাসবিহারী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

আগন্তুক একটা টুল টেনে নিয়ে বসে বলেন, এটি কে? নতুন রিক্রুট?

রাসবিহারীর চিঠিখানা ওঁর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন, না। ও এসেছে চন্দননগর থেকে। আপনার সঙ্গেই দেখা করতে। আমি ভেবেছিলাম আপনি কলকাতা ছেড়ে চলে গেছেন, তাই.....

এই তাহলে যতীন্দ্রনাথ!

যতীনবাবু চিঠিখানি আদ্যন্ত পড়লেন। তারপর রাসবিহারীর দিকে ফিরে বললেন, কই হে ইস্পাতের টুকরোখানা দেখি।

এমন বিপদে রাসবিহারী কখনও পড়েনি। পুনরায় সে আমতা আমতা করে বললে, মাস্টারমশাই চিঠিতে কেন ওকথা লিখেছেন সে জানে না। ঐ ইস্পাতের টুকরো সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে রাসবিহারীর কোন কথাই হয়নি।

যতীন্দ্রনাথ মৃদু মৃদু হাসছিলেন। বললেন, তুমি পড়? কোথায় থাক?

খোশ গল্প শুরু হওয়ায় উঠে পড়েন বারীন্দ্রনাথ। তিনি কাজের মানুষ। বলেন, আপনি বসুন যতীনবাবু, আমি আসছি। আখড়ায় ছেলেরা রয়েছে।

বারীন্দ্রনাথ বেরিয়ে গেলেন।

রাসবিহারী তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করে, আপনি গোয়ালিয়ার রেজিমেন্টে ছিলেন?

—হ্যাঁ, কেন বলত?

—কেমন করে ঢুকলেন ওখানে? বাঙালী পরিচয়ে?

যতীন্দ্রনাথ ক্রমশঃ কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। একে একে প্রশ্ন করে জেনে নেন রাসবিহারীর নাড়ি-নক্ষত্র। মাস্টারমশাই বলেছিলেন যতীনবাবুকে নিঃসংকোচে সে সব কথা বলতে পারে। তাই কোন সংকোচ করল না রাসু। যতীন্দ্রনাথও প্রশ্ন করে জেনে নিলেন সব ঘটনা। কথাপ্রসঙ্গে কামালুদ্দীন সাহেবের প্রসঙ্গও উঠল। পলাশীর যুদ্ধের কথাও। সব শুনে উনি বললেন, ফোর্ট উইলিয়ামে ওরা তোমাকে ঢুকতে দেবে না।

—জানি। আমি চেষ্টা করেছিলাম। ওরা মেরে ধরে হাঁকিয়ে দিল!

যতীন্দ্রনাথ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। রাসবিহারী আবার বলে, তাহলে আপনি আমাকে কী করতে বলেন? আমি এই আখড়ায় যোগ দেব? আমি লাঠিখেলা জানি।

যতীন্দ্রনাথের দৃষ্টি দূর আকাশের থেকে ফিরে এল না। সেখানে অস্তমিত সূর্যের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল একটা নিঃসঙ্গ চিল। সেদিকে তাকিয়েই উনি বললেন, দুদিন আগে হলে আমি বলতাম, আলবৎ। কিন্তু আজ সে কথা বলার অধিকার আমার নেই। কারণ তোমার দায়িত্ব আমি নিতে পারব না। আমি নিজেই এখানে থাকছি না।

—কোথায় যাচ্ছেন আপনি?

—উত্তর ভারতে। যুক্তপ্রদেশ অথবা পাঞ্জাবে। এখনও ঠিক করিনি।

কেমন যেন সন্দেহ হল রাসুর। বললে, এদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে?

এবার দৃষ্টিটা ফিরে এল ওঁর। বললেন,—না, না, আমাদের উদ্দেশ্য এক। এক গুরুর নির্দেশই কাজ করছি আমরা। শুধু ক্ষেত্রটা বিভিন্ন হয়ে গেল।

রাসু একটু ঝুঁকে পড়ে বললে, আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান না?

অবাক হলেন যতীন্দ্রনাথ। ওকে আপাদমস্তক আবার দেখে নিয়ে বললেন, তা এখন কেমন করে বলি? যদি নতুন জায়গায় নতুন করে শুরু করতে পারি, ডাক দেব তোমাকে।

রাসু বললে, একটা কথা যতীনদা। আপনাদের আসল উদ্দেশ্য তো— ইয়ে, তাহলে মাস্টারমশাই কেন লিখেছেন ইংরাজ আর ফরাসী পুলিসকে মদৎ দিতে—

হাসলেন যতীন্দ্রনাথ। বললেন, বোকা ছেলে! খোলা হাত চিঠিতে—

রাসবিহারী তাঁকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে, কিন্তু আপনাদের দলে আই.সি.এস-ও তো রয়েছে! আই.সি.এস-চাকরি যে নিয়েছে সে তো ও-দলের।

—আই.সি.এস? কার কথা বলছ তুমি?

—ঐ যে আপনি বললেন—শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত আই.সি.এস!

মিষ্টি হাসলেন যতীন্দ্রনাথ। তারপর বললেন, ভারতীয় আই.সি.এস-রা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্বাসঘাতক, তাই মনে কর তুমি, এই তো?

—নিশ্চয়ই!

—কিন্তু ট্রেইটার হবার জন্যও তো মানুষে ট্রেইটার হয়। কি বল?

রাসু চুপ করে যায়। তার কথাই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন যতীন্দ্রনাথ।

টেবিলের উপর থেকে একখন্ড কাগজ নিয়ে যতীন্দ্রনাথ দু-চার লাইন লিখে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলেন, পড়। চারুবাবুকে চিঠিখানা দিও।

রাসু দেখলে সংক্ষেপে লেখা আছে ঃ

"প্রিয় চারুবাবু,

আপনার পাঠানো উপহার পত্রবাহকের হাতে পাইলাম। কিন্তু ঘটনাচক্রে উপহারটি আমি গ্রহণ করিতে পারিলাম না। পত্রবাহকের হাতেই প্রত্যর্পণ করিলাম। কেন এটি নিজ-ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করিতে পারিলাম না তা পত্রবাহকই জানাইবে। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

ইতি—যতীন্দ্রনাথ।"

রাসবিহারী চিঠিখানা পড়ে মাথা নিচু করে বসে থাকে।

যতীন্দ্রনাথ সকৌতুকে বলেন, কই তুমি তো এবার বললে না, উপহারটা কেমন করে তোমার হাতে ফেরত দিলাম? চিঠি ছাড়া আর কিছু তো দিইনি তোমাকে?

রাসবিহারী এতক্ষণে চিঠি দুটির গূঢ় অর্থ বুঝতে পরেছে। তাকেই দু-মুখো তরোয়াল বলে ইঙ্গিত করেছিলেন মাস্টারমশাই। লজ্জায় সে মুখটা তুলতে পারে না। যতীন্দ্রনাথ ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, বুদ্ধি খুলছে, না ভাই? ইস্পাতটাকে এ-ভাবে নিজে নিজেই ধার দিয়ে নিও। কেমন? যেন মরচে না ধরে। বড় খাঁটি ইস্পাত গচ্ছিত রইল তোমার জিম্মায়!

রাসবিহারী নত হয়ে ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করল।

যতীন্দ্রনাথ দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন ওকে।

উনিশ শ' চারের জগদ্ধাত্রী পূজার দিন গোঁসাই ঘাটের ধারে জোড়া অর্জুন গাছতলায় বসে রাসবিহারী এ গল্প শুনিয়েছিল আমাকে। তারপর দীর্ঘ পাঁচ বছর তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। এরপর তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল সাহারাণপুরে, উনিশ শ'নয় সালে। পাঁচ থেকে নয়, এই কয় বছরে বাঙলাদেশের উপর দিয়ে প্রচণ্ড একটা ঝড় বয়ে গেছে। বিপ্লবী দলগুলি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। উনিশ শ'পাঁচে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, তারপর মজঃফরপুরে ক্ষুদিরামের ফাঁসি, প্রফুল্লের আত্মহত্যা এসব ইতিহাস তো তোমরা জানই। ঠিক তার পরেই হল মুরারীপুকুর তল্লাসী। যা আশঙ্কা করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ তাই হল। এক থেপলা জালে কেন্দ্রীভূত বিপ্লবীদের সকলেই এক সঙ্গে ধরা পড়লেন। ঐ সঙ্গে গ্রেপ্তার হলেন অরবিন্দ এবং চন্দননগরের চারু রায়। সি. আর. দাশের কৃতিত্বে আইনের ফাঁকে ছাড়া পেলেন অরবিন্দ এবং ফরাসীপ্রজা হওয়ায় চারুচন্দ্র। নরেন রাজসাক্ষী হল। সত্যেন আর কানাই জেল-হাসপাতালেই তাকে গুলি করে মারল। সে সব তো তোমরা জান—নতুন করে তা বলার প্রয়োজন নেই। শুধু কানাই জেলের ভিতর কীভাবে রিভলভার পেয়েছিল এটা বোধহয় তোমরা জান না। আমি জানি। কিন্তু সে কথা বলতে গেলে নিজের ঢাক নিজে পেটাতে হবে। তাছাড়া কানাইয়ের কথা তো আজ তোমরা শুনতে চাওনি আমার কাছে।

ঐ যা বললাম—এরপর পাঁচ বছরের ইতিহাস আমার অলক্ষ্যে লেখা হয়েছে রাসুর জীবনে। তার সঙ্গে আমার পত্রালাপ অবশ্য বরাবর ছিল। চন্দননগর থেকে চিঠি যেত। প্রেরক চন্দননগরবাসী জনৈক 'আমিরচাঁদ', প্রাপক দেরাদুনের 'মানিকলাল'। তার জবাবও আসত ঐভাবে।

এই প্রসঙ্গে একদিনের কথা মনে পড়ছে। অনেক দিন পরের কথা। সেটা কাশীতে। বাঙালীটোলায়। আমি, রাসু, বসন্ত আর শচীন সান্যাল বসে কথা বলছিলাম খোলা ছাদে। সে আমলে রাসুর নাম ছিল চুচেন্দ্রনাথ দত্ত। ওর অসংখ্য ছদ্মনাম ছিল। এক এক এলাকায়, এক এক যুগে তার এক এক নাম। কোথাও সে বাঙালী, কোথাও নরেন সেন, সুরেন দত্ত

কোথাও চুচেন্দ্রনাথ, কোথাও আবার সতীশচন্দর। বসন্ত হাসতে হাসতে বললে, আচ্ছা দাদা শ্রীকৃষ্ণের মত আপনারও অষ্টোত্তর শতনাম আছে বলে শুনেছি। কিন্তু এমন একটি বেয়াড়া বিদঘুটে বেখাপ্পা নাম আপনি নিলেন কোন আক্কেলে? চূচেন্দ্রনাথ কোন ভদ্রলোকের নাম হয়? শুনলেই মনে হয় এটা ছদ্মনাম। 'চূচেন্দ্র' কোন বাঙালীর নাম হতে পারে এ তো আমি ভাবতেই পারি না।

রাসু মৃদু মৃদু হাসছিল।

শচীনও ওকে চেপে ধরল, না দাদা, এড়িয়ে গেলে চলবে না। বলতে হবে। আপনি বহুবার আমাদের বলেছেন ছদ্মবেশ-ধারণের সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে বেশটা স্বাভাবিক হয়। যেন সন্দেহ উদ্রেক না করে। তা নামের বেলা সেই থিওরিটা খাটালেন না কেন?

রাসু অম্লানবদনে বলে, এই চূচেন্দ্রনাথ নামের জন্য দায়ী ঐ হতভাগা শিরে!

আমি তারস্বরে প্রতিবাদ করি, খবর্দার রাসু! মিথ্যে অপবাদ দিবি না। আমি তোর নাম 'চূচেন্দ্রনাথ' রেখেছি! চূচেন্দ্রনাথ! ওয়্যাক্, থুঃ!

রাসু হাসতে হাসতে বলে, পরোক্ষভাবে।

তারপর ওদের দিকে ফিরে বলে, উত্তর-ভরতে আসার পরে আমি প্রথম ছদ্মনাম নিই 'মানিক', শিরে হল 'আমীরচাঁদ'। বেশ স্বাভাবিক নাম। দিব্যি নাম। ওমা, দুদিন পরেই আলাপ হল দিল্লির আমীরচাঁদজীর সঙ্গে। তিনিও নাম লেখালেন আমার খাতায়। আমি ভাবি : লে হালুয়া। আমার হাতের লেখা চিঠি যদি চন্দননগরে পুলিশের হাতে পড়ে তবে টিকিতে টান পড়বে দিল্লির আমীরচাঁদজীর। পুলিশ ভাববে, মাস্টারমশাইকেই চিঠি লিখেছি আমি। চিন্তায় পড়লাম। ভবিষ্যতে কোন মহাপ্রভু কী পিতৃদত্ত নাম নিয়ে এ খোঁয়াড়ে ঢুকবেন তা কেমন করে জানব? তাই স্থির করলাম, এমন নাম নেব যার আর জুড়ি নেই! ফলে আমি হলাম শ্রীযুক্ত বাবু চূচেন্দ্রনাথ দত্ত! নাও, জুড়ি খুঁজে বার কর তোমরা!

সবাই হেসে উঠি আমরা।

কিন্তু যে কথা বলছিলাম : রাসুর গল্প কোথা থেকে শুরু করব ফের? ঐ পাঁচ বছরের কমিসিং-লিংক বাদ দিয়ে, উনিশ শ' নয় থেকে?

জিতেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জবানবন্দী

না। শ্রীশ ভায়া না জানলেও আমি জানি। ঐ মিসিং লিংক-টুকু। বস্তুত রাসবিহারীর কার্যময় ঐ অংশটুকুই আমার জানা। তার আগেও নয়, পরেও নয়।

আমি তাকে প্রথম দেখি উনিশ শ' ছয় সালে, দেরাদুনে—আমার ভগ্নীপতি পূর্ণ বাঁড়ুজ্জের বাড়িতে। পূর্ণ আমার নিজের ভগ্নীপতি। তার বড় ছেলের বিয়েতে কদিন থাকব বলে আমি এসেছিলাম দেরাদুনে। সেখানে ঐ বিয়ে বাড়ির ডামাডোলের মধ্যে রাসবিহারীর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। প্রথম সাক্ষাতেই আমরা দুজনে দুজনের অন্তরের খুব কাছাকাছি চলে এলাম। গোপনতম কথাবার্তা হয়েছিল সেই প্রথম রাত্রেই। এমনটা হবার কথা নয়। বেশ কিছুদিন না যাচিয়ে এ সব গোপন কথা কোন বিপ্লবীই সদ্য-পরিচিতের সঙ্গে আলোচনা করে না। কিন্তু আমাদের সেই সাক্ষাৎকারটা ছিল এ নিয়মের একটা ব্যতিক্রম। তার পূর্বে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয়টা বোধহয় প্রয়োজন।

আমরা যুক্তপ্রদেশের সাহারানপুরের বাসিন্দা। দু-পুরুষের প্রবাসী বাঙালী। সাহারানপুরে তখন মুষ্টিমেয় বাঙালী। তার ভিতর আমার বাবা ছিলেন ওখানকার সবচেয়ে বড় উকিল। দু হাতে উপার্জন করেছেন তিনি, শহরে সবাই এক ডাকে তাঁকে চিনত। বাবার খুব ইচ্ছে ছিল, আমি বড় হয়ে ব্যারিস্টার হব। কিন্তু আমার নজর অন্যদিকে। চাপেকার ভাইয়েরা স্বপ্নের মধ্যে আমাকে হাতছানি দেয়। কেশরী পত্রিকার পুরানো সংখ্যা এনে পড়ি। তিলক মহারাজ আর অরবিন্দ আমার আদর্শ। ঘটনাচক্রে ঐ সময় সাহারানপুরে এসে উপস্থিত হলেন যতীন্দ্রনাথ, উত্তর ভারত সফরের একটা পর্যায় হিসাবে। প্রথম দর্শনেই আমি নিজেকে কায়মনোবাক্যে সঁপে দিলাম। অদ্ভুত মানুষ ছিলেন তিনি, অপূর্ব তাঁর সংগঠনী ক্ষমতা। বাঙলা অঞ্চলের সব কিছু বারীন্দ্রকুমারকে হাস্তান্তরিত করে একেবারে রিক্ত হস্তে এসেছিলেন তিনি উত্তর-ভারতে; কিন্তু মাত্র ছয় মাসের মধ্যে এখানে তৈরী করে ফেললেন নূতন একটি দল। মানুষ নির্বাচনের ঐশ্বরিক ক্ষমতা ছিল তাঁর। যে-কজন লোককে কাছে টেনে নিয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেকে উত্তরকালে হয়েছেন স্বনামখ্যাত বিপ্লবী। তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল : লালচাঁদ ফলক, অজিত সিং, লালা লাজপৎ রায়, হরদয়াল এবং কিষেণ সিং। এই কিষেণ সিং কে তা বুঝলে তো? ভবিষ্যৎ শহীদ ভগত সিং-এর পিতৃদেব। আম্বালার ডাক্তার হরিচরণ মুখোপাধ্যায়, পেশওয়ারের চারুচন্দ্র ঘোষ, শিয়ালকোটের লালা অমর দাস ইত্যাদি। আমাকেও তিনি টেনে নিলেন ঐ দলে। এই সময় বিখ্যাত বিপ্লবী হরদয়ালের সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছিল। হরদয়াল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বছরে বিলাত চলে যান। পরের বছর সামান্য কিছুদিনের জন্য তিনি ভারতবর্ষে আসেন স্ত্রীকে বিলাত নিয়ে যাবেন বলে। ওঁর স্ত্রীকে বিলাত নিয়ে যাওয়ায় কিছু বাধা ছিল। হরদয়াল বস্তুত তাঁর বিবাহিত স্ত্রীকে অপহরণ করে বিলাতে পাড়ি জমান। সে রোমাঞ্চকর রোমান্সের বিস্তারিত বর্ণনা দেবার অবকাশ এখানে নেই। ঐ হরদয়ালের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল আমার বন্ধু রুড়কি কলেজের লেক্‌চারার

খুদাদাদের মাধ্যমে। খুদাদাদ ছিল হরদয়ালের সহপাঠী। এছাড়া আমার সহপাঠী তারাচাঁদ—ঐ তোমাদের ইতিহাসের বিখ্যাত পণ্ডিত পরবর্তী যুগের ডক্টর তারাচাঁদ ছিল হরদয়ালের আপন ভায়রাভাই। ফলে ঐ সংযুক্তাহরণে আমারও একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা ছিল। যাক সে কথা। এত কথা বললাম শুধু জানাতে যে, হরদয়ালই আমাকে পরে দিল্লী-গ্রুপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন, যাদের আমিই আবার আর একদিন পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম রাসবিহারীর সঙ্গে। এই পূর্ব ইতিহাসকথনের আরও একটি প্রয়োজন ছিল। রাসবিহারীর কোন কোন জীবনীকার এমন ইঙ্গিত করেছেন যেন রাসবিহারী অনুর্বর বন্ধ্যা মাটিতে সোনা ফলিয়েছেন এই উত্তর-খণ্ডে। কথাটা ঠিক নয়, জমি আমরা তৈরী রেখেছিলাম সাধ্যমত। যেটুকু তার কৃতিত্ব নয় সেটুকু তার স্কন্ধে আরোপিত করতে আমি নারাজ ; তেমনি যেটুকু তার কৃতিত্ব সেটুকু যেন সে পুরো মাত্রায় পায় তা-ও দেখতে হবে আমাকে। যেমন : রাসবিহারী আমাকে বারে বারে বলেছিল, নানা-সাহেবের মত এক বিরাট অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করতে হ'লে সেনাবাহিনীতে আমাদের লোক ঢোকাতে হবে। এ যুক্তিটা আমি জানতাম; কিন্তু এ-বিষয়ে কোন কিছুই করে উঠতে পারিনি। আমার পরবর্তী আমলে রাসবিহারী সেটা সফল করেছিল। এ কৃতিত্ব সম্পূর্ণ তার। তার, একলার!

সে যাই হোক, পূর্ণবাবুর বাড়িতে সেই বিয়ের উৎসব রাত্রে আমি যখন রাসবিহারীকে দেখি তখন আমি উত্তর-খণ্ডের পয়লা-সারির বিপ্লবী। হরদয়ালের একনিষ্ঠ শিষ্য। অথচ আমিও রাসবিহারীকে চিনি না, সেও আমাকে চেনে না।

দেরাদুনে সে-আমলে বাঙালী ছিল মুষ্টিমেয়। পূর্ণবাবু অভ্যাগতদের মধ্যে যে কজন বাঙালী ছিলেন তাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিচ্ছিলেন। একজনকে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, আলাপ কর। শ্রীমান রাসবিহারী বসু। আদি নিবাস চন্দননগরে। এখানকার ফরেস্ট অফিসের বড়বাবু।

মুখ তুলে দেখি হৃষ্টপুষ্ট শ্যামবর্ণ গদাই লস্কর-মার্কা একটি যুবক দাঁড়িয়ে আছে। পরনে কোঁচানো ধুতি, পিরান, গলাবন্ধ কোট, কাঁধে শাল। পায়ে বার্নিশ করা পাম্পশু, হাতে ঘড়ি, মাথায় কোঁকড়া চুল। তোমরা দেখলে বলতে, নেহাত দর্জিপাড়ার নতুনদা!

ছেলেটি বললে, আপনিই জিতেনবাবু? পূর্ণবাবুর সম্বন্ধী?

মুখে বললাম, হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলাম।

আর মনে মনে বললাম, হে গডাঢরচন্দর! তুমি বড়বাবু থেকে বড়তরবাবু হও! তোমাকে আমার কোন দরকার নেই।

স্থূলকায় যুবকটি সবিনয়ে বললে, আমাকে আবার 'আপনি' কেন? আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ!

মনে মনে এবার বললাম, হবে। তোমার হবে বাপু। চাকরিতে উন্নতি হবেই। বিনয়ের পরাকাষ্ঠা! অন্যান্য পরিচিতের দিকে ফিরলাম আমি। ছেলেটি কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরে বললে আপনি তো সাহারানপুরে থাকেন, নয়?

একটু রুক্ষভাবেই বলি, হ্যাঁ। কেন?

—আচ্ছা শুনেছি বছরখানেক আগে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন ভদ্রলোক সাহারানপুরে গিয়েছিলেন। বাঙালীটোলায় থাকতেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কি?

একটু অবাক হলাম। ভূতের মুখে রাম-নামটা আমি আশা করিনি। হ্যাঁ-না এড়িয়ে প্রশ্ন করি, কেন বলুন তো?

—ওঁকে আমার ভীষণ দরকার। এখন কোথায় আছেন খবর পাচ্ছি না। সাহারানপুর তো ছোট জায়গা। তাই ভাবলাম—

এবার স্বীকার করি, হ্যাঁ, যতীনবাবুকে আমি চিনতাম। আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

—চিনতেন? সাহারানপুরে কার বাড়িতে উঠেছিলেন উনি?

—আমাদের বাড়িতেই।

—তাই নাকি? তা এখন তাঁকে কোথায় পাব বলতে পারেন?

—তা ঠিক জানি না। তবে শুনেছি তিনি সন্ন্যাস নিয়েছেন। সন্ন্যাসাশ্রমে তাঁর নাম নিরালম্ব স্বামী।

রাসবিহারী উদাস হয়ে গেল, অস্ফুটে বললে, সন্ন্যাস নিয়েছেন! আশ্চর্য!

আমার কেমন যেন সন্দেহ হল। বলি, আপনার সঙ্গে যতীনবাবুর কতদিনের পরিচয়?

রাসবিহারী হেসে বলে, না পরিচয় আর হল কোথায়? একদিনের মাত্র আলাপ। ঐ যেদিন তিনি কলকাতা ছেড়ে চলে আসেন সেদিনই আপার সার্কুলার রোডের আখড়ায় সামান্য আলাপ হয়েছিল।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত আমি চমকে উঠি। ছেলেটি চন্দননগরের। তবে কি—? সামলে নিয়ে বলি, আপনি কি চন্দননগরের চারুবাবুর একটি চিঠি নিয়ে—

এবার ছেলেটি চমকে ওঠে। হক্‌চকিয়ে বললে, আপনি কেমন করে—

মাঝপথেই থেমে যায়। উঠে আপাদমস্তক আর একবার দেখে নিই। কিন্তু যতীনদা তো কখনই মানুষ চিনতে ভুল করেন না।

রাসবিহারী ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। বললে, কই বললেন না?

সে কথার জবাব না দিয়ে বলি, যতীন্দ্রনাথ তোমাকে একটা দু-মুখো তলোয়ারে বারে বারে শান্ দিতে বলেছিলেন, রাসবিহারী! তলোয়ারটায় মরচে ধরে নি তো?

রাসবিহারী বজ্রাহত হয়ে যায়। নিম্নস্বরে বলে, একটু বাইরে আসবেন?

সে-রাত্রে অনেক কথা হয়েছিল আমাদের দু-জনার।

কথা-প্রসঙ্গে আমি একদিন যতীন্দ্রনাথকে বলেছিলাম বিশ্বাসযোগ্য কর্মীর বড় অভাব। জবাবে যতীন্দ্রনাথ আমাকে বলেছিলেন, ভুল বললে জিতেন। কর্মী ছড়ানো আছে সারা দেশে। খুঁজে নেবার চোখ চাই। ঐ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, কলকাতা ত্যাগ করে চলে আসার দিনে চন্দননগরের একটি কিশোর এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে। দেখে বোঝা যায় না তার ভিতর আগুন জ্বলছে। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই সে এক কথায় যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিরুদ্দেশযাত্রায় সঙ্গী হতে চেয়েছিল। গল্পটা সবিস্তারে শুনিয়েছিলেন তিনি। রাসবিহারীকে দেখে গুরুর সেই উপদেশটাই আবার মনে পড়ল আমার : খুঁজে নেবার চোখ চাই।

দিন তিনেক আমি ছিলাম দেরাদুনে। আমি আমাদের গুপ্ত সমিতির অনেক কথা তাকে বলেছিলাম। সে-ও সাবিস্তারে বলেছিল তার দিকটা। আমার তখনই মনে হয়েছিল, ছেলেটি সত্যিই একখানা খাপেঢাকা তলোয়ার!

রাসবিহারী বেশ কিছুদিন বারীন্দ্রের আখড়ায় যাতায়াত করে। কিন্তু কি জানি কেন বারীন্দ্রকুমারের নেতৃত্বে সে খুশী হতে পারেনি। বারীন্দ্র ওকে গোপনতম আলোচনা চক্রে ডেকে নিতে কুণ্ঠা করেননি; কিন্তু রাসবিহারী পরিপূর্ণভাবে আত্মদান করতে পারেনি ওখানে।

আখড়ার নানান কাজে সক্রিয় অংশ নিয়েছে—মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করেছে, সেবা-শুশ্রূষায় অংশ নিয়েছে, গোপন নির্দেশ তামিল করেছে, কিন্তু সমস্ত ব্যবস্থাপনাটা তার ভাল লাগেনি। সে উৎকর্ণ হয়ে মাস ছয়েক প্রতীক্ষা করল—কখন উত্তর-ভারত থেকে তার আহ্বান আসবে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ তাকে ডাক দিলেন না। মুরারিপুকুর বাগানের বদ্ধ ঘরে ওর নিশ্বাস আটকে আসত। সিঙ্গাপুর থেকে কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত যে ষড়যন্ত্র জালের স্বপ্ন ওকে দেখিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেই পরিকল্পনাই ওকে হাতছানি দিত। শেষ পর্যন্ত আর স্থির থাকতে পারল না রাসবিহারী। লম্বা পাড়ি জমালো সে। কলকাতা থেকে সিমলা। গেল সে ছুটির অছিলায়—গ্রীষ্মাবকাশে; কিন্তু ফিরবার ইচ্ছে নিয়ে সে যায়নি। তাই ছুটি অন্তে সে আর ফিরল না। তার অন্য একটি কারণও ছিল। চন্দননগরের বাড়ি তখন ফাঁকা। ওর নিজের বোন সুশীলার বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন। তাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোড়লা গ্রামে। রাসবিহারীর বাবা বিনোদবিহারী তখন সপরিবারে সিমলাতে থাকেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয়পক্ষে তাঁর তিনটি পুত্রসন্তান হয়েছে। বড় ছেলে বিজনবিহারী, যার ডাকনাম ছিল ঘেঁটু। মেজ ছেলে পুলিন, আর ছোট বঙ্কিম বা ফচু। তিন ছেলে নিয়ে রাসুর বিমাতা তখন স্বামীর কর্মস্থলে থাকেন। বিনোদ বুঝলেন, তাঁর জেষ্ঠ্যপুত্রের পড়াশুনার এইখানেই ইতি। কলকাতার ফিরবার মন নেই তার। তিনি ছিলেন সরকারী ছাপাখানার একজন বিশ্বস্ত কর্মী, প্রভাবশালীও। পুত্রকে লাগিয়ে দিলেন ছাপাখানার কাজে। যাহোক কাজকর্মের মধ্যে লেগে থাকা ভাল। নিষ্কর্মার মন, শয়তানের ঘাঁটি।

কিন্তু শয়তান যার রক্তের মধ্যে বাসা বেঁধেছে তার আবার উদ্ধারের পথ কোথায়? অল্প কিছুদিনের মধ্যেই রাসবিহারী ছাপাখানায় এক কাণ্ড বাধিয়ে বসল। কি করে জানি ছাপাখানার কিছু গোপন তথ্য বের হয়ে গেল সংবাদপত্রে। বিনোদবিহারী আন্দাজ করলেন ঠিকই : এ কাজ শ্রীমানের। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের কে. সি. রায় তাঁর বন্ধু। তাঁরও হাত ছিল ঐ গোপন তথ্য ফাঁস হওয়ার ব্যাপারে। পুত্র ও বন্ধুর উপর নিদারুণ চটলেন বিনোদ। দায়িত্বটা তাঁরই। কাজের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠিন। পুত্রের বিপদাশঙ্কা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করলেন, ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখা উচিত। যথারীতি অনুসন্ধান হল, রিপোর্ট এল। অপরাধী খাতা কলমে ধরা পড়েনি। ধরাপড়ার মত সূত্র পিছনে ফেলে কাজ করা রাসবিহারীর ধাতে নেই। তা হোক, বিনোদবিহারী বুঝলেন সবই। পুত্রকে ডেকে বললেন, আমি জানি ; কী ভাবে এ ব্যাপারটা ঘটেছে। তুমি পদত্যাগ কর।

রাসবিহারী এক কথায় রাজি। তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করল সে।

শুধু পদত্যাগ নয়, ঐ সঙ্গে গৃহত্যাগ।

বিনোদবিহারী স্তব্ধ। এমনটা হবে আশঙ্কা করেননি তিনি। ছয়মাস রাসবিহারী নিরুদ্দেশ।

তারপর একদিন। শীতের গভীর রাত্রি। সিমলার শীত। বরফ পড়ছে। তার উপর ঐ সময় রাসবিহারীর বিমাতা কঠিন রোগগ্রস্তা। শয্যাশায়ী। তিনটি নাবালককে নিয়ে বিনোদবিহারী একেবারে নাজেহাল। হঠাৎ মধ্যরাত্রে দ্বারে করাঘাত হল।

দ্বার খুলে দিতেই ঢুকল রাসবিহারী। পুঞ্জ পুঞ্জ তুষার জমে আছে তাঁর মাথায়, কাঁধে। স্তম্ভিত বিনোদবিহারী বললেন, তুমি!

—মায়ের অসুখ শুনলাম, কেমন আছেন তিনি?

বোঝা গেল পিতা পুত্রের সন্ধান না রাখলেও পুত্র পিতার যাবতীয় সংবাদ রাখে।

প্রথমে ভেবেছিলেন কথাই বলবেন না। প্রচণ্ড অভিমান হয়েছিল বিনোদবিহারীর। কিন্তু চাকরি, অসুস্থা স্ত্রী আর নাবালক পুত্রসন্তানদের নিয়ে তিনি এতদূর বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন যে রাগটা দেখাবার সুযোগ পেলেন না। শোনা গেল সিমলার অদূরে কসৌলিতে রাসবিহারী একটি চাকরি নিয়েছেন। পাস্তুর রিসার্চ ইন্সট্যুটে। ভাইদের জন্য জামা-ইজের, নিকার-বোকার, মায়ের শাড়ি ও বাবার ধুতি চাদর বগলে নিয়ে বরফ-পড়া মধ্য-রাতে রোজগেরে ছেলে বাড়ি এসেছে। ছুটি নিয়েই এসেছিল। দুদিনে সুস্থ করে তুলল মাকে। সংসারের চাকা যথারীতি স্বচ্ছন্দগতিতে আবার চলতে শুরু করে। রাসবিহারী প্রশ্ন করে, সুশীলা কেমন আছে বাবা?

—ভালই বোধহয়। অনেকদিন তার চিঠিপত্র পাইনি।

বোধহয়! রাসবিহারীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। ঐ এক বেদনার স্থান তার। ছোট বোন সুশীলা তাঁকে মনেই করতে পারে না। সুশীলার বিবাহ হয়েছিল নয় বছর বয়সে। অষ্টমঙ্গলায় ফিরে আসে। দ্বিতীয়বার যখন সে শ্বশুরবাড়ি যায় তখন সে বিধবা। এই এক বছর বিবাহিত জীবনে জামাই এ বাড়িতে আসেনি একবারও। অপয়া বৌ বলে শ্বশুরবাড়িতে প্রথমে সুশীলাকে ঠাঁই দিতে চায় নি। যা হোক্ এখন সে মানিয়ে নিয়েছে। আহা সে সুখে থাক।

দু'চার দিনের মধ্যেই রাসবিহারী কর্মস্থান কসৌলিতে ফিরে গেল।

মাসখানেক পরে বিনোদ কসৌলিতে খবর পাঠালেন। লোক ফিরে এল। পাস্তুর ইন্সট্যুটে রাসবিহারী নামে যে ছোকরা কাজ করত সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে কোথায় নাকি চলে গেছে। তার ঠিকানা কেউ জানে না।

আবার পুত্রের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বিনোদবিহারীর।

রাসবিহারী এসেছিল দেরাদুনে। বনবিভাগের মস্ত অফিস ছিল ওখানে—ফরেস্ট রিসার্চ ইন্সট্যুট। ঐ দপ্তরে বীক্ষণাগারে কাজ করতেন সর্দার পুরণ সিং। তাঁর অধীনে ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্টেন্টের একটি চাকরি পেল সে। স্বনামধন্য কালিকৃষ্ণ ঠাকুরের পৌত্র প্রমথনাথ ঠাকুরের একটা বিরাট বাগান-বাড়ি ছিল দেরাদুনে। প্রায় এক বিঘা জমিতে আম লিচুর বাগান। প্রকাণ্ড চৌহদ্দি। তার এক প্রান্তে বোমা ফাটলে ও-প্রান্তে রাস্তা থেকে শোনা যাবে না। সেই প্রকাণ্ড বাগানের মাঝখানে ছিল 'টেগোর ভিলা'। বছরের প্রায় সব সময়েই সেটা খালি পড়ে থাকত। ন-মাসে ছ-মাসে কেউ কখনও বেড়াতে এলে আলো জ্বলত টেগোর ভিলায়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ঠাকুর পরিবারের লোকজন এখানে থাকতেন। এখন ফাঁকা। প্রাসাদ-সংলগ্ন আউট হাউসে থাকতেন এস্টেটের ম্যানেজার বা কেয়ার-টেকার—শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু। রাসবিহারীকে থাকতে দিল অতুলচন্দ্র। বিনা ভাড়ায়। মালিককে না জানিয়ে। শর্ত হল রাসবিহারী রান্নাটা করে দেবে। স্বপাক-রন্ধনের হাত থেকে মুক্তি-পাওয়ার লোভে ওকে আশ্রয় দিল অতুল। কিন্তু লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। রাসবিহারীর সংস্পর্শে এসে আমূল বদলে গেল অতুলচন্দ্র। ক্রমে ক্রমে ওখানে এসে জুটল আরও কয়েকজন। কোথা থেকে কেমন করে এসব লোককে রাসবিহারী ধরে আনে ঠাওর করতে পারে না অতুলচন্দ্র। এল হরিপদ বসু, শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম প্রথম অতুল বুঝতেই পারেনি ব্যাপারটা কী। অফিস থেকে ফিরে ঐ সব বন্ধুদের নিয়ে রাসবিহারী চলে যায় বাগানের ভিতর, ঘন বনে। ফিরে আসে রাত গভীর হলে। কী করে ওরা? অতুল নজর রেখেছে, কোন মেয়েছেলে কোনদিন নজরে পড়েনি। তা-

ছাড়া মদের গন্ধও পাওয়া যায়নি রাসবিহারীর গা থেকে। শেয়ানা লোক অতুল। একেবারে অজ্ঞাতকুলশীলকে সে ঠাঁই দেয়নি। রাসবিহারী মাস্টার মহাশয়ের সুপারিশ করা চিঠি দেখিয়েছিল তাকে। মাস্টারমশাই বলতে শশিভূষণ রায়চৌধুরী। দেরাদুনে শিক্ষকতা করতেন তিনি। এখন দৌলতপুরের ব্রজলাল হিন্দু অ্যাকাডেমিতে পড়ান। তাহলে এসব কী?

একদিন চেপে ধরল অতুলচন্দ্র, তোমরা অত রাত পর্যন্ত বাগানে কী কর?

রাসবিহারী অম্লানবদনে বললে, কথাটা তোমাকে রোজই বলব বলব ভাবি। আজ তুমিই কথাটা তুললে, শোন, তুমিও আমাদের দলে এস। আমাদের কিছু টাকার দরকার।

—টাকা! টাকা আমি দেবই বা কেন? পাবই বা কোথায়?

—দেবে মায়ের পূজায়। আর পাবে তোমার তহবিলে। আম লিচু ইজারা দিয়ে অনেক টাকা কামিয়েছ তুমি।

—বাঃ! সে কি আমার টাকা? সে তো কর্তামশায়ের।

রাসবিহারীর ছিল অদ্ভুত সম্মোহনী শক্তি। রাতারাতি সে বুঝিয়ে দিল ঐ 'ত্বয়া হৃশিকেশঃ' শ্লোকটার অর্থ। দেশের কাজে এ-ভাবে জমিদারী অর্থ বিনিয়োগে অতুলচন্দ্রের পাপ হতে পারে না। হ্যাঁ, হিসাবে একটু হেরফের করতে হবে বইকি! কিন্তু সে তো নিষ্কাম কর্ম! ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত।

আকাশ থেকে পড়ল অতুলচন্দ্র।

রাসবিহারী বললে, বিবেচনা করে দেখ অতুল—সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, রাজা সুবোধ মল্লিক, এমন কি তোমাদের ঠাকুর বংশেরই জ্ঞানেন্দ্রনাথ আমাদের টাকা যোগাচ্ছেন। পি. এন. ঠাকুরই বা সে পুণ্য অর্জন করবেন না কেন?

সংশয় যেটুকু ছিল তাও ধুয়ে-মুছে গেল যোগেন্দ্রনাথের কথাতে। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এলাহাবাদ হাইকোর্টের ডাকসাইটে অ্যাডভোকেট। কর্তামশায়ের আইন-ঘটিত কাজকর্ম দেখাশোনা করেন। পি. এন. ঠাকুরের চিঠি নিয়ে তিনি শরীর সারাতে এলেন দেরাদুনে। উঠলেন ঐ টেগোর ভিলায়। কী ফুস মন্তর ঝাড়লে রাসবিহারী তাঁর কানে, একদিন যোগেন্দ্রনাথ ম্যানেজারকে ডেকে বললেন, বাবা অতুলচন্দ্র! রাসুভায়া ভাল কাজই করছে। তুমি তোমার সাধ্যমত ওদের সাহায্য কর। অন্য কোনও দায়দায়িত্ব আমি নিতে পারব না, তবে টাকা-পয়সা সংক্রান্ত ব্যাপারে তোমার চাকরি নিয়ে যদি টানাটানি পড়ে আমাকে জানিও, আমি মালিককে ঠাণ্ডা করব। ও কানাইলালের বন্ধু! হীরের টুকরো ছেলে সব!

যেটুকু সন্দেহ ছিল তাও গেল। অতুল যোগ দিল ওর দলে।

সে-আমলে রাসবিহারীর কাজ ছিল তিন জাতির। প্রথমত ল্যাবরেটারী থেকে পুরণ সিং-এর চোখ এড়িয়ে অ্যাসিড আনা। সেটা দিয়ে হত বোমা তৈরীর চেষ্টা। দ্বিতীয়ত অবসর-প্রাপ্ত গুর্খা অফিসারদের কাছ থেকে একের পর এক সেকেণ্ড হ্যাণ্ড রিভলবার কিনে এনে লিচু-বাগানে পুঁতে রাখা। তৃতীয়ত রাত জেগে সে ফরাসী পড়ত। মাদাম কামা-র কর্মক্ষেত্র, একতামৈত্রী-স্বাধীনতার দেশ ফ্রান্সে তাকে যেতে হবে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করতে। যতীন্দ্রনাথের নির্দেশ সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছিল—কোন রকম বৈপ্লবিক বিস্ফোরণ সে ঘটতে দেয়নি। শুধু গোপনে সংগ্রহ করে যাচ্ছিল মারণাস্ত্র। গড়ে তুলেছিল একটা গোপনচক্র। তার স্বপ্ন ছিল সিঙ্গাপুর থেকে কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত এক সামরিক অভ্যুত্থান!

দেরাদুনে অনেকে চিনত তাকে। ভাল বেহালা বাজাতে জানে। সখের থিয়েটারে এক-

পায়ে খাড়া! লরেন্স ফস্টারের ভূমিকায় সে মুগ্ধ করেছিল দর্শকবৃন্দকে। গান বাজনার আসরে সে সবার আগে হাজির। বর্ণচোরা আমটিকে কেউ চিনতে পারেনি।

আমার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল রাসবিহারী। সেবার আমি দিন তিনেক ছিলাম দেরাদুনে। মুখে মুখে ওকে জানালাম, কোথায় কোথায় আমাদের ঘাঁটি আছে।

এ ঘটনা, আগেই বলেছি—উনিশ শ'ছয় সালের। আমি ভারতবর্ষ ত্যাগ করি তার চার বছর পরে। এই চার বছর বরাবর রাসবিহারী আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল। দীর্ঘ চার বছর ধরে আমরা শুধু সংগঠনকে গড়ে তুলেছিলাম। রাসবিহারী মাঝে মাঝে সাহারানপুরে আসত। সে-ই আমাকে বাঙলাদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। তার ভিতর একটি ছেলেকে আমি দেখেছিলাম—অদ্ভুত কর্মী। চন্দননগরের শ্রীশ ঘোষ। ঐ চার বছরের ভিতর সে বেশ কয়েকবার সাহারানপুরে আসে।

উনিশ শ' আটের আগস্ট মাস। আমি আর আমার সহকর্মী চিরঞ্জিতলাল সাধুর বেশে এ শহর থেকে ও-শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছি চাঁদা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। মিশনের সাধু দেখলে পুলিশ বেশী টানাহেঁড়া করত না। আমরা এসে আশ্রয় নিয়েছি দেরাদুনে সর্দার পুরণ সিং-এর ভবনে। পুরণ সিংজী-র দেবদ্বিজে ভক্তি ছিল—যদিও তিনি ছিলেন আকালী শিখ। এঁর অধীনেই রাসবিহারী চাকরি করত। সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা দুই সন্ন্যাসী বসে ওঁর বৈঠকখানায় ধর্মালোচনা করছি—শিখধর্ম আর হিন্দুধর্ম যে মূলত এক, এই সিদ্ধান্তে এসে পড়েছি প্রায়। রাসবিহারীও উপস্থিত ছিল। তার 'বস'-এর বাড়িতে সাধু-মহারাজ এসেছেন শুনে সেও হাজির। গরুড় পক্ষীর মত যুক্তকরে সে আমার অমৃতবাণী শুনছে। হঠাৎ রসভঙ্গ করলে টেলিগ্রাফ পিওন। আমার নামে এক জরুরী তার এসেছে।

গৃহস্বামী অবাক হয়ে বলেন, ইহাকা পাতা কৈসে মিলা? খবর তো আচ্ছা?

বললাম, জী হাঁ। মিশনের বড় মহারাজ জরুরী তলব করেছেন। আমাদের এখনই যেতে হবে।

—তো ভোজন কর লিজিয়ে।

আর ভোজন। কোন রকমে তখন বেরিয়ে পড়তে পারলে বাঁচি।

রাসবিহারী তার সাহেবকে বললে, সাধু মহারাজদের ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি স্যার?

—একদম ডিব্বামে বৈঠা দেনা। ঔর কুছ পুরী কচৌড়ি—

কিছু টাকা ধরিয়ে দেন রাসবিহারীর হাতে।

পথে নেমেই রাসবিহারী বলে, কি ব্যাপার জিতেনদা? কার টেলিগ্রাম?

বললাম, হরদায়ল তার করেছেন সাহারানপুর থেকে। আমাকে অবিলম্বে দেখা করতে বলেছেন।

রাসবিহারী হরদয়ালের নাম জানত, আলাপ ছিল না। বললে, ইচ্ছে হচ্ছে এখনই আপনার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। ওঁর সঙ্গে আলাপ করে আসি।

বললাম, তা হয় না ভাই। তাহলে তোমার সাহেব সন্দেহ করবেন।

সেই রাত্রেই চিরঞ্জিতকে নিয়ে হরিদ্বার হয়ে আমি ফিরে এলাম সাহারানপুরে। দেখা হল হরদয়ালের সঙ্গে। হরদয়াল বললেন, 'দীর্ঘ দিনের জন্য আমি বিলেত চলে যাচ্ছি। তিন দিন পরে আমার জাহাজ ছাড়বে বোম্বাই থেকে। তুমি এখনই চল আমার সঙ্গে দিল্লিতে। দিল্লি-গ্রুপের কয়েকজনের সঙ্গে দেশছাড়ার আগে তোমাকে পরিচিত করিয়ে দিতে চাই।'

আলাপ হল দিল্লি-গ্রুপের বিপ্লবীদের সঙ্গে। আমীরচাঁদের বাড়িতে।

আমীরচাঁদের বয়স তখন বছর চল্লিশ। দিল্লিতে স্কুলমাস্টারী করেন। বেশ সচ্ছল অবস্থা। সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন ছাত্রজীবন থেকেই। শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি একজন উৎসাহী কর্মী। বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে একজন সক্রীয় সেবক। আলাপ হল অবধবিহারীর সঙ্গে। সেও স্কুলের শিক্ষক। বয়সে আমীরচাঁদের চেয়ে অনেক ছোট—রাসবিহারীরই সমবয়সী। মাথায় টুপি, ছাঁটা গোঁফ। আর ছিল বালমুকুন্দ। সেও অবধবিহারীর সমবয়সী। বছর বাইশের জোয়ান। আর্টস গ্র্যাজুয়েট। পাঞ্জাবী। বাড়ি ঝিলম জেলার খৈরালা গাঁয়ে। চোখে স্বপ্নালু দৃষ্টি। আমীরচাঁদের সঙ্গে হরদয়ালের দীর্ঘদিনের পরিচয়। হরদয়াল প্রথমবার বিলেত যাবার আগে থেকেই।

হরদয়াল বোম্বাই থেকে রওনা হলেন আগস্টের শেষ সপ্তাহে। ঐ আগস্টমাসের শেষ দিনটিতেই আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের হাসপাতালে কানাই আর সত্যেন বধ করেছিল নরেন গোঁসাইকে।

সেবার বেশ কিছুদিন থাকতে হয়েছিল দিল্লিতে। তারপর সাহারানপুরে ফিরে এসে নতুন করে কাজ শুরু করলাম। এতদিন হরদয়াল ছিলেন, তার আগে ছিলেন যতীন্দ্রনাথ। এখন সব দায়িত্ব পড়ল আমার কাঁধে। দিল্লি থেকে দেরাদুন বিস্তীর্ণ এলাকায় যোগাযোগ রাখতে হত আমাকে। গুপ্ত সমিতির কার্যতালিকা স্বহস্তে রচনা করে বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিতাম।

আরও বছরখানেক পরের কথা। পাঞ্জাবের অজিত সিংজী 'ঝ্যাংশাল,' নামে একটি পত্রিকা বার করতেন। অজিত সিংজী আর সুফী অম্বাপ্রসাদ দুজনেই ছিলেন আমাদের গুপ্ত সমিতিতে—সেই যতীন্দ্রনাথের আমল থেকে। একটা ঝাঁজালো প্রবন্ধ বুঝি বার হল ঐ 'ঝ্যাংশাল' পত্রিকায়। সংখ্যাটা বাজেয়াপ্ত হল। পরদিন পুলিশ এল পত্রিকা অফিসে ঐ সংখ্যাগুলি খুঁজে বার করতে। কেঁচো খুঁড়তে সাপ! দুর্ভাগ্য আমার—থানা তল্লাসীর সময় আমার স্বহস্ত লিখিত ঐ গুপ্তসমিতির এক কপি পুলিশের হাতে পড়ে। তৎক্ষণাৎ সুফী অম্বাপ্রসাদ আর অজিত সিং-এর নামে বার হল গ্রেপ্তারী পরওয়ানা। দুজনেই সতর্ক ছিলেন। ছদ্মবেশে পাড়ি জমালেন পারস্যে। এতক্ষণে পুলিশ হদিস পেয়েছে হাতের লেখাটা কার। বুঝলাম আমার দিন শেষ হয়েছে। গা ঢাকা দিলাম। বেশ বুঝলাম সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে। কারণ ব্যারিস্টার হতে বিলেত না গেলেও ওরা আমাকে সাগর পারে না নিয়ে ছাড়বে না। সেলুলার জেলের পেটা ঘণ্টার আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম আমি!

'মহাজনস্য গতঃ' পন্থা অবলম্বন করলাম। দু'বছর পর আবার সাহারানপুর থেকে বড়-মহারাজ তার করলেন দেরাদুনে। তৎক্ষণাৎ এসে হাজির হল রাসবিহারী। তাকে সব কথা খুলে বললাম। এবার উত্তরখণ্ডের নেতৃত্ব তাকেই নিতে হবে। চব্বিশ বছরের তরুণটি স্বীকৃত হল। পরিচয় করিয়ে দিলাম দিল্লি-গ্রুপের সকলের সঙ্গে। আমীরচাঁদ, বালমুকুন্দ, অবধবিহারী, বলরাজ, ভাই পরমানন্দ আর রামশরণ দাসের সঙ্গে।

প্রৌঢ় আমীরচাঁদ রাসবিহারীর হাত দুটি ধরে বললেন, ভাইসাব! তুম্ হো বঙ্গালকা শের। হম্সব তুম্কো নেতা মানি লি!

তরুণ রাসবিহারী নতমস্তকে গ্রহণ করলো এ গুরুদায়িত্ব।

যতীন্দ্রনাথ দিয়ে গিয়েছিলেন অজিত সিং আর হরদয়ালকে। তাঁরা দিয়েছিলেন আমাকে। আমি সে দায়িত্ব ওকে বুঝিয়ে দিয়ে লম্বা পাড়ি জমালাম। বিলাতেও সে আমার সঙ্গে

চিঠিপত্রে যোগাযোগ রেখেছিল। একবার আমাকে অনুরোধ করে পাঠায় লণ্ডনের এক পুস্তক ব্যবসায়ীর মাধ্যমে কিছু স্মাগ্‌লড্‌ রিভলভার পার্সেলে পাঠাতে। আমি ব্যবস্থাও করেছিলাম; কিন্তু শেষপর্ব সেটা পাঠানো যায়নি। তার আগেই দিল্লির চাঁদনি-চকে ফাটলো একটা বোমা। সারা পৃথিবী কেঁপে উঠল সে বিস্ফোরণে। খোঁজ নিয়ে জানলাম রাসবিহারী নিরুদ্দেশ। পার্সেল পাঠাব কোন ঠিকানায়? লণ্ডনে বসে অবশ্য আমরা টের পায়নি লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমটা ঝাড়ল কে। এ-যে আমাদের দলের কীর্তি তাও জানতাম না।

শুনছি, রাসবিহারীর মৃত্যুর আঠাশ বছর পরে আজ নাকি স্বাধীন ভারতবর্ষে একটা ধুয়ো উঠেছে জাপান থেকে তার চিতাভস্ম ভারতে আনা হবে। এ বিষয়ে আমি কোন মতামত প্রকাশ করতে চাই না। শুধু একটা কথা বলব; আমি বিশ্বাস করি না, মৃত্যুশয্যায় রাসবিহারী অনুরোধ করে গিয়েছিল ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে যেন তার চিতাভস্ম ভারতে আনা হয়। এমন অনুরোধ করা তার ধাতে নেই। নিজের জন্য কখনও সে কারও কাছে কিছু চায়নি। দান গ্রহণ করেছে, অর্থ-রক্ত-হৃদ্‌পিণ্ড সমস্তই দু'হাত পেতে ভিক্ষা গ্রহণ করেছে—কিন্তু নিজের জন্য নয়, দেশের জন্য। আমি বরং শুনেছি মৃত্যুশয্যায় সে নাকি বলেছিল—তার দেহ যেন দাহ করা না হয়, তার মৃতদেহ সে টোকিওর মেডিক্যাল রিসার্চ ব্যুরোতে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিল, যাতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা ওর অস্থি-মস্তিষ্ক-মরদেহ নিয়ে গবেষণা করতে পারেন। সে ছিল প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। সুতরাং আপনারা মনে করবেন না, হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে আজ স্বাধীন ভারত যদি ঐ চিতাভস্ম সাড়ম্বরে আনতে চায় তবে, রাসবিহারীর প্রতি কোন সম্মান দেখানো হবে। জাপান একটা সত্যিকারের স্বাধীন দেশ। স্বাধীনতা সংগ্রামীকে কী করে সম্মান দেখাতে হয় তা তারা জানে। হোক সে বিদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী। মৃত্যুর পূর্বেই জাপ সম্রাট এই বিদেশী বিপ্লবীকে জাপানের সর্বোচ্চ সম্মান—'Second Order of the Merit of the Rising Sun' পদক দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। উদয় ভানুর প্রথম পূজারী—আড়াই হাজার বছরের বৃদ্ধ 'টেন্নো' জাপ-সম্রাট স্বয়ং। সুতরাং দ্বিতীয় পূজারী হওয়াই জাপানের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, বলতে পার—'জাপান রত্ন'! এমন কি, তার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে জাপ-সম্রাট তাঁর প্রাসাদ থেকে স্বর্ণখচিত রাজকীয় শবাধার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, রাসবিহারীর নশ্বর দেহ খাজুজী মন্দিরে শেষকৃত্যের জন্য বহন করে আনতে। রাজপরিবারের বাইরে কোন মরমানুষের দেহ এই শকটে বহন করা জাপানী প্রোটোকলে মানা। রাসবিহারীর ক্ষেত্রে সম্রাট কানুন লঙ্ঘন করেছিলেন!

তাই বলছিলাম, জাপান থেকে চিতাভস্ম আনবেন কি আনবেন না—সেটা আপনাদের ব্যাপার! এই অজুহাতে আবার একটি ডেলিগেশন সরকারী ব্যয়ে জাপান ভ্রমণ করে আসতে পারেন—আমি আপত্তি করব না। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই—একথা বলবেন না রাসবিহারী আপনাদের কাছে কোন আর্জি রেখে গেছে! স্বাধীন ভারতের কাছে সে যুক্তকর প্রার্থী! আজ্ঞে না!

উনিশ শ'তের-তে আমি ভারতবর্ষে ফিরে আসি। রাসবিহারী চন্দননগর থেকে কাশী হয়ে দেরাদুনে আসে। সেখানে এসে সে খবর পায়—আমি ভারতে ফিরে এসেছি, আর সহারানপুরে আছি। দুঃসাহসী ডাকাতটা কিছু দাড়ি-গোঁফ সেঁটে সোজা এসে হাজির হল আমার বাড়িতে। দিন সাতেক তাকে লুকিয়ে রেখেছিলাম আমার বাড়ির চিলে কোঠায়। একদিন ওকে বললাম, ওহে আজ তোমার এক ছবি টাঙানো রয়েছে দেখলাম সাহারানপুর স্টেশনে।

বললে, ছবিটা কি বাস্ট? গ্রুপ-ফটোর এন্‌লার্জমেন্ট?

—আরে না। সোলো-পোর্ট্রেট। সাইকেলে একটা হাত রেখে তুমি ক্যামেরাম্যানের দিকে তাকিয়ে হাসছ। তোমার এত ভাল ফটো আমি দেখিনি!

রাসবিহারী বললে, তাজ্জব! এমন ফটো আমি জীবনে তুলিনি। তা হ্যাঁ দাদা, ফটোটা আমার তো? ব্যাটারা ভুল করেনি কিছু?

—বললাম তো তোমার এত ভাল ছবি আমি দেখিনি।

রাসবিহারী আমার কোন নিষেধ শুনল না। গ্রাম্য পাঞ্জাবীর বেশে সে আমার সঙ্গে নিজে স্টেশনে গেল। জনাকীর্ণ রেল স্টেশন। ভিড় ঠেলে সে এগিয়ে গেল ছবিটার কাছে। ঠিক টিকিট কাউন্টারের পাশেই দেওয়ালে আঁটা আছে ছবিখানা। আঠারো ইঞ্চি বাই বারো ইঞ্চি! দুরুদুরু বক্ষে আমি ওর ঠিক পিছনে পিছনে এগিয়ে গেলাম। ডানহাত আমার পকেটে! হঠাৎ রাসবিহারী পিছন ফিরল। খাকি পোশাক পরা একজন দেশী সাহেবকে বিশুদ্ধ পাঞ্জাবীতে প্রশ্ন করল ঃ বাবুজি! কী লেখা আছে ঐ ইস্তাহারে?

রক্ত হিম হয়ে গেল। আমার জীবনে সে একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত !

পরদিনই হঠাৎ বলল, দাদা, আজ কেটে পড়ছি!

—কেন হে? হঠাৎ কি হল তোমার?

—এমন হঠাৎই হয়! বাতাসটা ভারী ভারী লাগছে! কেমন যেন টিকটিকির গন্ধ পাচ্ছি। টিকটিকির গন্ধ আমি একদম সইতে পারি না।

আশ্চর্য! সেদিন রাত্রেই সে চলে গেল। আর পরদিন সকালে আমার বাড়িতে এসে হাজির একজন বাঙালী সি. আই. ডি. অফিসার। মিস্টার সুনীল ঘোষ।

রাসবিহারীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, দিল্লি বোমার ব্যাপারটা। কোন কিছুই স্বীকার করল না। বললে, সে তো গত বছরের কথা দাদা! আগামী বছরের কথা বলুন!

এমনি অদ্ভুত ছিল তার মন্ত্রগুপ্তি। বস্তুত কে যে বোমাটা ছুঁড়েছিল সে-কথা রাসবিহারী কাউকে জানিয়ে যায়নি!

মতিলাল রায়ের জবানবন্দী

জিতেনবাবুর ঐ শেষ কথাটা কিন্তু আমি মানতে রাজী নয়। রাসবিহারীর মন্ত্রগুপ্তি ছিল অসাধারণ, একথা অনস্বীকার্য। শিষ্যদের প্রায়ই বলত : 'ডান হাতে বোমা ছুঁড়লে খেয়াল রেখ বাঁ-হাত যেন সেটা টের না পায়। কে জানে দেহচ্যুত ঐ বেটা বাঁ-হাত কখন আবার রাজসাক্ষী হয়ে বসবে!' দিল্লীতে গভর্নর জেনারেল-এর উপর বোমাবর্ষণের মূলনায়ক নিঃসন্দেহে রাসবিহারী। কে কেমন করে বোমাটা ছুঁড়েছিল সে-গল্প সে কাউকে সাড়ম্বরে কোনদিন শোনায়নি; কিন্তু তবু একজনের কাছ থেকে সে সেটা গোপন করতে পারেনি। সেই একজন হচ্ছে তার ডান হাতটা—পোড়াগাছার বসন্ত বিশ্বাস! আমিই তাকে সমর্পণ করেছিলাম রাসবিহারীর হাতে।

রাসবিহারীর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ উনিশ শ' এগারোর প্রথম দিকে। কিন্তু সে-কথা বলার আগে সংক্ষেপে আত্মপরিচয়টা দিয়ে রাখি :

রাসবিহারীর চেয়ে বয়সে আমি চার বছরের বড়। আমি বিহারীলাল রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। জন্ম বোড়াইচণ্ডীতলায়, চন্দননগরে। জাতে আমরা চৌহান বংশীয় ছেত্রী রাজপুত। আমার পিতামহ গোলকনাথ উত্তরপ্রদেশের মৈনপুর জেলা থেকে চন্দননগরে চলে আসেন। ফলে আমি তিনপুরুষের বাঙালী। মাত্র পনের বছর বয়সে আমি বিবাহ করি, উনিশ বছর বয়সে আমার একটি কন্যা সন্তান হয় এবং সে মাত্র দশ মাস বয়সে প্রাণত্যাগ করে। তারপর থেকেই ধর্মজগতের দিকে আমার প্রবণতা দেখা দেয়। আমার যৌবনকালেই বাঙলাদেশে, বিশেষ করে চন্দননগরে, স্বদেশী ও বিপ্লবী ঝোড়ো হাওয়া বইতে থাকে। আমিও ঐ দলে নাম লেখাই। চারুচন্দ্রের প্রভাবে ক্রমে কানাইলাল, শ্রীশ, ননীলাল, সাগরকালী ঘোষ, নরেন বাঁড়ুয্যে প্রভৃতির সঙ্গে বিপ্লবী দলে যোগ দিই। উনিশ শ' সাত সালে বিজয়া দশমীর দিন সন্ন্যাসী বেশে বারীন্দ্রকুমার চন্দননগরে এসে উপস্থিত হন। তিনি এসেছিলেন চারু রায় মাস্টারমশায়ের সঙ্গে দেখা করতে। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে তিনি চারুচন্দ্রের কথা আগেই শুনেছিলেন। এর পরই চুঁচুড়া স্টেশনের কাছে আমবাগানে আমরা একটি গোপন বিপ্লব-সমিতি স্থাপনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। সেদিন আমরা চারজন এই দীক্ষা নিয়েছিলাম: আমি, শ্রীশ, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আর বাবুরাম পরারকর। তার তিন বছর পরে আমার জীবনে আসে এক মাহেন্দ্রক্ষণ। উনিশ শ' দশের ফেব্রুয়ারী মাসে পলাতক বিপ্লবী অরবিন্দকে আমি আমার বাড়িতে আশ্রয় দিই। তাঁর আশীর্বাদে আমার নবজন্ম হল।

তার বেশ কয়েক বছর পরের কথা। ঘরে উপাসনা করি, বাইরে খেলাধূলা নিয়ে মেতে থাকি—গোপনে বিপ্লববাদীদের কাজে সাহায্য করি। এই সময় স্থানীয় তরুণদের নিয়ে আমি 'ভেল্-দিগ্-দিগ্ বা 'হা-ডুডু' খেলার একটা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলাম। তারই ফাইনাল খেলা হচ্ছে সেদিন। মাঠে প্রচুর লোক হয়েছে। মাঝখানে একটা টেবিলে সাজানো আছে প্রকাণ্ড রূপার শিল্ড। আমারই ভক্তবন্ধু সাগরকালী ঘোষ সেটা কিনে দিয়েছিলেন। ঐ শীল্ডটা ঘরে আনাই ছিল সেদিন আমার লক্ষ্য। চন্দননগরের স্থানীয় আমরা ছয় জন প্রাণপণে

লড়ছি বিপক্ষদলের ছয় জনের বিরুদ্ধে। ওরা স্থানীয় দল নয়। কলকাতা থেকে এসেছে। বাসন্তী স্পোর্টিং ক্লাব। আমার বয়স তখন চল্লিশ, কিন্তু ঐ বয়সেও আমার শরীর ছিল অটুট। ভিড়ের মধ্যে একেবারে সামনের সারিতে একটি যুবক দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে আমাদের খেলা দেখছিল মনে আছে। কি জানি কেন বারে বারেই তার দিকে নজর যাচ্ছিল আমার। লক্ষ্য করে দেখি, তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে শ্রীশ। শেষ পর্যন্ত আমাদেরই জয় হল। শীল্ড নিয়ে আমাদের ছেলেদের সে কী মাতামাতি। শ্রীশ এসে জড়িয়ে ধরল আমাকে। শ্রীশের পাশ থেকে ঐ ফর্সা হৃষ্টপুষ্ট ছেলেটি এগিয়ে এল। ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে হেসে বললে, কন্‌গ্র্যাচুলেশন্স!

জয়ের আনন্দে আমি এমনই একটু উজ্জ্বল ছিলাম। ওর প্রসারিত হাতটি গ্রহণ না করে ওকে একেবারে বুকে টেনে নিলাম। বললাম, ম্লেচ্ছ কায়দায় কেন ভাই? অভিনন্দন জানাতে চাও তো আলিঙ্গন কর।

হৈ-হৈ করতে করতে আমরা বাড়ি এলাম। শ্রীশের সঙ্গে ঐ ছেলেটিও এল। অনেক রাত পর্যন্ত হৈ-হুল্লোড় হল। ছেলেটি কিন্তু চুপ করে অপেক্ষা করছিল। শ্রীশকে জিজ্ঞাসা করলাম, ছেলেটি কে হে?

—আমার ভাই, রাসু—রাসবিহারী। তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

ঘর ফাঁকা হলে আমি তাকে কাছে ডেকে নিলাম। ও প্রথমেই বললে, তোমার বয়স কত?

বললাম, চল্লিশ, কেন?

—এ বয়সেও এত দাপাদাপি সহ্য হয়?

হেসে বলি, তা হয়।

শ্রীশ বললে, মতিলাল যে যোগ করে।

—যোগ!—রাসবিহারী বিস্মিত হয়। তার মানে?

বললাম, অল্প কথায় তা তো বোঝাতে পারব না ভাই।

—বেশ, না হয় বিস্তারিতই বল। আমার ধৈর্য অসীম।

—তাহলে কাল বিকালে গঙ্গার ধারে আদালতের পিছনে ফেরি ঘাটে এস। রাত্রে তুমি আমার এখানেই ঠাকুরের প্রসাদ খেয়ে যেও।

পরদিন সন্ধ্যায় ফেরিঘাটে কয়েকজন বিপ্লবী তরুণকে নিয়ে আমি যথারীতি সান্ধ্য-ভ্রমণ করছিলাম। এখানেই আমরা নির্দিষ্ট সময়ে মিলিত হতাম। ফেরিঘাটে লোকের ভিড়ে কেউ আমাদের নজর করত না। লোক চলাচলের সড়কটা ছেড়ে আমরা নাবালের দিকে নেমে কথাবার্তা বলতাম। একটু পরে শ্রীশের সঙ্গে রাসবিহারী এসে হাজির। আমি অন্যান্য ছেলেদের একে একে বিদায় দিয়ে রাসবিহারী আর শ্রীশকে নিয়ে বোড়াইচণ্ডীতলার-শ্মশানঘাটের দিকে এগিয়ে গেলাম। দীর্ঘ সময় আমি তাকে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলে গেলাম। অরবিন্দের কাছে যে আত্মসমর্পণ যোগ শিখেছি, তার কথা বলতে থাকি। আজ আমি নিশ্চিত জানি প্রবহমান গঙ্গার স্রোতের সামনে মহাশ্মশানের একান্তে বসে রাসবিহারী সেই অস্তসূর্যউদ্ভাসিত সন্ধ্যায় যে যোগতত্ত্বের কথা শুনেছিল, গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ বা অটোমেশনের কথা শুনেছিল, তা আমি সজ্ঞানে বলিনি। কোন্ মন্ত্রশক্তিতে আমার জিহ্বায় আদ্যাশক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল। আমি অনর্গল আত্মসমর্পণ যোগের কথা বললাম। রাসবিহারী সমস্ত অন্তর দিয়ে আমার তত্ত্ব ব্যাখ্যা শুনল। কোন কথা বলল না। আমরা তিনজনে আমার বাড়ি ফিরে

একত্রে আহারে বসলাম। আমার স্ত্রী পরিবেশন করছিলেন। রাসবিহারী একবার চকিতে তাঁর দিকে তাকালো। আমার স্ত্রী রাধারাণী মাথার ঘোমটা টেনে দিলেন একটু।

আহারান্তে আমি ওকে বিদায় দেবার জন্য এগিয়ে গেলাম। গলিপথের ভিতর আমার বাড়ি। প্রায় পঞ্চাশ হাত গলিপথ অতিক্রম করে ঁবোড়াইচণ্ডী মন্দিরের কাছে বড় রাস্তা। আমি ওদের দুজনকে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দেব বলে চাদরটা গায়ে দিয়ে বের হলাম। রাসবিহারী হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, বুঝেছি, এই যে আমি আহার করলাম, এই যে তোমার সঙ্গে কথা বল্‌ছি—এর কর্তা আমি নই, সবই অটোমেশন হচ্ছে। এইভাবে আমি যদি ভারতের বিপ্লব সাধনের পথে চলি, সে আদর্শে পৌঁছাতে যদি আমাকে প্রাণ দিতে হয় তবে আমি তার কর্তা হব না। ঈশ্বরই আমাকে যন্ত্রের মত চালাচ্ছেন, তিনিই যন্ত্রী! কেমন তো?

আমি হেসে বললাম, ঠিক তাই!

রাসবিহারী বললে, এই সোজা কথাটা শিরে আমাকে এতদিন বোঝাতে পারেনি। আবোল-তাবোল কী বকে গেছে আমি কিছুই বুঝিনি। তুমি অল্প কথায় আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছ ভাই। তোমাকে আমি মতিলাল নামে ডাকব না, তুমি সত্য উদ্‌ঘাটন করেছ আমার কাছে। তাই তোমার নাম—প্রকাশ।

আমি পুনরায় তাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করলাম।

শ্রীশ এগিয়ে গিয়েছিল। রাসবিহারী একটু ইতস্তত করে নিম্নকণ্ঠে আমাকে প্রশ্ন করল, একটা কথা। কিছু মনে কর না। আমাদের যিনি আহার পরিবেশন করেছিলেন উনি কে?

—আমার স্ত্রী!

রাসবিহারী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। অবাক বিস্ময়ে বলে, তুমি বিবাহিত?

—হ্যাঁ।

—তোমার সন্তানাদি আছে?

—একটি কন্যা হয়েছিল। মারা গেছে।

রাসবিহারীর মুখের উপর একটি বেদনার ছায়া পড়ল। ম্লান জ্যোৎস্নালোকে নজরে পড়ল আমার। কি জানি কেন মনে হল সে ম্লানিমা আমার শিশুকন্যার মৃত্যুজনিত কারণে নয়। বললাম কী ভাবছ?

—ভাবছি? না কিছু নয়।

হেসে বলি, আমি জানি তুমি কী ভাবছ! এতক্ষণ ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে তোমাকে যা বলেছি তা হঠাৎ তোমার কাছে নিরর্থক হয়ে গেছে রাসবিহারী, তাই নয়?

রাসবিহারীও হেসে বলে, তুমি কি অন্তর্যামী?

শ্রীশ দূর থেকে হাঁকাড় পাড়ে, আবার কি হল রে? তোদের বিদায় নিতে রাত কাবার হয়ে যাবে নাকি?

রাসবিহারীর হাতটা চেপে ধরে বলি, কাল একপ্রহর রাতে ঐ শ্মশানঘাটে আর একবার আসবে? তোমাকে আমার আরও কয়েকটা কথা বলার আছে। একথা কাউকে বলিনি, সবাইকে বলা যায় না। তোমাকে বলব!

আসব—বলে রাসবিহারী ছুটে চলে গেল শ্রীশের কাছে।

সেদিন বুঝিনি ভেল্ দিগ্ দিগ্ খেলায় জয়ী হয়ে কী শীল্ড আমি ঘরে এনেছি।

মায়ের অসুখের খবর পেয়ে সেবার রাসবিহারী দীর্ঘ ছুটি নিয়ে চন্দননগরে আসে। ঐ

উনিশ শ' এগারো সনের প্রথম দিকে। সে বছর আরও দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—মোহনবাগানের শীল্ড জয়, আর সেট্‌লড্-ফ্যাক্ট বঙ্গভঙ্গ অ্যান্‌সেট্‌লড্ হওয়া। কিন্তু যে মর্মান্তিক অপমান ব্রিটিশ সিংহ বাঙালীর হাতে পেল তার শোধ না তুলে তারা ছাড়ল না। নির্দেশ এল—কলকাতা আর ভারতের রাজধানী থাকবে না, রাজধানী স্থানান্তরি করা হবে দিল্লিতে।

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের কথা থাক। রাসবিহারীর পরিবারের উপর দিয়েও এই সময় বয়ে গেল প্রচণ্ড এক কালবৈশাখী! রাসবিহারীর বিমাতার শরীর দিন দিন খারাপ হচ্ছিল। চিকিৎসায় কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। বিনোদবিহারীও ছুটি নিয়ে রোগজীর্ণ স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সংসারে আছে আরও চারটি নাবালক। রাসবিহারীর বৈমাত্রেয় তিন ভাই এবং বোন। সর্বকনিষ্ঠ এই বোনটি তখন মাত্র এক বছরের। রাসবিহারীর বিমাতা তার চেয়ে মাত্র কয়েক বৎসরের বড় ছিলেন। তাঁর জীবনপ্রদীপ তিল তিল করে নিবে আসছিল। মৃত্যুর মাত্র দু'দিন আগে এক দুর্ঘটনায় তাঁর দ্বিতীয় পুত্র পুলিন বিশ্রীভাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে যায়। এ-ঘরে মৃত্যুশয্যায় শায়িতা বিমাতা আর ও-ঘরে অগ্নিদগ্ধ ছোট ভাই—রাসবিহারীর স্নানাহারের সময় নাই। শ্রীশ তখন ওর একমাত্র ভরসা। দু-জনে পালা করে রাত জাগে। শেষ সময়ে তিনি রাসুর হাত দুটি ধরে তাকেই শেষ কাজ করার অধিকার দিয়ে গেলেন। জানিয়ে গেলেন তাঁর অন্তিম অনুরোধ—দেরাদুনে ফিরে গিয়ে রাসু যেন হরিদ্বারে তাঁর শ্রাদ্ধ করে।

রাসবিহারী মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললে, তুমি কিচ্ছু ভেব না মা। আমি তো রইলাম। আমি এদের দেখব।

কিন্তু মানুষে কতটুকু দেখতে পারে? যে নাবালক ভাইবোনদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে রাসবিহারী মৃত্যুপথযাত্রিণীকে শেষ সান্ত্বনা নিয়েছিল তারই একজন অগ্নিদগ্ধ পুলিন, মায়ের মৃত্যুর তৃতীয় দিনে মারা যায়।

বিনোদবিহারী একেবারে পাথর হয়ে গেলেন।

আদ্যশ্রাদ্ধের পরে রাসবিহারী একদিন বাবার কাছে এসে বললে, আপনি এমনভাবে ভেঙে পড়লে তো চলবে না। মায়ের মৃত্যু, পুলিনের মৃত্যু—এ সবই তো তাঁরই নির্দেশে হয়েছে। আপনার আরও সন্তান আছে, তাদের প্রতি আপনার কর্তব্য আছে। মনকে শক্ত করুন।

বিনোদবিহারী গড়গড়ার নলটা সরিয়ে রেখে বললেন, তুমি একে ঈশ্বরের নির্দেশ বল? আমার এতবড় সর্বনাশ—

রাসবিহারী বললে, বাবা আমিত্ব ভুলুন। নিজেকে উত্তমপুরুষ একবচনে নয়, তৃতীয় পুরুষরূপে কল্পনা করুন। উত্তমপুরুষ আছেন অলক্ষ্যে। তিনিই আপনাকে নিয়ে এ পরীক্ষা করাচ্ছেন। আপনি তো ভগবৎ-বিশ্বাসী! কেন বুঝতে পারছেন না আপনি?

বিনোদবিহারী নিমীলিত নেত্রে ওর কথা বুঝবার চেষ্টা করেন।

আবার দুদিন পরে ফিরে এল রাসবিহারী। বললে, মা আমাকে শ্রাদ্ধাধিকারী করে গেছেন। তিনি শেষ অনুরোধ করে গেছেন যেন তাঁর শ্রাদ্ধ হরিদ্বারে হয়। আমি কর্মস্থলে এবার ফিরে যাব বাবা।

বিনোদবিহারী বললেন, কিন্তু এই নাবালকদের দেখবে কে? সুশীলাকে কি শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে আসব?

যেন কেউ ওর বেদনার স্থানে মাড়িয়ে দিয়েছে! রাসবিহারী আর্তকণ্ঠে শুধু বললে, না!

বিনোদবিহারী চম্‌কে ওঠেন সে কণ্ঠস্বরে।

রাসবিহারী লজ্জিত হয়। অবনতমস্তকে বলে, বাবা! সুশীলাকে আমরা কী দিতে পেরেছি? সমাজ কী দিয়েছে? সে জন্মদুখিনী। এতদিন পরে সে যদি শ্বশুরবাড়িতে মন বসিয়ে থাকে, তবে তাকে আর টানাটানি করবেন না। আনন্দের দিনে তাকে আমরা কখনও এনেছি যে, আজ দুঃখের দিনে বোঝা বইতে তাকে ডাকতে যাব?

বিনোদবিহারীর চোখ সজল হয়ে ওঠে—বলেন, কিন্তু এদের—

—এদের দায় আমার। আমি ওদের দেরাদুনে নিয়ে যাচ্ছি। মাসিমার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি কিছুদিন গিয়ে সংসারটা গুছিয়ে দিয়ে আসবেন।

এদিককার সমস্ত ব্যবস্থা করে রাসবিহারী দেরাদুনে ফিরে গেল। কথা থাকল, তিনদিন বাদে বিনোদবিহারী সপরিবারে দেরাদুনে উপস্থিত হবেন। যাবার দিনে রাসবিহারী এসেছিল আমার কাছে। অন্যান্য কথাবার্তার পরে বললে, প্রকাশ, তোমায় সব কথা প্রকাশ করে বলিনি। উত্তরপ্রদেশে আমাদের একটা ঘাঁটি আছে। আমি আজ রাত্রে দেরাদুনে ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু পূজার ছুটিতে, সেপ্টেম্বরের শেষে আবার আমি ফিরে আসব। আমি শুনেছি ঢাকার অনুশীলন সমিতির সঙ্গে তোমার যোগাযোগ আছে। আমি দুজন খুব সাহসী তরুণ কর্মী চাই। একটা বিশেষ প্রয়োজনে। তুমি দিতে পারবে?

আমি হেসে বললাম, কী শর্তে?

ও-ও হেসে বললে, তাদের আর ফেরত দেব না, এই শর্তে!

বললাম, ওটা তো, তোমার শর্ত নয়—পরিবর্তে তরুণ দুটি কী পাবে?

—বৈপ্লবিক বিস্ফোরণে প্রথম শহীদ হওয়ার সম্মান!

—তুমি কি কোন পরিকল্পনা করেছ?

ও বললে, পূজার ছুটির সময় ফিরে এসে তোমাকে সব বলব। তুমি শুধু ইতিমধ্যে দু-জন সাহসী তরুণ কর্মী যোগাড় করে রেখ।

দেরাদুনে ঘোষী-মহল্লায় একখানা দ্বিতল বাড়ির উপরতলায় তখন রাসবিহারীর আস্তানা। টেগোর ভিলায় যাতায়াত আছে, কিন্তু বাস করে না সেখানে। বিনোদবিহারী তিনদিন পরে সপরিবারে এসে উঠলেন এ বাড়িতে। মাসিমা ঘরের ভিতর উঁকি দিয়ে দেখে বললেন, এ কী রে রাসু। এ তোর কেমন সংসার?

মাসিমার দোষ নেই। রাসবিহারীর রান্নাঘরে আছে একটা কলায়ের থালা, একটা কড়াই এবং একটি কেট্‌লি আর দুজোড়া কাপ ডিশ। শয়নকক্ষে মাটিতে বিছানো একটি দেশী কম্বল। গায়ে দেবার জন্য আর একটি কম্বল। বালিশ পর্যন্ত নেই, বেহালার বাক্সটাই সে কাজ করে থাকে।

বিনোদবিহারী বলেন, হাঁড়ি পর্যন্ত নেই! তোমার রান্না হয় কিসে?

রাসবিহারী সলজ্জে বলে, ঐ কেট্‌লিতেই ফুটিয়ে নিই, হবিষ্য বই তো নয়।

—এখন না হয় হবিষ্য! কিন্তু তার আগে?

—ঐ কেট্‌লিতেই চলে যেত। বল মাসিমা, কি কি আনতে হবে? এখানে সব পাওয়া যায়।

বেহালার বাক্সটা দেখিয়ে মাসিমা বলেন, এখনও বাজাস?

ম্লান হাসলে রাসবিহারী।

শ্রাদ্ধ যথারীতি সম্পন্ন। বিনোদবিহারীর ছুটি শেষ হয়েছিল। তিনি সিমলাতে ফিরে গেলেন। ভাইবোন আর মাসিমাকে নিয়ে রাসবিহারী সংসারী হল।

কিন্তু মাসিমার কেমন যেন সন্দেহ হয়। মাঝে মাঝে নানান জাতের লোক আসে রাসবিহারীর কাছে। দুজন রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারীকে দেখা যেত। দু-চারজন বিদেশী লোক। তারা কী ভাষায় কথা বলে বিন্দুবিসর্গ বোঝাই যায় না। রুদ্ধদ্বার কক্ষে রাসবিহারী ওদের সঙ্গে কী সব কথাবার্তা বলে। কখনও মধ্যরাত্রে বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে ভোরবেলা। মাসিমা একদিন চেপে ধরলেন ওকে, হ্যাঁরে রাসু। তোর কাছে এত লোক কেন আসে রে?

রাসবিহারী হাসে। বলে, ওরা আমার বন্ধু! ফুর্তি-ফার্তা করতে আসে।

—তুই কি সন্ন্যাসী হবি?

রাসু হেসে বলে, ষাট বালাই! এমন কথা ভাবলে কেন তুমি?

—নাহলে ঐ দুজন ব্রহ্মচারী কেন ঘুর ঘুর করে তোর পিছনে?

—ওরা ভাল কাজই করে মাসিমা! তুমি এখানে হয়তো এমন অনেক কিছু দেখবে, যার মানে বুঝবে না। শুধু একটা কথা বিশ্বাস কর মাসিমা, তোমার রাসু সজ্ঞানে কোন অন্যায় কাজ করবে না।

মাসিমার চোখ ছলছল করে। বলেন, সে কি আর আমি জানি না রে? তেমন ছেলে পেটে ধরেনি ভুবন।

সে বছর সেপ্টেম্বরে সত্যিই চন্দননগরে ফিরে এল রাসবিহারী। আমার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করল, আমার জিনিস যোগাড় হয়েছে?

বললাম, হয়েছে। পরশু সন্ধ্যার পর এস।

রাসবিহারী একটু ইতস্তত করে প্রশ্ন করে, একটা কথা, প্রকাশ। আচ্ছা একথা কি সত্য যে, মাস্টারমশাই শ্রীঅরবিন্দকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেছিলেন?

বলি, ঠিকই শুনেছ তুমি।

ও একটু চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। শেষে বলে, শ্রীশ বলেছিল আমাকে। আমার ঠিক বিশ্বাস হয় নি। ইতিমধ্যে আর ওঁর সঙ্গে দেখাও করিনি আমি। আচ্ছা মাস্টারমশায়ের কী সত্যিই কোন পরিবর্তন হয়েছে?

বললাম, পরিবর্তনই তো জীবন রাসবিহারী! কিন্তু ভুল বুঝ না যেন। মাস্টারমশায়ের উপর দিয়ে যে ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে তাতে তাঁকে সাবধান হতে হয়েছে একটু।

রাসবিহারী ব্যাপারটা জানতে চাইল। আমিও বিস্তারিত জানালাম।

মানিকতলা বোমা কেসে চারুচন্দ্রও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। অরবিন্দ আর চারুচন্দ্রের কথা চিন্তা করেই সকলে বেশী বিব্রত। শ্রীশ বা আমি ধরা পড়িনি। শ্রীশই প্রথমে একদিন গিয়ে জেলের ভিতর কানাইলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসে। হঠাৎ একদিন আমাকে এসে জানালো, কাল আলিপুর জেলে গিয়ে কানাইয়ের সঙ্গে দেখা করে এলাম। সে তোমাকে একদিন যেতে বলেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কেমন করে ঢুকলে?

—সোজা জেলের গেটে গিয়ে বললাম আমি কানাইলাল দত্তের আত্মীয়। তার সঙ্গে

দেখা করতে চাই। ওরা আমাকে জেলারের কাছে নিয়ে গেল। তিনি বাঙালী, ব্রাহ্মণ, সদাশয় লোক। এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন।

আমি ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় শ্রীশ জানালো লোহার শিক দেওয়া একটা লম্বা পাঁচিলের একদিকে বন্দীরা দাঁড়িয়ে থাকে, অপর দিকে তাদের আত্মীয়-স্বজন দাঁড়ায়। গোয়েন্দা-পুলিশ থাকে আশে-পাশেই কিন্তু তাদের ফাঁকি দেওয়া নাকি খুব সহজ। বিশেষত জেলার ভদ্রলোক খুব সজ্জন। একটু দূরে টেবিল-চেয়ার পেতে তিনি বসে থাকেন। কথাবার্তায় বিশেষ কান দেন না।

আমি সে সময় জজ হেন্ডারসন্ অফিসের নগণ্য কেরানী। একদিন ছুটি নিয়ে কানাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ওর সঙ্গে আমার যথেষ্ট হৃদ্যতা হয়েছিল। সেই মঁসিয়ে তার্দিভেলকে হত্যার সময় থেকে।

রাসবিহারী বাধা দিয়ে বললে, ও ব্যাপারটাও আমি জানি না। কানাইয়ের সঙ্গে তোমার কি করে কবে আলাপ হল?

হেসে বললাম, তুমি চন্দননগরের ছেলে অথচ এদিককার কোন খবরই রাখ না। উত্তর-ভারতে বসে দল পাকাতে ব্যস্ত।

রাসবিহারীও হেসে বললে—কি করব বল ভাই? সবই তো অটোমেশন! আমি নিজে তো কিছু করছি না—তিনি করাচ্ছেন! যা হোক কানাইয়ের সঙ্গে কেমন করে আলাপ হল আমাকে বিস্তারিত বল তো। তার সঙ্গে আমার একদিনের বন্ধুত্ব হয়েছিল মাত্র। একদিনেই বন্ধুত্ব খতম।

অগত্যা পূর্বস্মৃতি রোমন্থনে ফিরে যাই আমি।

১৯০৭ সালের কথা। রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করে আমরা আমাদের সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনের আয়োজন করি। কিন্তু আমাদের দলের কয়েকজন তরুণ সদস্যের নাম পুলিশের খাতায় থাকায় ফরাসী পুলিশ সেই সভাক্ষেত্র ঘিরে থাকল। শেষ পর্যন্ত আমরা সভার অধিবেশন বন্ধ করলাম। রবীন্দ্রনাথকে আসতে মানা করে খবর দেওয়া হল। এতে, বলাবাহুল্য, আমরা নিরতিশয় অপমানিত বোধ করেছিলাম। তারপর হাঠখোলার মাঠে আমরা একটি অনাড়ম্বর সভায় শ্যামসুন্দরকে আহ্বান করে আনি। কিন্তু ফরাসী পুলিশ এই সভাটিকেও ছত্রভঙ্গ করে দিল। আমরা চন্দননগরের মেয়র মঁসিয়ে তার্দিভেলের কাছে দরবার করতে গেলাম; কিন্তু স্বাধিকার-প্রমত্ত তার্দিভেল আমাদের হাঁকিয়ে দিলেন।

ঐ দিনই আমরা সংকল্প করলাম, ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। আমি, আমার সহকারী বন্ধু ননীলাল দে, সাগরকালী ঘোষ আর শ্রীশ প্রতিজ্ঞা করলাম অত্যাচারী মঁসিয়ে তার্দিভেলকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

ননীলাল বললে, আমাদের রিভলবার নেই, বোমাও নেই, আমরা কেমন করে তার্দিভেলকে হত্যা করব?

আমি বললাম, আমি সে ব্যবস্থা করছি।

চারুবাবুর কাছে শুনেছিলাম ওঁর শিষ্যদলের মধ্যে একজন দুর্ধর্ষ বিপ্লবী আছে—কানাইলাল দত্ত। আমার ধারণা হল, সে নিশ্চয় আমাদের একটা রিভলভার যোগাড় করে দেবে। এই আশায় একখণ্ড কাগজে একটি ছোট চিঠি লিখে কানাইলালকে পাঠিয়ে দিলাম, 'তুমি যদি

নির্ভীক হও, আমার সঙ্গে বোড়াইচণ্ডীতলার শ্মশানঘাটে আজ রাত্রি বারোটার সময় সাক্ষাৎ কর। দেশ ও জাতির প্রয়োজনে এ আহ্বান।' চিঠিতে কোন নাম থাকল না। কানাইলাল চিঠি পেয়ে ঠিক বারোটায় শ্মশানে এসে হাজির। আমাকে দেখে হেসে বলল, আমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম। এ তোমারই কাজ। কানাইকে সব কথা খুলে বললাম। কানাই আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললে, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করার ব্যবস্থা করছি। তবে রিভলভার নয়, বোমা দিয়ে কাজ সারতে হবে।

—বোমা ঠিক মত ফাটবে তো?

—তা ফাটবে। কথা হচ্ছে যে ফাটাতে যাবে সে যেন নির্ভীক হয়।

এগারোই এপ্রিল রাত্রে মঁসিয়ে তার্দিভেলের ডিনার টেবিলে বোমা নিক্ষিপ্ত হল; কিন্তু বোধ করি ছোঁড়ার দোষে সেটা ফাটল না। মঁসিয়ে তার্দিভেল প্রাণে বেঁচে গেলেন। সারা শহরে হৈচৈ পড়ে গেল। কানাই পরদিন সকালে এসে বললে, আমি আগেই বলেছিলাম, মতিদা। কার্যোদ্ধারের চেয়ে পালানোর চেষ্টা বড় হলে কাজ হয় না। I'm disgusted with these attempts to murder. আমার যখন দিন আসবে তুমি দেখে নিও মতিদা, আমি এমন আধা খেঁচড়া কাজ করব না।

কানাই সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল। সে কথাই বলব এবার।

মঁসিয়ে তার্দিভেল প্রাণে বেঁচে গেলেন বটে কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। কিছুদিনের মধ্যেই এই অত্যাচারী শাসক তল্পিতল্পা বেঁধে ফ্রান্সে ফিরে গেলেন। কানাইয়ের ডাক কিছুদিন পরেই এল।

চৈত্রমাস শেষ হল। বৈশাখের প্রখর রৌদ্রে মাঠ খাঁ খাঁ করছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা কানাই আমাকে গঙ্গার ঘাটে ডেকে নিয়ে গেল। ঘাটে অনেক লোক ছিল। আমরা পায়চারি করতে করতে একটু দূরে গেলাম। কানাই মুখটা আমার কানের কাছে এনে বললে, মতিদা আমার ডাক এসেছে। আমি চললাম।

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম। দীর্ঘ নাসিকা, দুটি ওষ্ঠপুটের ফাঁকে হাসির একটা আভাস। চশমার উপর জ্যোৎস্না পড়ে চিকচিক করছে। কানাই বললে, আপাতত কলকাতায় যাচ্ছি। 'পি-এম্' করার কাজে খাঁটি লোকের বড় অভাব হয়েছে? দেখছ না, এলেন সাহেব, এ্যাণ্ড্রুজ ফ্রেজার, তার্দিভেল ঃ সর্বত্রই শুধু attempts to murder। তার কারণ কি জান? কার্যসিদ্ধ নয়, পালাবার চিন্তাটাই শেষ সময়ে বড় হয়ে পড়ে।

কানাইয়ের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করলাম, তুমি কি করবে?

দৃঢ়স্বরে সে বললে, প্রাণের চেয়ে পি-এম টাকে বড় করে দেখব।

'পি-এম' সাঙ্কেতিক ভাষা ঃ Political Murder, রাজনৈতিক হত্যা।

কানাই বললে, আমাকে মজঃফরপুরে যেতে হবে। কিংসফোর্ড আমার টার্গেট। তুমিই শুধু জানলে!

আমি সব শুনলাম। তার পরদিন ও এসে দেখা করল আমার সঙ্গে। বললে, তোমার কাছ থেকে চিরবিদায় নিতে এসেছি বন্ধু। দাদাকে কিছু বলিনি। মাকে বলেছি যে চাকরির চেষ্টায় কলকাতা যাচ্ছি।

কানাইলালের বিধবা মা, কয়েকটি অনূঢ়া বোন এবং একজন দাদা আছেন। দাদা—

আশুতোষ দত্ত, আমার সহপাঠী। কানাই সেবার বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছে। তখনও ফল বার হয়নি। সে চলেছে বিপ্লব যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে। কী প্রশান্ত তার মুখচ্ছবি। কোন উদ্বেগ নেই, কোন উত্তেজনা নেই। বল্‌লাম এ-কাজের জন্য অন্য লোক পাওয়া গেল না?

কানাই হোহো করে হেসে উঠল। তারপর নিম্নকণ্ঠে বললে, একদিন যখন তোমার ডাক আসবে মতিদা, তখন কি তুমি অন্য লোকের সন্ধান করবে?

আত্মস্থ হলাম। সত্যই তো! সেন্টিমেন্টাল হওয়ার কী আছে? কানাই নির্বাচিত হয়েছে। এতো তার পরম সৌভাগ্য।

আমরা গঙ্গার ঘাট থেকে বাড়িতে ফিরে এলাম। এই সময় আমার সান্ধ্য জলযোগ এসে পৌঁছালো। কানাইকে বললাম, কানাই এটা তুমি খাও।

—পরোটা! বাঃ, বাঃ! গ্র্যাণ্ড! কিন্তু—

—কিন্তু কি?

কানাই মুখটা আমার কানের কাছে এনে বললে, কে জানে এই হয়তো তোমার বাড়ি আমার শেষ খাওয়া। এস, এক প্লেট থেকেই দুজনে খাই।

আহার বিষয়ে আমার অনেক বিধি-নিষেধ ছিল; কিন্তু ও অনুরোধ আমি না রেখে পারিনি। এক প্লেটে থেকেই আমরা দুজনে দুটো পরটা খেলাম। তারপর কানাই আমাকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিল।

কানাইয়ের সঙ্গে মুক্ত পৃথিবীতে সেই আমার শেষ সাক্ষাৎ।

কানাই ষোলোই এপ্রিল চন্দননগর ত্যাগ করল। কিছুদিন পরে শ্রীশ এসে খবর দিল, দুজন তরুণ নাকি কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে মজঃফরপুর গিয়েছে। তার মুখেই শুনলাম, যাওয়ার আগে তারা অরবিন্দের চরণে প্রণত হলে তিনি তাদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন। আন্দাজ করলাম, দুজন তরুণের একজন আমাদের কানাই। দ্বিতীয়জন কে?

পয়লা মে কাগজে বার হল মজঃফরপুরে বোমা ফাটার সংবাদ। ক্ষুদিরাম ধরা পড়ল। প্রফুল্ল চাকি আত্মহত্যা করল। তবে কানাই কোথায় ছিল? শুনলাম, শেষ মুহূর্তে কানাইয়ের বদলে অন্য বিপ্লবী নির্বাচিত হয়েছিল।

পরদিন মুরারিপুকুর বাগান ঘেরাও করে একলপ্তে চৌত্রিশজন বিপ্লবীকে পুলিশে ধরল। গোপীমোহন দত্তের গলি থেকে ধরা পড়ল কানাই। ঐ সঙ্গে ধরা পড়লেন বিপ্লব-যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক শ্রীঅরবিন্দ; চন্দননগর থেকে চারুচন্দ্র। আমরা চোখে অন্ধকার দেখলাম। সমস্ত দেশব্যাপী পুলিশের অত্যাচার শুরু হল। যাঁরা ধরা পড়েননি, তাঁরা নেতার অভাবে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। ঐ মে মাসেই আমরা চারজন চুঁচুড়া স্টেশনের কাছে আমবাগানে মিলিত হই। যে বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপের উপর আঘাত এসেছে তা যেন অঙ্কুরে বিনষ্ট না হয় তার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। সে গুপ্তসভায় উপস্থিত ছিলাম আমি, শ্রীশ, উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্র আর সখারাম গণেশ দেউস্করের ভাগ্নে বাবুরাম পরারকর।

যে কথা বলছিলাম। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে আমি একদিন কানাইয়ের সঙ্গে জেলে দেখা করতে গেলাম। অনুমতি পেতে অসুবিধা হল না।

সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট সময়ে ওদিকে সার দিয়ে সব বিপ্লবীরা দাঁড়িয়েছেন। অনেকেরই

আত্মীয়স্বজন এসেছে দেখা করতে। আমাকে দেখতে পেয়ে কানাই এগিয়ে এল। বললে, এই যে! এতদিনে সময় হল?

কী জবাব দেব ভেবে পেলাম না। কানাই আমাকে চিনিয়ে দিল সকলকে। বারীন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ, উল্লাসকর, হেমেন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র। জিজ্ঞাসা করলাম, শ্রীঅরবিন্দ আসেননি?

—তিনি সচরাচর আসেন না। ধ্যানেই থাকেন সারাদিন।

চারুবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করায় বললে, তিনি সাধারণত আসেন না। ধরা পড়ার পর তিনি খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন। আমাদের কারও সংসারের দুর্ভাবনা নেই। মাস্টারমশায়ের কথা আলাদা। তিনি বোধহয় স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের কথা চিন্তা করেই বিব্রত আছেন।

লক্ষ্য করে দেখলাম গরাদের ওপারে যাঁরা আছেন তাঁদের কোনও উদ্বেগ নেই। রীতিমত হাসি-মসকরা চলেছে। কানাই এদিক ওদিক দেখে নিয়ে বললে, মতিদা, আমাদের বাইরে লুকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করতে পার? আমরা সবাই দলবদ্ধভাবে পালাব। বাইরে কে কোথায় আশ্রয় নেবে তার ব্যবস্থা করতেই তোমায় ডাকা।

আমি অবাক হয়ে বলি, সে কি হে। দল বেঁধে কেমন করে পালাবে?

—সে সব তোমার শুনে কাজ নেই। ব্যবস্থা তলে তলে হচ্ছে। যে ব্যবস্থাটা এখান থেকে করতে পারছি না সেটা হচ্ছে বাইরে আমাদের আশ্রয় দেওয়ার আয়োজন। পারবে?

কানাইয়ের পরিকল্পনা আমার কাছে নিছক পাগলামি বলে মনে হল। প্রশ্ন করলাম, শ্রীঅরবিন্দ, চারুবাবু অথবা বারীন্দ্র এতে রাজী আছেন।

কানাইয়ের ভ্রূযুগলে কুঞ্চন দেখা দিল। বললে, শ্রীঅরবিন্দের কথা থাক। তাঁর সঙ্গে এখন কোন কথা আলোচনা করা যায় না। মাস্টারমশাই এ প্রস্তাবে রাজী নন, তিনি সাহায্য করবেন না, পালাবার চেষ্টাও করবেন না। তবে আমাদের বাধাও দেবেন না।

—আর বারীন্দ্রকুমার?

কানাই একটুক্ষণ কী ভাবল। তারপর বললে, তোমাকে খুলেই বলি মতিদা। ওঁদের attitude-এর ভিতর কোন সঙ্গতি খুঁজে পাচ্ছি না। ধরা পড়লে আমরা কোন স্বীকৃতি দেব না, এই ছিল শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ। বিপ্লবীরা কোন স্বীকারোক্তি করবে না, এই ছিল আমাদের Code of conduct! অথচ বারীন্দ্রকুমার ইত্যাদি যাঁরা আমাদের নেতা তাঁরা এদের একের পর এক বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছেন। সত্য-মিথ্যা জানি না, শুনেছি বারীন্দ্রকুমার তাঁর দাদাকে বাদ দিয়ে বাকি সকলের নাম প্রকাশ করেছেন। আমাদের তরুণদলের কয়েকজন তাঁকে প্রশ্ন করেছিল, তাতে তিনি বলেছেন—আমাদের সকলেরই হয় ফাঁসি অথবা দ্বীপান্তর হবে। আমরা কী করতে চেয়েছিলাম তা দেশকে জানিয়ে যাওয়া কর্তব্য!

বুঝলাম নেতৃত্বে ভাঙন ধরার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

কানাই বললে, ওঁরা নেতৃস্থানীয়। আমরা ওঁদের সমালোচনা করতে চাই না। কিন্তু অহেতুক আন্দামানে পচে মরতে চাই না আমরা কজন। তাই আমরা জনা-দশেক পালাবার আয়োজন করেছি। তুমি আমাদের ব্যবস্থা করতে পারবে?

—ভেবে দেখি। করতেই হবে কিছু একটা। কিন্তু বারীন্দ্রবাবু যা বলছেন, তাও তো মিথ্যা নয়। তোমাদের প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়ে গেল তখন দুনিয়াকে সব কথা জানিয়ে যাওয়াই কি ঠিক নয়?

ধক করে জ্বলে উঠ্‌ল কানাইয়ের চোখ দুটো। বলল, না! A revolutionist is supposed to die unknown, unwept unlamented! কী করলাম সারাটা জীবন? এতদিন মাস্টারমশায়ের কাছে টার্গেট প্র্যাকটিস্ করেছি কি এইজন্য? একবারও আমাকে সুযোগ দেওয়া হল?

দুরন্ত অভিমানী কানাইলাল!

ঘণ্টা পড়ল। সাক্ষাৎকারের সময় শেষ হওয়ায় আমি বিদায় নিয়ে চলে এলাম। আলিপুরের মামলা শুরু হল। বারীন্দ্রকুমার প্রমুখ কয়েকজন নেতা মুক্তকণ্ঠে বিপ্লবের কথা ঘোষণা করলেন। বারীন্দ্রকুমার ভেবেছিলেন—ওঁদের চরম দণ্ড হবে। ভবিষ্যৎ তরুণেরা প্রেরণা পাবে। তাই অরবিন্দকে তা থেকে বাদ দিয়ে তিনি আর সকলের অপরাধের কথা স্বীকার করলেন! বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তির ফলেই শ্রীরামপুরের নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী গ্রেপ্তার হল দুদিন পরে। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত নরেন্দ্র রাজসাক্ষী হয়ে গেল। সে তার স্বীকারোক্তিতে শ্রীঅরবিন্দকেও জড়িয়ে নিতে কসুর করল না। বুঝলাম—ভরাডুবি আসন্ন।

পলাতক বন্দীদের আশ্রয় দেবার ব্যবস্থা কতদূর কি করতে পেরেছি সে কথা জানাবার জন্য আমি আবার কানাইয়ের সঙ্গে দেখা করলাম। কানাই প্রথম সাক্ষাতেই বললে, দূর! পালাতে যাব কোন্ দুঃখে?

অবাক হয়ে বলি, সে কি! সেদিন তুমিই তো বললে—

বাধা দিয়ে কানাই বলে, ইতিমধ্যে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে মতিদা। যে দুঃখে সেদিন পালাতে চেয়েছিলাম, সে অভাব আজ আর নেই।

—কিসের অভাব ছিল তোমার সেদিন? পেয়েছই বা কি?

—My target ! এখন প্রয়োজন রিভলভারের। পারবে মতিদা?

অবাক হয়ে বলি, এখানে তুমি টার্গেট পেলে কোথায়?

—মীরজাফর!

বুঝলাম। সংক্ষেপে প্রশ্ন করি, নেতৃত্বের অনুমোদন পেয়েছ?

দাঁতে দাঁতে চেপে কানাই বললে, বাসুদেব চাপেকোরের কথা মনে আছে মতিদা? তার দাদারা তাকে ছোট ছেলে বলে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, নিজের target সে নিজেই বেছে নিয়েছিল। আমিও অনুমতি পেয়েছি! নিজের বিবেকের কাছে! ব্যাস! দুটো রিভলভার যোগাড় করতে পার?

—দুটো? দুটো কি হবে?

–Because I'am disgusted with these attempts to murder! মেদিনীপুরের সত্যেন আমার সঙ্গে আছে। দুজনে ওকে একযোগে আক্রমণ করব। মীরজাফর যাতে প্রাণ নিয়ে পালাতে না পারে—

—কিন্তু—

বাধা দিয়ে কানাই বললে, কোন 'কিন্তু' নেই মতিদা! বুঝতে পারছ না? নরেনের ক্রস্-এগজামিনেশন হয়নি এখনও! শ্রীঅরবিন্দকে বাঁচাবার এ-ছাড়া পথ নেই। ঐ নরেনের এভিডেন্স ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে আর কোন প্রমাণ পায়নি পুলিশ। আমরা সবাই মরে যদি তাঁকে বাঁচাতে পারি তাহলেই বাঙলায় বিপ্লববাদ বাঁচবে!

বুঝলাম তীক্ষ্ণধী কানাই সেন্টিমেন্টের বশে কিছু করছে না। ইতস্তত করে বলি, রিভলভার না হয় যোগাড় করলাম, তোমাকে পৌঁছে দেব কেমন করে?

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে কানাই, কেন? শ্রীশের হাতে। তার অসাধ্য কাজ নেই!

রাসবিহারী বাধা দিয়ে বললে, বাকিটা আমি জানি।

জিজ্ঞাসা করলাম, জান? তুমি জান; উপেন্দ্রনাথ আর হেমচন্দ্র এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতেন অথচ বারীন্দ্রকুমার জানতেন না?

রাসবিহারী বললে, না অত বিস্তারিত জানি না। আচ্ছা তুমি বলে যাও।

শ্রীশকে সব খুলে বলতেই সে বললে, একটা রিভালবার আমার কাছে আছে। গোন্দলপাড়ার নরেন বাঁড়ুয্যে আমাকে দিয়েছিল। দ্বিতীয়টা কোথায় পাই?

যা হোক শেষ পর্যন্ত দুটি যন্ত্রই যোগাড় হল। একটা R.I.C, ৪৫০ বোরের বড়, যেটা কানাই ব্যবহার করেছিল; আর একটা ছোট ৩৮০ বোরের, অস্‌বর্ন কোম্পানির। যেটা সত্যেন চালিয়েছিল।

নরেন গোঁসাই ধরা পড়েছিল পাঁচই মে। তেইশে জুন সে রাজসাক্ষী হয়। চব্বিশ তারিখ থেকে সে জবানন্দী দিতে শুরু করে। তার বিপদের আশঙ্কা আছে বুঝতে পেরে কর্তৃপক্ষ তাকে ইউরোপিয়ান-ওয়ার্ডে সরিয়ে আনলেন। ইতিমধ্যে আমাদের দেওয়া যন্ত্র পৌঁছে গেলে সত্যেন অসুস্থ হয়ে পড়ার ভান করে। তাকে ইউরোপিয়ান-ওয়ার্ডের সংলগ্ন হাসপাতালে সরিয়ে আনা হয়। সত্যেনের যে সত্য সত্যই অসুখ করেনি এটা বিপ্লবীদের অনেকে বুঝতে পেরেছিলেন। ঐ সময়েই শোনা গেল, শ্রীঅরবিন্দ আদেশ জারি করেছেন, কেউ কেউ জেলের কষ্ট সইতে পারছে না বলে হাসপাতালের আরাম খেতে যাচ্ছে। এটা অত্যন্ত গর্হিত! অসুস্থ হলেও অতঃপর কেউ যেন না হাসপাতালে যায়।

অরবিন্দ দিবারাত্র ধ্যানে থাকেন। তিনি এমন আদেশ কি করে জারি করলেন, কেউ বুঝল না। আসলে ব্যাপারটা যাতে সন্দেহ উদ্রেক না করে তাই উপেন্দ্রনাথ আর হেমচন্দ্র শ্রীঅরবিন্দের অজ্ঞাতেই তাঁর বেনামে এই আদেশ জারি করেছিলেন। তাঁরা জানতেন।

সেদিন বিকেলবেলা কানাই পেটের ব্যাথায় চীৎকার শুরু করল। ডাক্তার তাকে হাসপাতালে নিতে চাইলেন। অবিনাশচন্দ্র শ্রীঅরবিন্দের নিষেধের কথা তুলে আপত্তি জানালেন। কানাই খিঁচিয়ে ওঠে: আপনি বাঁচলে বাপের নাম! ওসব আমি মানি না।

কম্বল বগলে জড়িয়ে কানাই হাসপাতালে চলে গেল!

যাঁরা আসল কথা জানতেন না তাঁরা ছি ছি করলেন। কানাইয়ের এত অধঃপতন!

৩১শে আগস্ট। ইউরোপিয়ান-ওয়ার্ডে একজন কনভিক্ট ওয়াচম্যান এসে খবর দিল হাসপাতালের একজন রোগী, সত্যেন বসু রাজসাক্ষী হতে চায়—সে এ বিষয়ে নরেন গোঁসাই-এর সঙ্গে কথা বলতে চায়। উৎফুল্ল হয়ে ওঠে নরেন। সে তখন দেখা করতে যেতে চায়। কিন্তু ইউরোপিয়ান ওয়ার্ডের ইনচার্জ সতর্ক অফিসার। সে ডেকে পাঠাল কন্সটেবল হিগিন্সকে সশস্ত্র দেহরক্ষীর জিম্মায় সে নরেন গোঁসাইকে যেতে দিল হাসপাতালে। তখন সকাল সাতটা। হাসপাতালের ডিস্‌পেন্সরিতে রোগীরা সার দিয়ে দাঁড়িয়ে। হাসপাতালের কাছে এসে নরেন দেখল দ্বিতলে বারান্দায় সত্যেন বসে আছে। ওদের আসতে দেখে সে এক নম্বর ওয়ার্ডের দিকে এগিয়ে যায়। হিগিন্স আর নরেন সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলে উঠে আসে। কানাই থাকে অন্য

ওয়ার্ডে। নিতান্ত ঘটনাচক্রই বলতে হবে, দেখা গেল কানাই একটা আলোয়ান গায়ে ডিস্‌পেন্সারির দিকে এগিয়ে আসছে।

কানাইকে দেখে নরেন একটু সচকিত হয়ে ওঠে। সত্যেন ওকে চোখ টিপে বলে, কানাইও রাজসাক্ষী হতে চায়।

ইতিমধ্যে কানাইও এগিয়ে এসেছে। হিগিন্স কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। ওরা তিন জনে কথা বলতে বলতে একটু এগিয়ে যায়। হঠাৎ একটা পিস্তলের আওয়াজ শুনে সচকিত হিগিন্স ঘুরে দাঁড়ায়। বাঁচাও বাঁচাও—চীৎকার করতে করতে ছুটে আসছে নরেন, তার হাতে লেগেছে গুলি। তার পিছন পিছন ছুটে আসছে সত্যেন আর কানাই। হিগিন্স কোমর থেকে রিভলভার বার করার সময় পায় না। সত্যেনকে সে একটা ধাক্কা মারে আর কানাইয়ের হাত চেপে ধরতে চায়। কানাই ফায়ার করে। নির্ভুল তার টিপ! হিগিন্সকে সে হত্যা করতে চায় নি। হিগিন্সের হাতের একটা আঙুল উড়ে যায়। ইতিমধ্যে সিঁড়ি দিয়ে নরেন নেমে এসেছে। চীৎকার করতে করতে সে ছুটছে ইউরোপিয়ান-ওয়ার্ডের নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে। কানাই আর সত্যেন ছুটে নেমে আসে সিঁড়ি বেয়ে। তারাও ছুটছে ওর পিছনে। দ্বিতীয় একটা ফায়ার হল। গুলিটা লাগল নরেনের কোমরে। তবু খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে ছুটছে। ইতিমধ্যে লিস্টন নামে আর একজন কনভিক্ট দৌড়ে এসেছে। সত্যেনকে একটা ধাক্কা মেরে সে ফেলে দিল, কানাইয়ের দিকে অগ্রসর হতেই কানাই প্রচণ্ড আঘাত করল ওর মাথায় পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে। সে আঘাতে লিস্টনের মাথা ফেটে গেল বটে তবু সে জড়িয়ে ধরল কানাইকে। নরেন তখন একটু দূরে মাতালের মত টলছে, আর চলতে পারছে না সে। প্রচণ্ড আয়াসে ধস্তাধস্তি করতে করতে কানাই তার ডান হাতখানা ছাড়িয়ে আনল লিস্টনের বজ্রমুষ্টি থেকে। পিস্তলের শেষ গুলিটা ছুটল! ঘুরে পড়ল নরেন নর্দমার মধ্যে। মুহূর্তে মৃত্যু হল তার। সেদিকে তাকিয়ে তৃপ্তির হাসি হাসল কানাই। ছুঁড়ে ফেলে দিল পিস্তলটা দুজনেই ধরা দিল বিনা প্রতিবাদে। আরব্ধ কাজ শেষ হয়েছিল তাদের।

এর পর যথারীতি বিচারের পালা। নিম্ন আদালতের গণ্ডি পার হয়ে হাইকোর্টে গেল মামলা। একুশে অক্টোবর রায় বার হল। কানাই আর সত্যেন দুজনেরই মৃত্যুদণ্ড হয়েছে।

কানাইকে আপিলের জন্য সাতদিন মাত্র সময় দেওয়া হল। কানাই সে কথা শুনে একটিমাত্র ছত্রে জানিয়ে দিল তার বক্তব্য : There shall be no appeal! আশু দাস আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে সংবাদটা যখন জানালেন তখন রসায়নের পণ্ডিত রসিকের মত বলেছিলেন: কানাই শিখিয়ে গেল হে! shall আর will-এর ব্যবহার করতে ভবিষ্যতে আর কেউ ভুল করবে না।

সত্যেন ছিল ব্রাহ্মসমাজের লোক। মৃত্যুপথযাত্রীকে আশীর্বাদ জানাতে আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীমশাই গিয়েছিলেন জেলের ভিতর। সত্যেন আর কানাই ছিল একই জেলে। দুজনের সঙ্গেই দেখা করলেন স্থিতপ্রজ্ঞ ব্রহ্মবাদী। কিন্তু শুধুমাত্র সত্যেনকে আশীর্বাদ করেই জেল থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। বৃদ্ধ আচার্যকে যিনি হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি বললেন—সত্যেনের মত কানাইকেও আপনি বরং আশীর্বাদ করে আসুন।

শাস্ত্রীমশাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। বলেন, বল, কি হে? দেখলে না, সে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ! বহু তপস্যা করলে যদি কেউ তাকে আশীর্বাদ করার যোগ্যতা লাভ করতে পারে!

চারুচন্দ্র সমস্তটা শুনে কানাইয়ের সঙ্গে দেখা করলেন, বললেন, কানাই, তুমি কি খুব

উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল? না হ'লে পিস্তলের সব কটা গুলিই নরেনের উপর ছুঁড়লে কেন?

কানাই তার স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্যে বললে, I wanted to do it, Sir and I did it!

ওর মাস্টারমশাই বলেন, না, আমি বলছিলাম, শেষ গুলিটা তুমি নিজের জন্য রাখলে না কেন? প্রফুল্ল চাকির মত?

কানাই মুখ তুলে একটু হাসল, বললে, সে পরামর্শ তো আপনি দেননি স্যার?

চারুচন্দ্র সচকিত হয়ে বললেন, আমি তখন কোথায়? আমি কি বলব?

—আজ্ঞে না। আমি চন্দননগরের সেই সন্ধ্যাবেলার কথাটা বল্‌ছি। আমি তো সেদিনই বলেছিলাম, পলাশীর যুদ্ধশেষে বেঁচে থাকলে শেষ গুলিটা নিয়ে আমি মুর্শিদাবাদে ফিরে আসতাম। আপনি তো বলেননি—সেটা ভুল!

দীর্ঘশ্বাস পড়ল চারুচন্দ্রের। বললেন, You are perfectly right, my boy!

রাসবিহারী বললে, মতিলাল, তুমি গুলিয়ে ফেলছ। আমি তোমাকে চারুবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কানাইয়ের কথা নয়।

বললাম, জানি ভাই। কিন্তু কানাইয়ের কথা উঠলেই আমার বুকের ভিতর মুচড়ে ওঠে। এসব কথা বলার লোকও পাই না। আজ তোমাকে বলে মনটা হালকা হল। চারুবাবুর কথা বরং আর একদিন শোনাব।

পরামর্শ মত তৃতীয় দিনে আবার এল রাসবিহারী। সঙ্গে শ্রীশ। আমারই বাড়িতে। আমার বাড়ি গোপন ষড়যন্ত্রের ভারি সুবিধাজনক জায়গা। গলির মোড়ে একজন যদি ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করে তাহলেই নিশ্চিন্ত। ওখান থেকে চারদিকে নজর রাখা চলে।

সেদিন উপস্থিত ছিলাম আমরা তিনজন। উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্র, অনুশীলন দলের প্রতুল গাঙ্গুলী আর আমি। তিন মাস আগেই রাসু আমাকে বলে গিয়েছিল অনুশীলন দলের সঙ্গে সে যোগাযোগ করতে চায়। দুটি দুঃসাহসী তরুণকে সে চায়। তাই আমার আমন্ত্রণে অমর আর প্রতুল এসেছিল রাসবিহারীর সঙ্গে মিলিত হতে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সেজবাতি জ্বলছে ঘরে। আমার প্রিয় শিষ্য, তখন মাত্র পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক অরুণচন্দ্র দত্ত প্রহরায় আছে গলির মোড়ে। ঐ বয়স থেকেই ছেলেদের দিয়ে কাজ করাতে হত আমাদের—ছোটোখাটো কাজ। এখন যেমন অরুণকে দেওয়া হয়েছে ছোট্ট একটি দায়িত্ব। তার কাজ হচ্ছে সন্ধ্যা সাতটা থেকে আটটার মধ্যে তাকে এক ঠোঙা চিনেবাদাম চিবিয়ে শেষ করতে হবে ঐ গলির মোড়ে বসে—বন্ধুরা ডাকতে এলে উঠে যাবে না। ঠায় বসে থাকবে। গলির ভিতর অচেনা কাউকে ঢুকতে দেখলে সে রামপ্রসাদী সুরে গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠবে—'মা আমায় ঘুরাবি কত।' আর অচেনা লোকের বদলে যদি শিরেদা বা রাসুদা আসে তবে তাকে গাইতে হবে—'বাঙলার মাটি, বাঙলার জল!'

ঐ বালখিল্য দ্বার রক্ষকের ভরসাতেই আমরা নিশ্চিন্ত মনে আলোচনা করি।

প্রতুল বলে, রাসবিহারীবাবুর কথা শুনে আপনার কি মনে হল মতিদা? উত্তর-ভারতে সে ব্যাপক আয়োজন করতে পেরেছে? কোথায় কোথায় ঘাঁটি আছে তার?

বললাম, কী জানি ভাই। ও বড় চাপা। কিছুই ভাঙেনি। মন্ত্রগুপ্তিতে ওর ভয়ানক বিশ্বাস। শুধু তোমাদের দলের সঙ্গে পরিচিতি হতে চায়।

অমরেন্দ্র বলে, বুঝলাম, কিন্তু দু'জন তরুণ কর্মী সে কেন চেয়েছে? কোনও পি. এম.-

এর পরিকল্পনা আছে নিশ্চয়। সেটা আমাদের জানা দরকার।

বলি, সে তো নিজেই আসছে। জিজ্ঞাসা কর।

এই সময়েই ভেসে এল বালক কণ্ঠে সুরেলা আওয়াজ: 'বাঙলার মাটি, বাঙলার জল' —ঐ এসে গেছে।

একটু পরেই রাসবিহারী আর শ্রীশ এসে হাজির। পরিচয়পর্ব সমাপ্ত হতেই রাসবিহারী বললে, আপনাদের দুজনেরই নাম শোনা ছিল। আজ পরিচয় হল।

অমরেন্দ্র বললে, রাসবিহারীবাবু, আপনি দু-জন নির্ভীক তরুণ কর্মী চেয়েছিলেন—

বাধা দিয়ে রাসবিহারী বলে, হ্যাঁ! যোগাড় হয়েছে?

অমরেন্দ্র বললে, হয়েছে। কিন্তু তাদের নাম বলার আগে আমি জানতে চাই, তাদের দিয়ে কী জাতীয় কাজ আপনি করাতে চান?

রাসবিহারী আমার দিকে একনজর দেখে নিয়ে বললে, 'আমি করাতে চাই, কথাটা ঠিক নয়। আমি নিমিত্তমাত্র। আমরা যন্ত্র শুধু। সবই অটোমেশন। তবে পরিকল্পনা এখনও আমার মাথায় দানা বেঁধে ওঠেনি। এ বিষয়েও আপনাদের পরামর্শ চাই। Suggest করুন। আমার মূল বক্তব্যটা বলি:

অতি সংক্ষেপে রাসবিহারী তার বক্তব্য রাখল। নাম ধাম বিশেষ কিছু বলল না, কিন্তু উত্তর-খণ্ডের একটা পরিষ্কার ছবি সে পেশ করল আমাদের সভায়। সে বললে, যুক্তপ্রদেশ থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত একটি দলের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। কাশী, কানপুর, সাহারানপুর, দিল্লী, দেরাদুন, শিয়ালকোট, আম্বালায় ওদের বড় বড় ঘাঁটি। এরা সকলে পরস্পরকে চেনে না, কিন্তু সব কয়টি ঘাঁটি তাদের নেতাকে চেনে। চেনে প্রত্যক্ষ, নামধাম জানে না। কোথাও সেই নেতার নাম চুচেন্দ্রনাথ, কোথাও সতীন্দ্রচন্দ্র কোথাও মোটাবাবু, কোথাও নরেনবাবু বা মানিকবাবু। রাসবিহারীর ধারণা ঐ বৈপ্লবিক দলের সঙ্গে কলকাতা, চন্দননগর, ঢাকা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি দলগুলির যোগাযোগ হলে ভাল হয়। বাঙলা মুলুকে যদি সর্ববাদীসম্মত নেতা কেউ থাকেন তবে উত্তরভারতে ঐ চুচেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। সকলে সকলের পরিচয় না জানাই ভাল। বাঙলায় এমন সর্ববাদীসম্মত নেতা কি কেউ আছেন?

অমরেন্দ্র এবং প্রতুল পরস্পরকে দিকে তাকায়।

শ্রীশ বলে ওঠে, বারীন্দ্রকুমারের দল ভেঙে যাওয়ার পর এবং টেগার্টের অত্যাচারে এদিকে সবগুলি দল একত্র হতে পারছে না। ঢাকায়, চন্দননগরে, কলকাতায় অনেকগুলি দল বর্তমানে আছে। তারা একযোগে কাজ করছে, যদিও এক নেতৃত্বে নয়। আমরা শীঘ্রই এক নেতৃত্বে আসার চেষ্টা করব। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন ঐ চুচেন্দ্রবাবু মতিলালের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন—তিনি অনুশীলন দলের প্রতুল, উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্র কিংবা অমৃতলাল, ত্রৈলোক্য মহারাজ অথবা বাঘাদার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে জানাতে পারেন।

রাসবিহারী বললে, তা হতে পারে। তাহলে আমাদের একটা সাঙ্কেতিক ভাষার আশ্রয় নিতে হবে। তবে সাঙ্কেতিক ভাষার বিপদ আছে। চিঠি intercept হলে সমূহ বিপদ। তার চেয়ে প্রতি তিনমাস অন্তর দু'দলেরই বিশ্বাসভাজন কেউ যদি কলকাতা থেকে উত্তর-ভারতে যায় তবে যোগাযোগ রাখা সম্ভবপর হবে।

প্রতুল বলে, আপনাকে ছাড়া ও দলের আর কাউকেই আমরা চিনি না। ফলে দু'দলের বিশ্বাসভাজন—

কথাটা রাসবিহারী শেষ করতে দেয় না। বলে,—আমাদের দলের দূত হিসাবে আমি শ্রীশ ঘোষের নাম প্রস্তাব করছি। তাঁকে আপনারা চেনেন।

অমরেন্দ্র আর প্রতুল একযোগে বলে ওঠে, শ্রীশ যদি দৌত্যকার্য করে তবে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। আমরা আমাদের সব গোপন তথ্য তাঁকে জানাতে প্রস্তুত। কিন্তু আশু বিপ্লবের কি কোন সম্ভাবনা আছে?

রাসবিহারী বলে, আমি তো মনে করি, নেই। এখন বছর দেড় দুই আমাদের প্রস্তুতিপর্ব চলবে। কিন্তু একটা কথা। বঙ্গভঙ্গ রোধ হওয়ায় ব্রিটিশ সরকারের প্রেস্টিজ ঢিলে হয়ে গেছে। এখানে তার চূড়ান্ত হার হয়েছে। তাই সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে বাংলাকে ওরা একটা থাপ্পড় বসালো—রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেল দিল্লীতে। এর একটা প্রতিবাদ হওয়া দরকার। ওদের বুঝিয়ে দেওয়া চাই—We shall not take it lying down.

আমি হেসে বলি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ঠিকই বলেছিলেন হে! shall আর will-এর ব্যবহার বাঙালী আর ভুল করবে না।

হেসে ওঠে ওরা সবাই।

রাসবিহারী একই সুরে বলে, আর একটা কথা। আমাদের বিপ্লবীরা তরুণ বয়সী। ওদের রক্ত গরম। নীরব প্রস্তুতি ওরা এক নাগাড়ে বরদাস্ত করতে পারবে না। ক্রমাগত ইন্ধন যুগিয়ে ওদের তাতিয়ে রাখতে হবে। তাই কিছু একটা করা দরকার।

অমরেন্দ্র সংক্ষেপে বলে, পি-এম?

—হ্যাঁ, একটু বড়-জাতের। আমি লেভেলটা একটু উঁচুতে ধরতে চাইছি, সাক্সেসফুল হই আর না হই!

প্রতুল বললে, 'অ্যাটেম্প্ট টু মার্ডার'-এর কোন অর্থ হয় না। শুধু শুধু পণ্ডশ্রম।

আমি বলি, কানাইও তাই বলত।

রাসবিহারী প্রতিবাদ করে, আমি আপনাদের সঙ্গে একমত নই। আমাদের উদ্দেশ্য এখানে লোকটাকে মারা নয়, একটা আলোড়ন! ক্ষুদিরামের বোমায় কিংসফোর্ড মরেনি, কিন্তু তার পলিটিক্যাল ইম্প্যাক্টের কথাটা ভেবে দেখেছেন?

অমরেন্দ্র বললে, তা ঠিক।

আমি বলি, শ্রীশ কিছু বলছ না যে?

শ্রীশ চোখ দুটি বন্ধ করে চুপ করে বসেছিল। হাসল সে। বললে আমার মাথায় গ্র্যাণ্ড একটা আইডিয়া এসেছে। একটা দিবাস্বপ্ন দেখছিলাম।

—বল, বল!

—দিল্লি দরবারের প্রতিবাদ করতে চাইছি আমরা, কেমন তা? মনে কর সেই দরবারেই 'জয় মা কালী' বলে কেউ একখানা বিরাশীসিক্কা ওজনের কালী মাইয়ের বোমা ঝাড়ল! আঃ! গ্র্যাণ্ড হয় তাহলে! পরদিন কাগজে ছাপা হবে—"ভাইস্‌রয় ইস চিৎপটাং"।

আমরা তিনজনেই হোহো করে হেসে উঠি ওর ভাব-গতিক দেখে! বাচ্চা ছেলে যেন রসগোল্লার হাঁড়ি দেখেছে। লক্ষ্য করে দেখিনি বিদ্যুদ্ স্পৃষ্টের মত চম্‌কে উঠেছিল রাসবিহারী।

প্রতুল বললে মনে মনেই যদি খাই তবে দুধ কেন, রাবড়িই খাওয়া যাক, কি বল শ্রীশ?

শ্রীশ বললে, আলবৎ!

অমরেন্দ্র বলে কিন্তু রাবড়ির হাঁড়িটা এ-ক্ষেত্রে কারা পাহারা দেবে তো কি ভেবে দেখছ? সারা ভারতের টিকটিকি জমায়েত হবে দিল্লিতে। প্রতিটি ট্রেনে প্রতিটি স্টেশনে হবে তল্লাসী। দরবারে হাজির থাকবে কয়েক হাজার সশস্ত্র সৈনিক। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার আর খয়ের খাঁ রাজন্যবর্গের। মায়ের পায়ে রাঙাজবার অর্ঘ্য দেবারই নির্দেশ আছে, আকাশকুসুমের নয়! বুঝলে শ্রীশ?

শ্রীশ হেসে বলে, আরে বাপু আমি তো মনে মনে রাবড়ি খাচ্ছি।

হঠাৎ নজর হল রাসবিহারীর দিকে। স্থির দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে সেজবাতির শিখাটার দিকে। মোম গলে গলে পড়ছে। তাই দেখছে সে।

বললাম, কি হে রাসবিহারী? তোমার আবার কি হল?

চমকে আত্মস্থ হল রাসবিহারী, বললে যাক ও কথা। আমাকে দুজন তরুণ কর্মী দেওয়ার কথা আছে। সে ব্যাপারের কতদূর?

অমরেন্দ্র বললে, কিন্তু পি. এম-টা কী জাতীয় হবে তা তো স্থির হল না।

একটু যেন অধৈর্য হয়ে পড়েছে রাসবিহারী, বলল প্র্যাকটিক্যাল সাজেস্‌শান যদি আপনাদের কিছু থাকে তো জানাবেন। না হলে ওটা আমার উপরেই ছেড়ে দিন। কিছু একটা করা যে দরকার এটা তো সবাই মানছেন?

আমরা তিনজনেই একবাক্যে সেটা মেনে নিলাম।

অতঃপর অমরেন্দ্রনাথ বলল, রাসবিহারীর প্রার্থনামত সে দুজন তরুণ কর্মীকে বেছে রেখেছে। তারা দুজনে জাঠতুতো-খুড়তুতো ভাই—বসন্ত বিশ্বাস আর মন্মথ বিশ্বাস। তাদের বিস্তারিত পরিচয়ও দিল অমরেন্দ্র। নদীয়া জেলার পোড়াগাছায় ওদের বাড়ি। ওখানকার স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিপ্লবী ক্ষীরোদ গাঙ্গুলীর দুই প্রিয় শিষ্য তারা। ডানপিটে, দুর্দান্ত, ভয়-ডর কাকে বলে জানে না। এদিকে একনিষ্ঠ কর্মী। ক্ষীরোদবাবুই ওদের দুজনকে পোড়াগাছা থেকে নিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়। হ্যারিসন রোড আর কলেজ স্ট্রিটের সংযোগস্থলে, এখন যেখানে ওয়াই. এম. সি. এ-র বিল্ডিং ঐখানে সে-যুগে ছিল একটি স্বদেশী বিপণী। তার নাম "শ্রমজীবী সমবায়!" স্বদেশী জিনিস বাজারে চালু করার উদ্দেশ্যে দোকানটি খোলা হয়। প্রধানত অমরেন্দ্রনাথ এবং ক্ষীরোদ গাঙ্গুলীমশায়ের প্রচেষ্টায়। আসলে এটা ছিল বিপ্লবীদের ঘাঁটি। চন্দননগর থেকে মতিলাল আর শ্রীশ প্রায় প্রতিদিন ওখানে যেতেন, কোনদিন ক্রেতা হিসাবে, কোনদিন বিক্রেতার ভেক ধরে। বসন্ত আর মন্মথ ঐ দোকানে কাজ করতে এসেছিল পোড়াগাছা থেকে। কিন্তু শুধু স্বদেশী জিনিস বেচেই ওদের প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না। তারা চায় 'হাতে-গরম' আর কোন কাজ। ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল-কানাইয়ের দল ওদের হাতছানি দেয়। এদের দুজনকে রাসবিহারীর জিম্মায় দিতে অমরেন্দ্র প্রস্তুত।

সব শুনে রাসবিহরী বললে, দুজনের মধ্যে একজনকে আমি আপাতত নিয়ে যাব। কাকে নেব?

—বসন্তকেই নিন!

—তাহলে ঐ বসন্তকে আপনি পরিষ্কার করে বলুন—তাঁকে ভর্তি হতে হবে আমার সুইসাইড-স্কোয়াডে। বোমা ছুঁড়বার সুযোগ সে পাবে না। বোমা হাতে তাকে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হবে টার্গেটের উপর। টার্গেট এবং থ্রোয়ার একসঙ্গেই ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে।

শ্রীশ বাধা দিয়ে বলে, কেন? এমন করে—

গর্জন করে ওঠে রাসবিহারী, কেন, এ প্রশ্ন অবান্তর! এই আমার অর্ডার। আমি তো কাউকে বাধ্য করছি না। আমি তাকে চোখেও দেখিনি। এই শর্তে যদি সে রাজী থাকে তবেই এসে দেখা করুক। না থাকে, চক্ষুলজ্জার প্রয়োজন নেই। আসতে হবে না তাকে।

অমরেন্দ্র নির্বিকারভাবে বললে, বেশ! তাকে বলব। আপনার নাম পরিচয় কিছুই জানাব তা তাকে, যতক্ষণ না সে স্বীকৃত হচ্ছে। কিন্তু যদি সে স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হয়, তখন তাকে কি নির্দেশ দেব? কোথায় তাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলব?

রাসবিহারী বললে স্বীকৃত হলেও তাকে আমার পরিচয় দেবেন না। সে এসে মতিলালের সঙ্গে দেখা করবে।

—কবে?

সে কথার জবাব না দিয়ে রাসবিহারী বললে, ওর বাড়িতে কে আছে?

—ছোট দুটি ভাই আর এক বোন আছে। মা আছেন, বাবা আছেন।

একটুখানি চুপ করে থাকল রাসবিহারী। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল কয়েকটা খণ্ড-মুহূর্ত ঐ মোম-গলে-পড়া সেজবাতিটার দিকে। তারপরে অদ্ভুত মিষ্টি গলায় বললে, মহাষষ্ঠীর দিন তাকে পোড়াগাছায় মায়ের কাছে যেতে বলবেন। লক্ষ্মীপূজা পর্যন্ত সে যেন মায়ের কাছে থাকে। তারপর কৃষ্ণা প্রতিপদের দিন এসে দেখা করবে মতিলালের সঙ্গে। সন্ধ্যাবেলায়।

পরদিন রাসু আবার এসে হাজির। বেশ খুশি খুশি ভাব। আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললে, তোমার এখানে বোমা কেমন বানানো হয়?

বললাম, আমাদের এখানে বোমা বানায় শ্রীমান—

আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে রাসবিহারী বললে, ঐ তোমাদের বড় দোষ প্রকাশ। কে বোমা বানায়, তা কি আমি জানতে চেয়েছি? কে বানায়, কে অ্যাসিড সাপ্লাই করে, কোথায় টেস্ট হয়, এসব খবর তো জানতে চাইনি আমি। অহেতুক ওসব কথা তুলছ কেন? আমি জানতে চাই তোমার বোমার এক্সপ্লোসিভ পাওয়ার কি রকম?

বললাম, এসব টেক্‌নিক্যাল প্রশ্ন। কী জবাব দেব?

—তবে যে জবাব দিতে পারবে তাকে ডাক।

—তাকে যে ডাকতে বারণ করছ। যে বানায়, সেই তো বলতে পারে।

রাসবিহারী হেসে ওঠে। বলে, তুমি আমার কথা বোঝনি। পূর্বমুহূর্তে ও-প্রশ্নটা ছিল অবান্তর। এখন তা নয়। কারণ তুমি এক্সপার্ট ওপিনিয়ান ছাড়া বলতে পারবে না। অগত্যা তাকে ডেকে পাঠাও।

বাংলাদেশে বোমা বানানোর ইতিহাসটা সংক্ষেপে বলি। নানান রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উল্লাসকর একটি বোমা তৈরী করলেন। সেটা ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারী। লোকালয়ে তো তার পরীক্ষা করা সম্ভব নয়, তাই জনাতিনেক বন্ধু চলে গেলেন বৈদ্যনাথধামে। জনমানববর্জিত দিঘিরিয়া পাহাড়ে ফাটানো হল সেই বোমা। অন্যান্য দুজন দূরে দাঁড়িয়ে

ছিলেন। বোমা ছোঁড়ার দায়িত্ব নিলেন প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী—তরুণ এক বিপ্লবী। একটা প্রকাণ্ড পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে তিনি বোমা ছুঁড়বেন। নির্দেশ ছিল, বোমাটা মাটিতে পড়ার আগেই প্রফুল্ল আত্মগোপন করবেন ঐ ভীমকায় পাথরের আড়ালে। হাসতে হাসতে সেই নির্দেশমত বোমাটা ছুঁড়লেন প্রফুল্লচন্দ্র। প্রচণ্ড শব্দে বোমাটা বিস্ফোরিত হল। দূরে দাঁড়ানো দুই বন্ধু উল্লাসে চীৎকার করে উঠলেন। ছুটে এলেন প্রফুল্লের পিঠ চাপড়াতে। এসে দেখলেন প্রফুল্ল নেই, তার মৃতদেহ পড়ে আছে। মাথাটা তার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

হিসাবে একটু ভুল হয়েছিল। বোমাটায় দাহ্য পদার্থ এত বেশি ছিল যে, মাটিতে পড়ার আগেই, বাতাসের ঘর্ষনজনিত উত্তাপে দু-এক সেকেণ্ড আগেই সেটার বিস্ফোরণ হয়। পাথুরে বন্ধ্যা মাটিতে কবর দেওয়া গেল না। দাহ করা তো আরও অসম্ভব। দূর গ্রামবাসীদের নজরে পড়বে। বাধ্য হয়ে বন্য জন্তু এবং শকুনের ভরসায় বাংলার বিপ্লবের সর্বপ্রথম শহীদকে রেখে ফিরে এলেন তাঁর দুই বন্ধু।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখি। প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তীর পিতা ছিলেন ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তী। পুত্র যে বিপ্লবী দলে নাম লিখিয়েছে তা তিনি জানতেন। অনন্যোপায় হয়ে ওর বন্ধুরা ঈশানচন্দ্রকে সব খুলে বলল। সব শুনে পাষাণ হয়ে গেলেন ঈশানচন্দ্র। বিপ্লবী তরুণ দুটি সাশ্রুলোচনে বলল, আমরা এবার যাই?

—যাবে? আচ্ছা যাও। শোন, একটা কথা! ওঁদের বল। আমার আরও একটি পুত্র আছে, সুরেশ। দরকার হলে সে এবার যেতে পারে।

উল্লাসকর আর হেমচন্দ্র ছিলেন প্রথম বোমা-ওয়ালা। আলিপুর মামলায় বিপ্লবীরা এঁদের দুজনকেই খোয়ালো। সে শূন্য স্থান পূর্ণ করতে এগিয়ে এলেন রিপন কলেজের পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র দত্ত। তাঁর পার্শিবাগানবাড়িতে শুরু হল নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং সুরেশচন্দ্রকে দলে টানেন। এদিকে চন্দননগরের একটি তরুণ তখন স্কটিশ চার্চ কলেজে সবে ভর্তি হয়েছে। ছোট্টখাট্ট প্রাণচঞ্চল তরুণ, নাম মণীন্দ্রনাথ নায়েক। স্কটিশে সায়েন্স পড়ে। পরে সেই হয়েছিল চন্দননগরের প্রথম সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট। সেও মাতল এ বোমা-তৈরী-করার খেলায়। চন্দননগরের ডাক্তার নগেন দত্তমশাই ওকে ফর্মুলা বাৎলে ছিলেন। নিজে নিজেই কদিন চেষ্টা করল মণীন্দ্রনাথ। শেষে একদিন সাহসে ভর করে হাজির হল প্রফেসর সুরেশচন্দ্রের পার্শিবাগানের বাড়িতে। সুরেশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাকে বুকে টেনে নিলেন। এই সুরেশচন্দ্রের কাছে শিখে মণীন্দ্রনাথ সেই বয়সেই হয়ে উঠেছিল এক নম্বর বোমাবিশারদ।

রাসবিহারীর তাগাদায় ডেকে পাঠালাম মণীন্দ্রনাথকে।

—কি চাই? বোমা? পাবেন।

—কত বড় বোমা বানাতে পার তুমি?

—কত বড় চান?—মণীন্দ্রের মুখে মুখে জবাব।

—এখানে ফাটলে আমার বাড়ির ফটকগোড়ায় বসে তার আওয়াজ পাব?

—পাবেন।—সাফ জবাব।

—বানাও তাহলে একটা। কালীপূজার রাত্রে তার পরীক্ষা হবে।

যে কথা সেই কাজ। মণীন্দ্রনাথ বানিয়ে ফেলল বোমা। গুরুদেব সুরেশচন্দ্রকে দেখিয়ে আমার কাছে জমা দিল।

কালীপূজার রাত্রি। ১৯১১। রাসবিহারী আর শ্রীশ এসে হাজির। ঘরে ঘরে দীপাবলী। পটকা ফাটছে মুহুর্মুহুঃ। হাউই উঠছে আকাশ আলো করে। রাসবিহারী বললে, দেখি মালটা।

মণীন্দ্রনাথ একটা সিগারেট টিন বার করে দেখাল।

—কী কী মাল আছে এর ভিতর?

মুখস্থ বলে গেল মণীন্দ্র ঃ ওজন এক পাউণ্ড এগারো আউন্স; আসল মাল পিকরিক অ্যাসিড আর কলেরা পটাশ! ভাগটা জানতে চান?

রাসবিহারী বললে, থাক! তোমার ঘড়িটা দেখি প্রকাশ।

নিজের ঘড়ির সঙ্গে আমার ঘড়িটা কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়ে দিয়ে বললে, আমি ফটকগোড়ায় আমার বাড়ির ছাদে থাকব। ঠিক রাত আটটা সাতান্ন মিনিটে তোমরা এটা ফাটিও। তাহলে বুঝব কোনটা আমাদের বোমার আওয়াজ।

মণীন্দ্র তৎক্ষণাৎ বললে, উত্তর থেকে হাওয়া বইছে, আপনারা প্রায় সাত সেকেণ্ড পরে আওয়াজটা পাবেন।

শ্রীশ আর রাসবিহারী সাইকেলে চেপে চলে গেল। মণীন্দ্র বোমা, টর্চ আর ঘড়ি নিয়ে ছাদে উঠল আমি থামের আড়ালে লুকিয়ে থাকলাম। নজর রাখলাম, কেউ না হঠাৎ এসে পড়ে। সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিলাম। ঠিক, হল, মণীন্দ্র ছাদ থেকে আমার উঠানে বোমাটা আছড়ে ফাটাবে।

আমার স্ত্রী এবং বাড়ীর সকলে গেছে কালীপূজা দেখতে। মধ্যরাত্রে পূজা। বাড়ি ফাঁকা। ঘড়ি ধরে অপেক্ষা করছি। কাঁটায় কাঁটায় ঠিক আটটা সাতান্ন মিনিটে মণীন্দ্র প্যারাপেট থেকে ঝুঁকে আছাড় মারল চকমেলানো উঠানে। কোথায় কি? ফাটল না বোমাটা। মণীন্দ্র ছাদের প্যারাপেট থেকে ঝুঁকে বলল, কী হল মতিদা?

দেখলাম সিগারেটের টিনটা মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে! ভেবে-চিন্তে কিছু করিনি। ছুটে নেমে গেলাম উঠানে। সিগারেট টিনটা তুলে নিয়ে পুনরায় আছাড় মারলাম দরদালানের পাঁচিলে। প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হল এবার।

আমি উল্টে পড়লাম। আঘাত লাগেনি কোন। তাকিয়ে দেখি দেওয়ালের আস্তর উড়ে গেছে। এমন কি গর্তও হয়ে গেছে পাকা ইটের গাঁথনির ভিতর। ধুলো আর ধোঁওয়া উঠছে তখনও।

মণীন্দ্রনাথ ছুটে নেমে এল। আমার আঘাত লাগেনি দেখে আশ্বস্ত হল। বললে—আপনি খুব অন্যায় করেছেন! অত্যন্ত অন্যায়!

আধঘন্টা পরেই রাসবিহারী আর শ্রীশ এসে হাজির। রাসবিহারী খুব খুশি। বললে—মণীন্দ্রভাই, বাতাস বোধহয় উত্তর থেকে বইছে না, পুরো এক মিনিট দেরি হয়েছে বোমাটা ফাটতে! যাই হোক, অপারেশান ইস সাক্সেসফুল।

মণীন্দ্রনাথ মাথা নেড়ে বললে, না! অপরেশান সাক্সেসফুল হলেও পেসেন্ট মারা গেছে। আমাকে আরও পরীক্ষা করতে হবে। কতদিন সময় দিচ্ছেন?

রাসবিহারী বললে, পুরো এক বছর! পরের বছর কালীপূজার রাত্রে আটটা সাতান্ন মিনিট পর্যন্ত!

মণীন্দ্রনাথ বললে, যথেষ্ট সময়। এবার নিখুঁত মাল পাবেন।

মণীন্দ্র চলে গেলে রাসবিহারীকে বললাম, ব্যাপার কি? এত দীর্ঘ দিনের সময় দিলে যে ওকে? তোমার পি. এম. তাহলে শ্রীঘ্রই ঘটছে না।

রাসবিহারী বললে না। বৃহৎ কর্মে প্রস্তুতি লাগে!

তখনও আমি জানতাম না, 'বৃহৎ কর্মটা কি।

রাসবিহারী মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

বলি, আলিপুর জেলে কানাইয়ের সঙ্গে আমি দুবার দেখা করেছিলাম। প্রথমবার সে ছিল মনমরা, দ্বিতীয়বার খুশিতে ডগমগ। তোমাকেও আজ খুব খুশি খুশি লাগছে। ব্যাপারটা কি? তুমিও কি তোমার টার্গেট খুঁজে পেয়েছ?

—তা পেয়েছি!

—ভাগ্যবানটি কে?

মুখটা আমার কানের কাছে এনে বললে, হিস্ এক্সেলেন্সি লর্ড মারকুইস অফ হার্ডিঞ্জ কে. টি. সি. আই—গভর্নর-জেনারেল অ্যাণ্ড ভাইস্‌রয় অফ ইণ্ডিয়া!

আধঘণ্টা আগে যে বোমাটা ফেটেছিল তার চেয়ে ওর কণ্ঠস্বর নিশ্চয় জোরে হয়নি, কিন্তু ধাক্কাটা আমার বুকে লাগল বোধকরি তার চেয়েও জোরে। ওর হাতটা টেনে নিয়ে বলি, তুমি তো প্রাক্‌টিক্যাল মানুষ রাসবিহারী! এ যে অসম্ভব তা কি তুমি বোঝ না? বোমা তো ছার, টার্গেট অত উঁচুতে ধরলে তোমার যে কামান চাই! রাইফেল রেঞ্জের ভিতরেই যে ঢুকতে পারবে না তুমি!

কী মিষ্টি সর্বনাশা হাসি হাসল সে। বললে, আমি তো যন্ত্রমাত্র প্রকাশ। এও তো অটোমেশন!

কী বলব ভেবে পেলাম না।

শ্রীশ এগিয়ে এসে বলে, আমার সেইদিনকার সেই রাবড়ির লোভ দেখাবার পর থেকেই রাসু-এক্কেরে বে-হেড উন্মাদ!

রাসু সংক্ষেপে শুধু বললে, মারি তো হাতী, লুঠি তো ভাণ্ডার!

তারপর আমার দিকে ফিরে বললে, দীর্ঘ সময় নিচ্ছি প্রস্তুতির। এক বছরের উপর। দিল্লীতে দরবার হবে পরের বছর ডিসেম্বরে। তুমি কিছু ভেব না প্রকাশ। আমি স্বপ্নবিলাসী নই। একেবারে অসম্ভব মনে করলে এ কাজে আমি হাত দেব না, কিন্তু এটা ঠিক—আমি এক বছরের সাধনায় নিশ্চয় কৃতকার্য হব। দেখে নিও তুমি সারা পৃথিবীর কাগজে সংবাদ বের হবে, শিরে পাগলটার ভাষায়—'ভাইস্‌রয়—ইজ চিৎপটাং!'

ঠিক এই সময়েই ফিরে এলেন আমার স্ত্রী। কালীপূজা সেরে। আমি তাঁর হাত থেকে নির্মাল্যটা নিয়ে রাসবিহারীর মাথায় ঠেকালাম।

রাসবিহারী হেসে বললে, দেখলে তো প্রকাশ! সঙ্গে সঙ্গে মায়ের আশীর্বাদ এসে গেল! মা মহিষবলিই চাইছেন! বুঝলে?

বসন্ত বিশ্বাসের জবানবন্দী

একটা নিটোল ফোলানো বেলুনের গায়ে আচমকা একটা পিন ফুটিয়ে দেখেছেন কখনও? আমারও অবস্থা হল ঐ রকম। আমি পোড়াগাছার বসন্ত বিশ্বাস, ডানপিটে-ডাকসাইটে ডাকাত, নাম লিখিয়েছি সুইসাইড-স্কোয়াডে— চলেছি শহীদ হতে, আর লোকটা আমাকে বলে কিনা—

আর খানদানী বদনখানাই বা কী? স্বদেশী আর বিপ্লবী কি আমি আগে দেখিনি? বাঘা যতীনদা কী স্মার্ট! অমরেন্দ্রদা অথবা ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী মাস্টারমশায়কে দেখ,—রুক্ষ চুল, হাঁটু পর্যন্ত খদ্দরের খাটো ধুতি, দেখলেই শ্রদ্ধা হয়! আর ও লোকটা পরেছে গিলে করা কোঁচানো কন্তাপাড় শান্তিপুরের ধুতি, ঢেউখেলনো চুলের কী বাহার। পায়ে চক্‌চকে পাম্প-শু। হাতে মুঠ-ওয়ালা ছড়ি! অমরেন্দ্রদা আমাকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—এর কথাই সেদিন বলেছিলাম আপনাকে।

লোকটা আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে, কী রে বিশে, তামাক সাজতে জানিস?

আমি তো থ!

—হাঁ করে কি দেখছিস্ বিশে? তামাক সাজতে জানিস্?

অমরেন্দ্রদা মিটিমিটি হাসছেন। আমি গম্ভীর হয়ে বলি, বিশে নয়, শ্রীবসন্তকুমার বিশ্বাস। আমার সাতজন্মে কেউ তামাক সাজেনি কখনও।

—অ! তা রাঁধতে জানিস্?

আবার নজর পড়ল অমরেন্দ্রদার দিকে। এবার প্রকাশ্যেই হাসছেন তিনি। আমার গা জ্বলে গেল। বললাম, রাঁধতে জানি। কেন, কি হবে?

লোকটা পান চিবোতে চিবোতে অমরদার দিকে ফিরে বলে, ঠিক আছে, তাহলে বিশেটাকে আর চাকর হতে হবে না, ও হবে আমার বামুন ঠাকুর।

পুনরায় প্রতিবাদ করি, আমার নাম বিশে নয়, শ্রীবসন্তকুমার বিশ্বাস।

হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠল লোকটা : না! বিশে, বিশে, বিশে! বিশু দাস তোর নাম। বসন্ত বলে আচমকা কেউ পিছন থেকে ডাকলে খবর্দার ঘাড় ঘুরাবি না। বুঝলি?

অমরেন্দ্রদা বললেন, ও আপনার অ্যাটিচুডটা ঠিক বুঝতে পারছে না!

—না বোঝার কী আছে? এই তো ওর পরিচয়, যতদিন না ও শহীদ হচ্ছে!

এ কী বিচিত্র জীবের পাল্লায় পড়লাম রে বাবা!

দুদিন পরেই রওনা হলাম আমরা দুজন। কোথায় যাচ্ছি জানি না! অমরদা শুধু বলেছিলেন, উনিই এখন থেকে তোমাকে নির্দেশ দেবেন। ওঁকে আমার মতই মান্য করবে।

সেটা পেরে উঠব কিনা জানি না। জিজ্ঞাসা করলাম, কী নাম ওঁর?

বললেন, সেটা ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর বরং।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বললেন, ঠাম্মা আমার নাম রেখেছিল গডাঢরচন্দ্র! তুই তা-বলে ও-নামে ডাকিস না যেন। আমাকে ডাকবি 'কর্তা মশাই' বলে।

তা ঐ কর্তামশায়ের সঙ্গে দুদিন পর রওনা হলাম। চন্দননগর থেকে হাওড়া স্টেশনে এলাম লোকাল ট্রেনে। ওঁর সেই জামাইমার্কা পোশাক। কাঁধে এণ্ডির চাদর, কোঁচা লটপট করছে। হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে একটা পানওয়ালার কাছে একটি ডবল পয়সা দিয়ে মিঠে-বাংলা পান কিনে খেলেন। পিক্ করে পানের পিচ কেটে আমার হাতে খানকয় নোট ধরিয়ে দিয়ে বলেন, যা তো বিশে, থার্ড ক্লাসের দু'খানা ভাল দেখে টিকিট কিনে নিয়ে আয়।

রেলের টিকিট কী ধনেখালির শাড়ি। —যে জমি, পাড় পছন্দ করব? 'ভাল দেখে'-টিকিট বস্তুটা মালুম হল না। প্রশ্ন করলাম, কোথাকার?

—পাটনার।

আমি রওনা দিয়েছি, কর্তামশাই ঊর্ধ্বমুখে ব্যাদিতবদনে জর্দা-সুর্তি জাতীয় কিছু নিক্ষেপ করতে ব্যস্ত ছিলেন—ঐ অবস্থাতেই হাঁকার পাড়েন—ওরে বিশে! শোন! ঐ টিকিটবাবুকে শুধোস্ তো : দিল্লি এক্সপ্রেস বক্তিয়ারপুরে থামবে কিনা। যদি থামে তবে বক্তিয়ারপুরই নিস্, না হলে পাটনা জংশন!

পড়েছি যবনের হাতে! পাটনার দু'খানা টিকিট কিনে ফিরে এলাম। জেনে এলাম তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে দিল্লি-এক্সপ্রেস ছাড়বে। ফিরে আসতেই কর্তামশাই বলেন, শিগগির! এবার দৌড় দেখি আমার পিছন পিছন!

কোঁচা আর চাদর সামলে সে কী ছুট! স্যুটকেসটা নেব বলে হাত বাড়াতেই চাপা গলায় বলেন, খবদ্দার! ওতে ডিম আছে। ফেটে যাবে!

মা বলতেন, ডিম অযাত্রা। কলকাতা থেকে এত জিনিস থাকতে উনি কেন ডিম নিয়ে যাচ্ছেন পাটনায়? অদ্ভুত মানুষ তো! সে যাই হোক, এ-পথ সে-পথ দিয়ে কর্তামশাই পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে হাজির। একটা ডাকগাড়ির তখন ছাড়ো-ছাড়ো অবস্থা; তারই একটা তিন-নম্বরী ডাব্বায় হুড়মুড়িয়ে উঠে স্যুটকেসটা রেখে বলেন : নজর রাখিস। কেউ না নিয়ে সট্কান দেয়!

বলেই সুড়ুৎ করে ঢুকে গেলেন বাথরুমে।

ওরই মধ্যে আমি কোনক্রমে বললাম—এটা কিন্তু দিল্লি-এক্সপ্রেস নয়।

বাথরুমের দরজাটা বন্ধ করতে করতে উনি তার জবাবে বলেন, দাঁড়ে বসে পড়, ময়না! মেলা কপ্চিও না!

ইচ্ছে করছিল তখনই নেমে পড়ি। এ কী মানুষের হাতে আমাকে গছিয়ে দিলেন অমরদা!

গাড়ি যতক্ষণ না-ছাড়ল উনিও ছাড়লেন না বাথরুম।

প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে গাড়িটা যখন বেরিয়ে এল উনিও বার হয়ে এলেন পান চিবোতে চিবোতে।

বললাম, এটা দেরাদুন এক্সপ্রেস। পাটনা যাবে না, গয়া হয়ে যাবে।

এক গাল হাসলেন উনি। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, তুই তো খুব তালেবর বিশে! এরই মধ্যে খবর পেয়ে গেছিস!

আমার ভীষণ রাগ হল। সরে বসলাম। উনি সেই হ-য-ব-র-লর নেড়ার মত ঘনিয়ে এসে বলেন—এই বিশে, রাগ করলি? শোন? একটা কথা শোন!

আমার মাথাটা কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে বলেন, তুই লক্ষ্য করে দেখিস্নি, চন্দননগর থেকেই এক বেটা টিকটিকি আমাদের পিছু নিয়েছিল। পানওয়ালার পিছনে বেটা দাঁড়িয়েছিল। এতক্ষণে মহাপ্রভু দিল্লি-এক্সপ্রেসে পাটনা রওনা হয়ে গেছেন। কাল সকালে পাটনা

বক্তিয়ারপুরে আমাদের খুব ঢোঁড়াঢুঁড়ি করবেন! ভেরি প্যাথাটিক!

বলেই হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে গান ধরলেন : 'সেঁইয়া মেরা খো গয়্যা পাটনাহিকা বা-জার মে!'

ওপাশ থেকে একজন দেহাতি পশ্চিমা লোক কেয়াবাৎ দিয়ে ওঠে ঃ বহুৎ আচ্ছা বাঙালীবাবু! সেও যোগ দেয় কোরাস গানে—সেঁইয়া মেরা খো গয়্যা পাটনা হি কা বাজার মে! কার সেঁইয়া কেমন করে খোয়া গেল না জেনেই!

আমি তো তাজ্জব! সেই প্রথম মনে হল—নাঃ! গদাধরবাবু বিচিত্র লোক বটে! তখনও ওঁর আসল নামটা আমি জানি না।

তারপর মোঘলসরাই স্টেশনে, আমাকে গাড়িতে বসে থাকতে বলে উনি ঐ স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে নেমে গেলেন। গাড়ি এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়াবে। আধঘণ্টা। বসে আছি তো বসেই আছি।

হঠাৎ নজর গেল জানালা দিয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। ব্যাপার কি। আশে-পাশে তাকিয়ে দেখলাম। নাঃ! আমাকেই ডাকছেন উনি। চাপদাড়ি, মাথায় পাগড়ি। কালো-রঙের একটা স্যুট পরেছেন। হঠাৎ খেয়াল হল—আরে, ওঁর হাতে যে কর্তামশায়ের সেই ব্যাগটা!

পাঞ্জাবী ভদ্রলোক এবার এগিয়ে এলেন জানালার ধারে। কানের কাছ মুখ এনে বললেন, স্যুটকেসটা নিয়ে নেমে আয়। অন্য একটা কম্পার্টমেন্টে উঠ্‌তে হবে। এ-গাড়িতে অনেকে তোকে সেই কর্তামশায়ের সঙ্গী বলে জানে। স্যুটকেসটা না দেখলে এবং আমাকে হাতছানি দিয়ে না ডাকলে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়নো ওঁকে আমি চিনতেই পারতাম না।

ওঁর কর্মময় জীবনের মাত্র দুটি বছর আমি ওঁকে দেখেছিলাম। উনিশ শ' এগারোর নভেম্বর থেকে উনিশ শ' চৌদ্দর পঁচিশে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। ধরতে গেলে দু-বছর তিনমাস। এই দু-বছর আমি ছায়ার মত ওঁর সাথে সাথে ঘুরেছি। আমাকে হাত ধরে শিখিয়েছিলেন তিনি—প্রিয় শিষ্যের মত, ছোট ভাইয়ের মত। বিপদে কৃতবার আমাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছেন। একসঙ্গে খেতে বসলে পাতের বড় মাছখানা, মুড়োটা কতবার তুলে দিয়েছেন। অবোধবিহারী আর আমীরচাঁদজীর গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে আমরা একসঙ্গে কলকাতায় ফিরে আসি। তারপরেই ছাড়াছাড়ি। এর পরে তাঁর কী হয়েছিল আমি জানি না। উনি কি শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েছিলেন? ফাঁসি হয়েছিল? এক লক্ষ টাকা পুরস্কার কি কেউ পেয়েছিল? আমি জানি না। যা জানি না তার কথা থাক। যা জানি তাই বলি ঃ

আমরা প্রথমেই এসে উঠলাম দেরাদুনে। ঘোষী-মহল্লার একটা দোতলা বাড়িতে। দ্বিতলের একখানা ঘরে রাসবিহারীদা থাকতেন—হ্যাঁ, রাসবিহারী। দেরাদুনে তিনি ছিলেন রাসবিহারী বসু। ফরেস্ট অফিসের বড়বাবু। দেরাদুনে পৌঁছবার আগেই তিনি পাঞ্জাবীর বেশ পরিবর্তন করেন। দেরাদুনে আমরা একঘরেই দুজনে থাকতাম। রান্না করতাম আমি, বাসন ধুয়ে রাখতাম, কাঠ চেলা করতাম, ঘর ঝাঁট দিতাম। উনি বাজার করতেন, অফিস করতেন, আর আমাকে শেখাতেন। প্রথম তিনমাস কঠোর ট্রেনিং-এ ছিলাম। তার একটু নমুনা শোনাই। ভোর পাঁচটায় আমাদের উঠতে হত। উনিও উঠতেন। খোলা ছাদে খালি হাতে একসঙ্গেই দুজনে কিছু ব্যায়াম এবং যোগাভ্যাস করতাম। তারপর চা। উনি সকালে এক কাপ চা খেতেন। আমি আগে খেতাম না। ওঁর পাল্লায় পড়ে চা ধরলাম। এরপর কর্তামশাই বাজারে যেতেন। সকাল

সাড়ে নটার ভিতর খেয়ে-দেয়ে উনি দফ্‌তরে বার হয়ে যেতেন। আমি তখন পড়তে বসতাম। ইংরেজ সৈন্যকে কথিত-উর্দু শেখাবার বই ছিল—ইংলিশ-উর্দু। তাই একখানা এনে দিয়েছিলেন আমাকে। এ-ছাড়া ছিল ইংরেজি-উর্দু অভিধান। রোজ পড়া দিতেন, পড়া নিতেন। রসায়ন বিদ্যার একটি অধ্যায় পড়তে হয়েছিল—ঐ বোমা কেন ফাটে। বোমার ভিতর কী কী মালমসলা থাকে, কী তাদের কার্যকারিতা। এ-ছাড়া পদার্থ বিদ্যার একটা অধ্যায় ঃ 'পাথ অফ এ প্রজেক্‌টাইল'। থিয়োরি নয়, তার ব্যবহারিক দিকটা। দু-তিনটি ফর্মূলা আমাকে শিখিয়েছিলেন। তা থেকে আমাকে একটা চার্ট বানাতে হয়েছিল—এক পাউণ্ড বারো আউন্স ওজনের একটা পাথরকে জমির সঙ্গে কোন অ্যাঙ্গেলে ছুঁড়লে সেটা কত উঁচুতে উঠবে এবং কত দূরে পড়বে। সন্ধ্যায় পড়তে হত গীতা এবং বিবেকানন্দের কিছু বই—রাজযোগ, কর্মযোগ ইত্যাদি। ভর দুপুরবেলায় ছিল আমার প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্লাস। টেগোর ভিলার গভীরে। ওখানকার ম্যানেজার ছিলেন অতুলবাবু। তিনি জানতেন আমি কী করতে ওখানে যাই। ওভারসিয়ার বাবুদের মাপবার ফিতে দিয়ে মেপে রাসবিহারীদা—আমি তাঁকে তখন জনান্তিকে ডাকি 'দাদা'—মাটিতে কতকগুলি খুঁটি পুঁতে দিয়েছিলেন। খুঁটির গায়ে দূরত্বটা লেখা থাকত। আমার কাছে থাকত গোটা আষ্টেক সিগারেট টিনের কৌটা। তাতে মাটি ভরা। ল্যাবরেটারিতে ওজন করে দাদা প্রত্যেকটির ওজন সমান করে রেখেছিলেন—ঐ এক পাউণ্ড এগারো আউন্স। আমি পর পর আটটি টিন ছুঁড়তাম। ক্রমাগত। বেলা একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত! তিন মাসের অভ্যাসে আমি এমন পোক্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে, তিন-চার ইঞ্চির বেশী লক্ষ্যভ্রষ্ট হতাম না বড় একটা!

অমরদার কাছে শুনেছিলাম, লক্ষ্যবস্তুর উপর বোমা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে আমাকে। সে-ক্ষেত্রে এ অভ্যাসের কী প্রয়োজন? দাদাকে একদিন প্রশ্ন করেছিলাম। উনি বললেন, Charge of the Light Brigade পড়িস নি? 'Their's not to reason why! Their's but to do and die!'

দিনসাতেক রিভলভারের টার্গেট-প্র্যাকটিসও করালেন; কিন্তু টোটার বড় অভাব। বেশী শেখা গেল না।

একদিন বললেন, বাড়িতে কী বলে এসেছিস? চাকরি করতে যাচ্ছি?

—হ্যাঁ!

—তা তিনমাস চাকরি করছিস্ বাড়িতে মনি-অর্ডার করেছিস?

কী বলব? একপয়সাও মাইনে পেয়েছি যে, বাড়িতে পাঠাব?

বললেন, কাল চল্ আমার সঙ্গে লাহোরে। একটা চাকরি-বাক্‌রিতে ঢুকিয়ে দিতে হবে। বইগুলো নিয়ে চল্, আর হ্যাঁ, ঐ সিগারেটের টিনগুলো। প্র্যাকটিসটা চালিয়ে যেতে হবে।

পরদিনই উনি আমাকে নিয়ে এলেন লাহোরে। বালমুকুন্দজীর বাড়িতে। বালমুকুন্দজীর বয়স আমার চেয়ে দু-এক বছর বেশি হতে পারে। তখন তাঁর বয়স বাইশ। দাদার চেয়ে বছর তিন-চারের ছোট। লাহোরে মাস্টারি করতেন তিনি। আর্টস্ গ্র্যাজুয়েট। ঝিলাম নদীর ধারে খড়িয়ালা গাঁয়ের মানুষ। ওঁর বাবা ভাই-মথুরা দাসজী ছিলেন একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। দাদা বালমুকুন্দজীকে বললেন, এ হল বিশ্বনাথ দাস। বাঙালী। একে কোন একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিতে পার?

ঐ কি সেই মালটা ছুঁড়বে? যার কথা বলেছিলেন আপনি? বাঙলা মুলুক থেকে যার

আপাত কথা ছিল?

—হ্যাঁ। অ্যাকশনের তো এখনও দেরি। ততদিন কোথাও চাকরি-বাকরি করুক। আসলে তাও নয়, আমার রোজগার এমন কিছু নয় যে, দীর্ঘদিন একটা ঠাকুর রাখতে পারি। লোকের সন্দেহ হবে। পুরণচাঁদজী কাল জিজ্ঞাসা করছিলেন, তুমি নাকি একটা কম্বাইণ্ড-হ্যাণ্ড রেখেছ!

বালমুকুন্দ বললেন, তা-ছাড়া ও যখন অ্যাকশন করবে তখন আপনার বাড়িতে ওর না থাকাই ভাল। টিকটিকিরা ঐ সূত্রে আপনাকে ধরে টান দেবে। ঠিক আছে, আমি ওকে কোন কাজ-কামের মধ্যে ঢুকিয়ে দেব।

—ও লাহোরে থাকবে কোথায়?

—আপাতত এখানেই। আমার তো দু-খানা ঘর। এ-ঘরে ও থাকবে।

—ঠিক আছে। আমি চলি! —দাদা উঠে পড়েন।

ঐ সময়ে ভিতরের দরজায় শিকলটা নড়ে উঠল। বালমুকুন্দজী ভিতরের দিকে সরে গেলেন। সেদিক থেকে একটা চুড়ির ঝনৎকার ভেসে এল, আর চাপা কণ্ঠে দু-চারটে কথা। বালমুকুন্দ ফিরে এসে বললেন, আপনার বহিনজি বলছেন, এখানেই যাহোক দুটি খেয়ে যাবেন।

দাদা উঠে পড়েছিলেন। হাসলেন। বললেন, বালমুকুন্দ! তোমার স্ত্রীকে বল, আমার বহিনের বাড়ি আমি যখন তখন খেতে পারি কিন্তু তোমার পর্দানশীন স্ত্রীর কাছে—বিনা নিমন্ত্রণে—

কথাটা তাঁর শেষ হল না। ভিতরের দ্বার খুলে বার হয়ে এল একটি ঘোমটা-খসা তরুণী। আমার চেয়েও ছোট। বছর আঠার বয়স হবে তার। ঘরোয়া চোলি, দোপাট্টা আর ঘাগরায় তাকে ভারি সুন্দর মানিয়েছে। এগিয়ে এসে সে রীতিমত বাঙালী কায়দায় দাদাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। আমার দিকে একটা সলজ্জ নমস্কার ছুঁড়ে দিয়ে দাদাকে অসঙ্কোচে বললে, থোড়া কুছ খা লিজিয়ে দাদা! ম্যায়নে আপনি হাত সে পকায়ী!

রাসবিহারী তাঁর ডান হাতখানা রাখলেন ওর খোঁপায়। বললেন, তোরা সবাই একজাতের! আমার নিজের এক বোন আছে, জানলি—তার নাম সুশীলা; যখনই চিঠি দেয়, লেখে—দাদা, একদিন আমার এখানে এসে পাত পেড়ে খেয়ে যাও! ওদের পুকুরে বড় বড় মাছ আছে। তার লোভ দেখায়। আমি আবার পেটুক মানুষ তো।

বসে পড়েন আবার।

মেয়েটি বললে, আপনি মোটেই পেটুক নন! নেওতা প্রত্যাখ্যান করেই তো ফিরে যাচ্ছিলেন।

হা-হা করে ঠারে ঠারে হাসলেন দাদা। বললেন, তোর নাম কি রে?

—রামরাখী!

এই তোর দেওর। বিশু দাস। ও তোর এখানে থাকবে!

মিষ্টি হাসল রামরাখী। আমার দিকে ফিরে এবার অসঙ্কোচে বললে, দেবর নয়, ও আমার ভাই। বিশু ভাই!

আমি বললাম, সেই ভাল! কুমু, মানে আমার নিজের বোনও তোমার বয়সী। তুমি আমার রাখী-বহিন্!

বালমুকুন্দজীর বাড়িতে আশ্রয় পেলাম। দুচারদিন পরেই উনি আমাকে নিয়ে গেলেন লাহোরের সূত্রমণ্ডীতে, 'পপুলার ডিস্‌পেন্সারি'-তে। পাঞ্জাবী মালিক। ওষুধের ভাগ আমি কিছুই জানি না। প্রথম প্রথম ক্যাশ রাখতাম। পেটেন্ট ওষুধ বিক্রি করতাম। দোকানে আমার

নাম ছিল বিশিন্ দাস। বালমুকুন্দও ঐ নামে আমাকে ডাকতেন। আমার আসল নামটা কেউ জানল না। ও-দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে আমি অবশ্য আমার প্রকৃত ঠিকানা একজনকে বলে এসেছিলাম! সে ঐ রাখীবহিন্‌কে।

বালমুকুন্দজী মাস্টারী করতেন। গুপ্ত সমিতিতে তাঁর কাজ ছিল প্রচারের। ছুটি-ছাটায় বেরিয়ে পড়তেন—লাহোর থেকে আম্বালা, শিয়ালকোট, অমৃতসর। এতদিন মুশকিল ছিল রামরাখীকে নিয়ে। তরুণী স্ত্রীকে একা বাড়িতে রেখে বেশী দিন বাইরে রাত কাটাতে পারতেন না। আমি আসায় তিনি আরও বারমুখী হয়ে পড়লেন। আমি থাকি এ-ঘরে, রাখী-বহিন ও-ঘরে। ওর সঙ্গে সত্যিই আমার ভাইবোনের সম্পর্ক গড়ে উঠল। রামরাখী বিপ্লবীদের অনেক কথাই জানত। আমাদের এ কাজে তার পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। স্বামীর বিপদের কথা সে জানে না তা নয়, কিন্তু তাতেও সে পিছপাও নয়। বলত, ও কোনদিন ধরা পড়বে না, তুমি দেখে নিও। ঠিক পালিয়ে যাবে।

বালমুকুন্দের বাইশ-বছরের তারুণ্যে রামরাখীর অগাধ বিশ্বাস।

আমি বলতাম, আর আমিই বুঝি ধরা পড়ব?

—দূর! তা কেন! তুমি বঙ্গালকা বাহাদুর! তুমি ঝট্‌সে কেটে পড়বে।

কী ছেলেমানুষ ছিল রামরাখী! পূর্ণ যৌবনা বধূ কিন্তু অন্তরে একেবারে কিশোরী। ও বুঝত—এ আগুন নিয়ে খেলা, কিন্তু তাতেই ওর আনন্দ।

একদিন ঠাট্টা করে বললাম, বহিনজী, আমার উপর খুব চটে যাচ্ছ, নয়?

—কেন, চটব কেন?

—আমি আসার পর থেকে মুকুন্দজী আর রাতে বাড়িই ফেরে না!

রাঙিয়ে ওঠে রামরাখী। সলজ্জে হেসে বলে, মুখের আড় নেই। যা-তা বলতে শুরু করেছ আজকাল!

—ওমা! যা তা বলব কেন? এ যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন—"কাল ছিল প্রাণ জুড়ে, আজ কাছে নাই—নিতান্ত সামান্য এ কি নাথ? তোমার বিচিত্র ভবে কত আছে কত হবে, কোথাও কি আছে প্রভু হেন বজ্রপাত!"

রামরাখী বলে, ক্যা বোলিন থা রবিন্দরনাথ জী?

আমি এক নিশ্বাসে আবৃত্তি করে যাই, "আছে সেই সূর্যালোক, নাই সেই হাসি—আছে চাঁদ, নাই চাঁদমুখ। শূন্য পড়ে আছে গেহ, নাই কেহ, নাই কেহ—রয়েছে জীবন, নেই জীবনের সুখ।"

রামরাখী ঘনিয়ে আসে। বলে, এ বিশুভাই, ওর মানে কি আমাকে একটু সমঝিয়ে দাও! কুছুই মালুম হচ্ছে না।

অগত্যা রবীন্দ্রকাব্যের ব্যাখ্যা করতে হয়। ফলশ্রুতি হাতে হাতে। দুম দুম করে আমার পিঠে কীল মেরে উঠে যায় রাখী-বহিন্।

কী আনন্দে যে ছিলাম! কিন্তু বেশীদিন আমার বরাতে তাও সইল না।

কিছুদিন পরেই খবর এল বালমুকুন্দের পিতাজীর বেমার হয়েছে। মাতাজী একা হাতে সংসার সামলাতে পারছেন না। রামরাখীকে সেখানে যেতে হবে। বালমুকুন্দ বলে, কিন্তু যাবে কেমন করে? আমার যে ছুটি নেই।

ওরা ভাবনায় পড়ল।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা দাদা এসে হাজির। সব শুনে বলেন, এ ভালই হয়েছে। বিশু রাখীকে নিয়ে যাক। দু-চার দিন গাঁয়ের ভিতর গিয়ে থাকুক। একটা ব্যাপার হয়েছে। এখন হিসাব করে দেখছি, বিশু দাসের টার্গেট থাকবে মাটি থেকে এগারো ফুট উঁচুতে। ওকে নতুন করে পাথর ছোঁড়া অভ্যাস করতে হবে। আমার দিকে ফিরে বললেন, এগুলো ধর।

দেখলাম গোটাকতক পাথর। বললেন, প্রত্যেকটার ওজন এক পাউণ্ড এগারো আউন্স। সিগারেটের টিনে লোকের সন্দেহ হবে। তুমি রাখীকে নিয়ে যাও। ফিতে দিয়ে মেপে কোন গাছে এগারো ফুট উঁচুতে টার্গেট ঝোলাবে। আর বিভিন্ন দূরত্ব থেকে সেটাতে টিপ করবে।

যে কথা সেই কাজ। রাখী বহিনকে নিয়ে আমি গেলাম খড়িয়ালায়। স্বচ্ছতোয়া ঝিলামের ধারে ঝিমন্ত একটা গ্রাম। মাটির বাড়ি, খাপরার ছাদ। শান্ত পরিবেশ। ভাই মথুরাদাসজী অমায়িক মানুষ। ওঁরা শুনলেন, বালমুকুন্দের ছুটি নেই বলে এক সহকর্মীর সঙ্গে স্ত্রীকে সে দেশে পাঠিয়েছে। আমার নাকি ছুটি ছিল। শক্ত সমর্থ একটি পুরুষ পেয়ে রোগীর বাড়িতে ওঁরা আর আমাকে ছাড়তে চান না। আমিও মোষের দুধ লোটা লোটা খেয়ে দিব্যি আছি। অবসর সময়ে টার্গেট প্র্যাকটিস করি। কিছুদিন পরেই এল সঙ্কেত। বালমুকুন্দজী খবর পাঠিয়েছেন, আমার ছুটি ফুরিয়ে গেছে। অবিলম্বে চাকরিতে যোগ না দিলে বড় সাহেব রাগ করবেন। মথুরাদাসজীর কাছে বিদায় নিলাম। দুঃখ করে বললেন, আমি অসুস্থ তোমার কিছুই দেখভাল করতে পারলাম না। আবার একবার এস।

বিদায় নিতে গেলাম রাখী-বহিনের কাছে। যেন আপন ভাই চলে যাচ্ছে। কেঁদে ফেলল রাখী। ভারি সেন্টিমেন্টাল ছিল সে। তখন জানতাম না—ওর সঙ্গে সেই শেষ সাক্ষাৎ। মনে হল, রূঢ়-বাস্তবের দিকে ওর দৃষ্টিটা আকর্ষণ করা উচিত। মনকে সে তৈরী করে রাখুক। না হলে আঘাত যেদিন আসবে ও সইতে পারবে না। বললাম, রাখী-বহিন, হয়তো তোমার সঙ্গে আর আমার দেখাই হবে না।

ও চোখ মুছে বললে, ঈস! তুমি কি ধরা পড়বে নাকি? তুমি তো বঙ্গালকা বাহাদুর! ঝট্‌সে কেটে পড়বার কথা আছে না তোমার?

কী বলব? তবু বললাম, হয়তো ধরাই পড়ে যাব। তক্‌দিরের কথা কি বলা যায়? ধরা পড়লেই—

গলায় হাত দিয়ে ফাঁসিটা ওকে বোঝাবার চেষ্টা করি।

চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, মিছিমিছি অমন ভয় দেখাবে না কিন্তু!

—মিছিমিছি নয় রাখী-বহিন! এই তো আমাদের নিয়তি! এ জেনেই তো পা বাড়িয়েছি এ পথে—আমি এবং তোমার স্বামী বালমুকুন্দজী!

শিউরে উঠল। তারপর শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বললে, দুনিয়ায় এমন শক্তি নেই যে আমাকে তাঁর কাছ থেকে আলাদা করে রাখতে পারে!

কী বোঝাবো পাগলীটাকে! একেবারে ছেলেমানুষ!

ঝড়ের বেগে কাজ করে যাচ্ছেন দাদা। এবার আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হচ্ছে।

আমার প্রস্তাবিত অ্যাকশনটা কী, তা আমি প্রথম জানতে পারলাম প্রায় এক বছর শাগরেদি করার পরে। তারিখটা মনে আছে। উনিশ শ' বারোর তেরই অক্টোবর। লাহোরের আগরওয়াল আশ্রমে দাদার সঙ্গে একটা গুপ্ত সমিতির বৈঠকে যোগ দিই। আমরা দুজন ছাড়া সেখানে ছিলেন অবোধবিহারী, দীননাথ আর বালমুকুন্দজী। শুনলাম, মাত্র দু-মাস পরে দিল্লীতে হবে

একটা মহতী সভা। ভারতের বড় লাট বাহাদুর হস্তিপৃষ্ঠে সাড়ম্বরে দিল্লি শহর প্রদক্ষিণ করে সভায় আসবেন। রাজধানী দিল্লির আনুষ্ঠানিক পত্তন হবে। সারা পৃথিবী থেকে আমন্ত্রিত হয়ে আসছেন মাননীয় অতিথিবৃন্দ। জার্মানী, ফ্রান্স, পারস্য, জাপান থেকে। এমন জাঁকজমকের ব্যাপার ভারতবর্ষে নাকি কখনও হয়নি, হয়ত হবেও না কখনও! সেই প্রসেশানে আমাকে উপস্থিত থাকতে হবে বোমা হাতে। আমার টার্গেট—হাতীর হাওদায় বসা স্বয়ং বড়লাট বাহাদুর!

দাদা ডিউটি ভাগ করে দিলেন। বললেন, মাত্র দু-মাস হাতে আছে। এর মধ্যে সব শেষ করতে হবে। শোন—বালমুকুন্দ আর দীননাথ তোমরা কিছু লিফলেট ছাপাবার ব্যবস্থা কর। কেন এই বোমাবর্ষণ, কেন প্রতিবাদ করছি আমরা—তা ঐ ইস্তাহারে ছাপা হবে। ঘটনার পরেই এগুলি প্রকাশ্য রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টে এঁটে দিতে হবে রাতারাতি। টাইমটা নোট করে রাখ। অ্যাকশন হবে তেইশে ডিসেম্বর বেলা এগারোটায়। ঐ দিন রাত্রেই সমস্ত বড় বড় শহরের ল্যাম্পপোস্টে, দেওয়ালে ঐগুলি সেঁটে দিতে হবে। 'লিবার্টি' নামে আমি একটি পত্রিকা বার করছি। তাতেও লেখা থাকবে ঐ সব কথা। ...অ্যাকশনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেবে বিশু দাস আর অবোধবিহারী। বিশুই প্রথমে ছুঁড়বে। না ফাটলে দ্বিতীয় বোমা ছুঁড়বে অবোধ। আমি কাছেই থাকব। আমি কাল-পরশুর মধ্যেই কলকাতা যাচ্ছি।

দীননাথ বললে, বোমা কি কলকাতা থেকে আসবে?

—হ্যাঁ।

—কে বানাবেন?

দাদা কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন দীননাথের দিকে। বললেন, দীননাথ! ইতিপূর্বেও আমি তোমাকে বলেছি—অহেতুক কৌতূহল প্রকাশ কর না।

দীননাথ থতমত খেয়ে বললে, আজ্ঞে না। আমি বলেছিলাম কি, যে বোমাটার এক্সপ্লোসিভ পাওয়ারটা আগে যাচাই করে দেখা উচিত নয়?

দাদা একই ভাবে বললেন, তোমার যা ডিউটি তুমি তাই কর। তোমার নেতা চূচেন্দ্রনাথ যদি পরখ না করে বোমা ছোঁড়ে সে দায়িত্ব তার।

বুঝলাম, এখানে সবাই রাসবিহারীর পরিচয় জানে না। কিন্তু কেন?

তখন আমি কেমন করে জানব, কেন এত সাবধানতা অবলম্বন করতেন দাদা! এত সাবধান হওয়া সত্ত্বেও দীননাথ তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরেছিল। সে পরে রাজসাক্ষী না হলে রাসবিহারীর নাম পুলিস জানতে পারত না।

ঐ মিটিং-এর পরেই দাদা আবার চন্দননগর যান। দিল্লি-চক্র জানত যে, তিনি বাঙলাদেশ থেকে বোমা আনতে গেছেন। ঠিক কোথায় কে ওটা তৈরি করেছিল তা কেউ জানত না। আমাকে উন পরে বলেছিলেন। দিল্লিতে যে বোমাটা ছোঁড়া হয় সেটা বানিয়েছিলেন চন্দননগরের মণীন্দ্রনাথ নায়েক। তাঁকে আমি স্বচক্ষে দেখিনি। শুনেছি তিনি আমারই মত ছোট্ট-খাট্টে মানুষ! দাদা গত বছর নাকি তাঁর তৈরী একটা বোমা পরীক্ষা করেছিলেন কালীপূজার রাত্রে। সেবার বোমাটা একবারে ফাটেনি। এ বছরও ঐ কালীপূজার রাত্রে মণীন্দ্রবাবু একটা বোমা ফাটিয়ে দেখালেন তার বিস্ফোরণী শক্তি। পরীক্ষাটা এবার হয়েছিল দাদার ফটকগোড়ার বাড়ির পিছনে, বাঁশবাগানে। আটই নভেম্বর, দীপান্বিতার রাত্রে।

যে দুটি বোমা দিল্লি দরবারের জন্য তৈরী হয়েছিল সে-দুটি নাকি চন্দননগর থেকে

নলিনীচন্দ্র দত্ত মাশই সযত্নে কলকাতায় নিয়ে আসেন। পার্শি বাগানে প্রফেসর সুরেশচন্দ্র দত্ত সে দুটি পরীক্ষা করে পাস মার্কা দেন, বলেন,—মণীন্দ্র বেশ পাকা জহুরী হয়ে উঠেছে হে। উল্লাসদাদার নাম রাখবে।

প্রথমে কথা ছিল দাদা নিজেই সে দুটি নিয়ে আসবেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি খালি হাতেই আসেন। কেন, তখন তা জানতাম না। পরে শুনেছিলাম তাঁর সঙ্গে একজন সি. আই. ডি. অফিসারও ছিলেন। তাই দাদা খালি হাতে এলেন। বোমা দুটি পরদিন পৌঁছে দিয়ে গেলেন চন্দননগরের জ্যোতিষ সিংহ মশাই। ডাকনাম পশুপতি। আমিও তাঁকে ঐ পশুপতিবাবু বলেই চিনতাম।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে দাদা আমাকে নিয়ে দিল্লিতে এলেন। উঠলাম আমীরচাঁদজীর বাড়িতে। আমীরচাঁদজী দিল্লির একটা প্ল্যান বার করে দিলেন। দাদা রাত্রে আমাকে নিয়ে পথে বার হলেন। হাঁটা-পথে আমরা দুজনে চলে এলাম চাঁদনীচকে। রাস্তা তখন জনবিরল। ডিসেম্বরের শীত। রাত একপ্রহর অতিক্রান্ত। নিশাচর দু-একটা টাঙ্গার আনাগোনা। দাদা অন্ধকারে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, ঐটা হচ্ছে ক্লক টাওয়ার। এটা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক। এই যে গাড়িবারান্দাওয়ালা দোতলা বাড়িটা দেখছিস ওর বারান্দায় তুই থাকবি। প্রসেশন আসবে ঐদিক থেকে। বারান্দায় থাকবে শুধু মেয়েরা। ওটা প্রীতমদাসজীর বাড়ি। তাঁদের বাড়ির মেয়েরা, ওখান থেকে শোভাযাত্রা দেখবে। তুইও থাকবি তাদের মধ্যে। স্ত্রীলোকের বেশে—

এতদিন ফুঁ দিয়ে দিয়ে আবার যে বেলুনটা ফোলাচ্ছিলাম ভুস্ করে চুপসে গেল সেটা। আমি পোড়াগাছার ডানপিটে ডাকাত! শেষকালে ঘোমটা মাথায়, চুড়ি পরে, নাকে নোলক দিয়ে...

—বুঝলি! ঐ যে পানের দোকানটা দেখছিস, ওটা এ বারান্দার এই থাম থেকে পঁয়ত্রিশ ফুট দূরে; আমি মেপে দেখেছি। এই ল্যাম্পপোস্টটা বারান্দা থেকে পঁচিশ ফুট। এই দশফুট হচ্ছে তোর এক্তিয়ার। প্রসেশন এই দশ ফুট পার হতে দুই থেকে তিন সেকেণ্ড সময় নেবে। তার মধ্যে তোকে ছুঁড়তে হবে মালটা। যদি কোন কারণে সুযোগ না হয় তবে নিঃশব্দে সরে পড়বি!

—তা হলে অ্যাক্‌শন্ পোস্টপোণ্ড হয়ে যাবে?

—না! পরের তিন সেকেণ্ড হচ্ছে অবোধবিহারীর রেঞ্জ! ল্যাম্পপোস্ট থেকে এই চৌকা পাথরটা পর্যন্ত। অবোধ থাকবে রাস্তায় ঐ গাছটায় হেলান দিয়ে।

—আপনি কোথায় থাকবেন?

—ঠিক এইখানটায়। আমার হাতে রিভলভার থাকবে। বোমা নয়। তোরা দুজনেই মিস্ করলে আমি কর্ডন ভেঙে বেরিয়ে যাব। ক্রোস-রেঞ্জ থেকে যেমন করে হোক...শোন! যাই ঘটুক না কেন, অ্যাকশনের পরেই যে যার মত আমরা সরে পড়ব। আমি যাব দেরাদুন, তুই লাহোর আর অবোধ আম্বালা। অলাদা আলাদা! এনি কোশ্চেন?

আমতা আমতা করে বলি, ইয়ে ঐ মেয়েছেলের পোশাকের ব্যাপারটা পালটানো যায় না?

—দ্যাটস্ আউট অব দি কোশ্চেন!

দাদা একটা এক্কা ডেকে চড়ে বসলেন। আমিও উঠতে যাচ্ছিলাম, উনি বাধা দিলেন।

বললেন, তুমি হেঁটে ফিরবে। রাস্তা চিনে চিনে। ম্যাপটা রাখ।

অগত্যা শীতের রাত্রে পথ চিনে চিনে আমি ফিরে চললাম।

উনিশ তারিখে লাহোর থেকে রওনা হলাম। রামরাখী তখনও শ্বশুরবাড়ি। আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল বালমুকুন্দ। বিদায় বেলায় আমার হাতটা ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললে, উইস য়ু অল সাকসেস্।

আঠারো তারিখে অবোধবিহারী রওনা হয়েছিল লাহোর থেকে। দাদা দিল্লিতেই ছিলেন।

২১শে ডিসেম্বর সকাল আটটায় একটি টাঙ্গায় রওনা দিলাম আমরা দুজন। আমীরচাঁদজীর বাড়ি থেকে। টাঙ্গায় দুজন আরোহী। স্বামী-স্ত্রী। স্বামী—সর্দার হরবন্সলালজী। দশাসই জোয়ান। মাথায় ইয়া পাগড়ি, মোম দিয়ে পাকানো ইয়া গোঁফ। জাল দিয়ে বাঁধা দাড়ি। পরনে শেরওয়ানি চোস্ত! হাতে পোর্টম্যান্টো। স্ত্রী—ছিপছিপে তন্বী-তরুণী, পরনে সালওয়ার-পাঞ্জাবী-দোপাট্টা। তার হাতেও ব্যাগ। শীতের দিন, তাই গায়ে শাল। মাথায় জরির ফিতে দিয়ে বাঁধা বেণী, চোখে কাজল, কপালে কাঁচপোকার টিপ। এ্যা ছি-ছি-ছি! মনে করলেও আজ লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যায় আমার। সবচেয়ে প্যাথেটিক অবস্থা হচ্ছিল যখন সর্দারজী আড় চোখে আমার দিকে চাইছিলেন আর ঘনিয়ে এসে আমার রক্ত-রাঙা কর্ণমূলে প্রেমিকের মত কূজন করছিলেন!

—কাঁহা যানা হ্যায় সর্দারজী? —টাঙ্গাওয়ালার প্রশ্ন।

—চাঁদনীচউক। বিবিকো জলুস দেখলাউঙ্গা!

এক গাল হাসলে টাঙ্গাওয়ালা।

রাস্তায় দেখি সেই সাত সকাল থেকেই কাতারে কাতারে লোক ঠায় দাঁড়িয়ে আছে জায়গা নিয়ে। জৌলুস আসতে তখন ঘন্টা তিনেক দেরি। জানা ছিল, স্পেশাল ট্রেনে বড়লাট বাহাদুর সস্ত্রীক আসছেন। দিল্লী স্টেশনে তাঁর সংবর্ধনা হবে। সেখানে থেকে হস্তিপৃষ্ঠে তিনি নগর ভ্রমণ করে যাবেন সভাস্থলে। এখনও তার অনেক দেরি। তবু দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈনিকের দল রাজপথ মুখরিত করে মাঝে মাঝে ছুটে যাচ্ছে। রাজপথে মানুষ তো ছার কুটো-গাছটি পর্যন্ত পড়ে নেই। রাস্তার দু-পাশে মোটা কাছি হাতে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ বাহিনী। কাউকে নামতে দিচ্ছে না রাজপথে। প্রতি বিশফুট তফাত তফাত বন্দুকধারী অশ্বারোহী পুলিশ। কাছির বন্ধনীর ভিতর কাতারে কাতারে মানুষ! চাঁদনীচক পর্যন্ত টাঙ্গা যেতে দিল না পুলিসে। পদব্রজে ভিড় ঠেলে দুজনে পৌঁছলাম সেখানে। দেখা গেল, সর্দার হরবন্সলালজী ঐ গৃহের মালিকের কাছে অপরিচিত নন। একটি তরুণী আমাদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল, আমার হাতটা—যে হাতটায় সিগারেটের টিন সমেত ব্যাগটা ধরা ছিল সেটা নয়—টেনে নিয়ে বললে, আইয়ে ভাবিজী!

সর্দারজীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বিশুদ্ধ উর্দুতে বললে, যো হুরী আপ্নে চুন্হা আপতো সিরফ্ জোহুরী হ্যাঁয়!

হা হা করে ঠারে ঠারে হাসলেন সর্দার হরবন্সলালজী। আমার খস্ম!

আমার কর্ণমূল রক্তাক্ত হয়ে ওঠে।

বারান্দায় গিয়ে বসতেই তরুণীটি বললে, ক্যা নাম আপকী ভাবিজী?

—লছ্মি!

—অপ্ বহুৎ খুপসুরৎ!

বারান্দা দিয়ে দেখতে পেলাম অদূরে দাঁড়িয়ে আছে অবোধবিহারী গাছে হেলান দিয়ে।

আমার চোখ পড়ায় হাসল। তা সুন্দরী তরুণী দেখলে কে না মুচকি হাসে!

ঘণ্টাখানেক কাটল। মাঝে মাঝে সোরগোল শোনা যাচ্ছে—ঐ আসছে, ঐ আসছে। তারপরই বোঝা যায় বাজে গুজব। খানিক পরে লক্ষ্য হল রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে সর্দার হরবললাল আমাকে কি ইঙ্গিত করছেন। আমার প্রথমটা নজর পড়েনি। ঐ মেয়েটিই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল এদিকে। দেখলাম, উনি আমাকে ইঙ্গিত করছেন নেমে আসতে।

আবার কী হল? নেমে এলাম। কাছে আসতেই কানে কানে বললেন, চলে আয় আমার পিছন পিছনে।

কেন জিজ্ঞাসা করার কানুন নেই। ওঁর পিছন পিছন চলে এলাম। ভীষণ উত্তেজিত মনে হল ওঁকে। বললেন, একটা কথা খেয়ালই হয়নি। তুই যে মাটি থেকে ষোল ফুট উঠে যাচ্ছিস্! মাটিতে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস্ করেছিস তুই! মাটিতে দাঁড়িয়েই ছুঁড়তে হবে।

কী সর্বনাশ! পুরুষের ভিড়ে আমি মেয়েছেলে কেমন করে—

উপায় উনিই বাৎলালেন। আমার ব্যাগের ভিতর ছিল পুরুষের পোশাক। অ্যাকশনের পর সেগুলি আমার পরার কথা। উনি বললেন, ঐ ব্যাগটা নিয়েই তুই বাথরুমে চলে যা। পোশাক বদলিয়ে নেমে আয়।

উনি তো বলে খালাস! বাথরুমে ব্যাগ নিয়ে ঢুকবে একটি তরুণী, বেরিয়ে আসবে একজন যুবক! এ হয় নাকি! কারও নজরে পড়ে গেলে? কিন্তু ভাববার সময় নেই। ভগবান সহায় ছিলেন। আধঘন্টা পরে পুরুষের বেশে বার হয়ে এলাম আমি।

লছমীবাঈ-এর খোঁজ ও বাড়িতে হয়েছিল কিনা জানি না তবে স্ত্রীর সন্ধান নিতে সর্দারজী যে আর কোনদিন ও পাড়ামুখো হননি, এটুকু জানি।

দাদা আমাকে কানে কানে বললেন, আরও একটা লাস্ট-মোমেন্টে চেঞ্জ করতে হয়েছে। আমি আর অবোধ স্থান বদল করেছি। হাতিয়ারও। সুযোগমত তুমি বা আমি যে আগে পারব ওটা ছুঁড়ব। প্রথম নিক্ষেপকারীকে মনে রাখতে হবে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও ক্ষতি নেই, সে যেন 'আন-অবসার্ভড' থাকে। কারণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও এক্সপ্লোশান একটা হবেই। ফলে দ্বিতীয় নিক্ষেপকারী তাক করে ছুঁড়বার যথেষ্ট সময় পাবে। কারণ তখন লক্ষ লোকের লক্ষ্য থাকবে যেখানে বিস্ফোরণ ঘটছে সেখানে। বুঝলি?

—বুঝলাম।

—যদি তুমি প্রথম ছোঁড় তবে তোমার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে—ধরা না পড়া! লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও ক্ষতি নেই।

আবার আমরা দুজনে দাঁড়াই ফুট দশেক দূরে। অবোধ অপর ফুটপাথে।

—এসে গেছে! এসে গেছে!

হ্যাঁ এবার সত্যিই আসছে। বেলা পৌনে বারোটা! পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সশস্ত্র সৈনিক আসছে পুরোভাগে। পিছনে এক হস্তিদানব! অতবড় হাতী আমি দেখিনি। প্রকাণ্ড তাঁর দাঁত। সোনা দিয়ে বাঁধানো হাতীর দাঁতের মাথাটা। গজকুম্ভে ভেলভেটের চাদর। উপরে রূপার তৈরী হাওদা রৌদ্রে ঝল্‌মল করছে। তার উপর রূপার ছত্রাবলী ধরে বসে আছে একজন তক্‌মা-আঁটা রাজপুরুষ। সে নাকি, পরে জেনেছিলাম, বলরামপুর স্টেটের—জমাদার মহাবীর সিং। দুর্লভ সৌভাগ্য তার—সে আজ ছত্রধর। রাজবেশে বসে আছেন লর্ড হার্ডিঞ্জ, বামে মহিষী—লেডি হার্ডিঞ্জ। পিছনে হাতীর সারি। অন্যান্য তা-বড় তা-বড় তালেবর!

রাজপথে লক্ষ লোক জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে।

আড়চোখে পাশে তাকিয়ে দেখি দাদার হাতে একটা বার্ড্স-আই-এর কৌটা, ঠোঁটে ঝুলছে একটা বার্ড্স-আই!

পঞ্চাশ-পঁয়তাল্লিশ-চল্লিশ-পঁয়ত্রিশ! দূরত্বটা আন্দাজ করছি মনে মনে।

আবার জয়ধ্বনি। আর সেই মুহূর্তেই শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হল একটা সিগারেট টিন। নির্ভুল লক্ষ্যে সেটা গিয়ে আঘাত করল ঐ রূপার তৈরী হাওদায়। প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ। শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হল রৌপ্যছত্র! লুটিয়ে পড়ল মাটিতে স্বর্ণদণ্ডে শোভিত ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা! হাওদা গেল হেলে। ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে শুন্ড উৎক্ষিপ্ত করে নিদারুণ বৃংহতিতে প্রতিবাদ করল গজরাজ! লেডি হার্ডিঞ্জ ঝুঁকে পড়লেন স্বামীর দিকে। হিস্ এক্সেলেন্সি লর্ড হার্ডিঞ্জ টলে পড়লেন হাওদায়—স্ত্রীর কোলে।

মিশন সাক্সেসফুল—ভাইস্‌রয় ইজ চিৎপটাং!

আমি তখন ধীরে-সুস্থে মিলিয়ে গেছি ভিড়ে।

পরে শুনেছিলাম, বিস্ফোরণে ছত্রধারী জমাদার মহাবীর সিং-এর ঘটনাস্থলেই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটেছিল। ভাইস্‌রয়ের পৃষ্ঠদেশে লেগেছিল আঘাত। কাঁধে তিন ইঞ্চি লম্বা এবং এক ইঞ্চি গভীর ক্ষত হয়েছিল। কর্নেল ম্যাক্সওয়েল এবং কর্নেল রবার্টস্ যখন রক্তস্নাত ভাইস্‌রয়কে হাতী থেকে নামান তখন তিনি সংজ্ঞাহীন। সবাই ভেবেছিল তিনি মৃত। সর্বসমক্ষে রাজবেশ খুলে ফেলতে হল ভাইস্‌রয়কে। ডাক্তার পরীক্ষা করলেন ক্ষতস্থান।

সভাস্থলে আর যেতে পারেননি লর্ড! তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল রোগশয্যায়!

বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের মধ্যে কে যেন চীৎকার করে উঠেছিল! সাব্বাস! মার দিয়া।

কে চীৎকার করেছিল? দাদা, না অবোধ? জানি না—কিন্তু শব্দটা কানে গিয়েছিল আমার।

আমার উপর নির্দেশ ছিল একুশে রাত্রের ট্রেন ধরে আমি সোজা চলে যাব লাহোর। বাইশে সকালে পপুলার ডিস্‌পেন্সারিতে বসে যথারীতি ওষুধ বেচব। কিন্তু কী খেয়ালের ভূত চাপল আমার মাথায়, মনে হল দেরাদুনে যাই। দাদাকে একটা প্রণাম করে আসি! বোমা ফেটেছে, হাতীটা শূন্যে শুঁড় তুলে তীব্র বৃংহতিতে সকলকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে! রক্তাক্ত একটা মৃতদেহকে হাওদা থেকে উল্টে পড়তে আমি স্বচক্ষে দেখেছি! 'ভাইস্‌রয় ইজ চিৎপটাং'—এ আর দিবাস্বপ্ন নয়, আমার প্রত্যক্ষ ঘটনা! এর পরে দাদার পায়ের ধূলো মাথায় না-নেওয়া পর্যন্ত প্রাণটা কি ঠাণ্ডা হয়? পাঞ্জাব মেলে না উঠে আমি ট্রেন বদলে ধরলাম দেরাদুন এক্সপ্রেস। থার্ডক্লাসের একটা কামরায় বাঙ্কে উঠে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকলাম।

রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম। আশ্চর্য! দাদাকে নয়, মাকে নয়, দিল্লি রাজপথের নাটকীয় দৃশ্যটাও নয়—স্বপ্নে দেখলাম রাখী-বহিন্‌কে। দুম দুম করে আমার পিঠে কিল মারছে আর বলছে ভয় ডর বলে কিচ্ছু কি নেই গা?

আমি হাসতে হাসতে বলছি, কী? ঝট্‌সে কেমন পালিয়ে এলাম?

একগাল হেসে রাখী-বহিন্ বলছে তু তো একদম বাহাদুর! বঙ্গালকা শের।

ভোরবেলা এসে পৌঁছলাম দেরাদুনে। ঘোষী-মহল্লার বাড়িতে এসে দেখি দরজায় তালা ঝুলছে। আমার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি ছিল। ঘরে ঢুকলাম। কাল রাত্রে কিছু খাওয়া হয়নি। দাদার ঘরেও খাদ্যদ্রব্য কিছু পাওয়া গেল না। একটা বিস্কুটের টিন উদ্ধার করা গেল। বিস্কুট

খেলাম খান আট-দশ। তারপর স্নান সেরে চলে গেলাম দাদার অফিসে। কেমিক্যাল ল্যাবরেটারির নির্দিষ্ট স্থানেও দাদাকে পাওয়া গেল না। চাপরাশি বললে, কী একটা মিটিং হচ্ছে—দাদা সেখানে আছেন।

কী কাণ্ড! বনবিভাগের মাঠে মিটিং হচ্ছে। দাদা সভাপতি। কিসের মিটিং? অল্প আয়েসেই সেটা জানা গেল। গতকাল দিল্লিতে কোন বর্বর নাকি মহামান্য ভাইস্‌রয়ের উপর বোমা ফেলেছে। তারই প্রতিবাদে এই মিটিং। হায় ভগবান! আমার দাদা সেই মিটিং-এ সভাপতিত্ব করছেন!

এগিয়ে গেলাম। সভাপতির ভাষণ হচ্ছে। উদাত্তকণ্ঠে ডান হাতে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করে রাসবিহারী বসুমশাই—ওরফে সতীন্দ্রচন্দ্র, ওরফে চূচেন্দ্রনাথ, ওরফে ইত্যাদি ইত্যাদি—আগুন ছুটিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। ভাইসব! আমরা কি মরে গেছি? এর জবাব আমরা দেব না? শুধু মিলিটারি আর পুলিস নয়, ত্রিশ কোটি ভারতবাসী এর পর থেকে ঘিরে রাখবে আমাদের নয়নের মণি সম্রাটপ্রতিভূকে! সারা পৃথিবী আজ হাসছে! যে ইংরেজ আমাদের দেশে সতীদাহ বন্ধ করেছে, ঠগীর অত্যাচার বন্ধ করেছে, শিক্ষায়-স্বাস্থ্যে নিয়ম শৃঙ্খলায় খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারতকে একসূত্রে গেঁথে তুলেছে সেই ইংরেজের সর্বোচ্চ প্রতিনিধি—আমাদের বড়লাট বাহাদুরের প্রতি নিক্ষিপ্ত ঐ বোমা আমাদেরই গায়ে এসে লেগেছে! ঈশ্বর করুণাময়। বড়লাট বাহাদুরের প্রাণহানি হয়নি। কিন্তু লজ্জায়, ঘৃণায়, অনুশোচনায় আজ প্রতিটি ভারতবাসীর মাথা হেঁট হয়ে গেছে! কে সেই দুশমন, আমরা জানি না—কিন্তু তাকে আমরা খুঁজে বার করবই! পুলিস নয়, মিলিটারি নয়—আমি, আপনি, আমরা! তারপর ঐ দিল্লির রাজপথে—ঐ চাঁদনীচকের সামনেই আমরা তাকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেব। বলুন আমার সঙ্গে একসুরে ভারতের বড়লাট—দীর্ঘজীবী হউন!

সমস্বরে সবাই বলে ওঠে ঃ ভারতের বড়লাট—দীর্ঘজীবী হউন!

আমার মাথার মধ্যে তখন টল্‌ছে! অমরদা যে লোকটার হাতে আমাকে সমর্পণ করে দিয়েছেন সে কী? দেবতা না দানব? ঐ লোকটা আমাকে তামাক সেজে দেওয়ার কথা বলায় আমার আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল সেদিন—আমি যে ওঁর পায়ের তলায় যুগ যুগ শুয়ে থাকতে পারি! চরণ দুটি বুকে জড়িয়ে!

ফিরে এলাম চুপিসারে। দাদা আমাকে দেখতে পাননি। পেটে দানাপানি নেই। দরজা খোলা রেখেই চাদর মুড়ি দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ি। আর তখনই ঘুম।

ঘুম ভাঙলো সন্ধ্যার পর! চোখে টর্চের আলো পড়ায় ধড়মড়িয়ে উঠে বসি।

—কে! কে ওখানে শুয়ে?

দাদা ফিরে এসেছেন। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলি : আমি!

জ্বলন্ত টর্চটা উনি ছুঁড়ে দিলেন বিছানায়। আবছা আলোয় ছুটে এলেন আমার কাছে। দু'হাতে পাঁজাকোলা করে আমাকে তুলে ধরে বাচ্চা ছেলের মত নাচতে থাকেন। ওঁর সেই চল্লিশ ইঞ্চি ছাতির মধ্যে দুটি পেশীবহুল বাহুর আবেষ্টনীতে ছোট্ট-মানুষ আমি হাঁপিয়ে উঠি। বলিঃ কী করছেন দাদা! পড়ে যাব! ছেড়ে দিন!

আমি যেন শিশু! আমার ছোট্ট-খাট্ট দেহটা দোলাতে দোলাতে উনি শুধু বলছেন : বিশে, তুনে কামাল কিয়া! সাবাস রে বেটা! সাবাস!

হঠাৎ কী খেয়াল হল! ধপাস করে ফেলে দিলেন আমাকে। তারপরেই হুঙ্কার দিয়ে

ওঠেন : উঠে আয়!

উঠে দাঁড়াতেই ঠাস্ করে এক বেমক্কা চড় আমার গালে!

—হতভাগা! পাঁজি-বাদর! কী বলেছিলাম তোকে? আজ না লাহোরের ডিস্‌পেন্সারিতে বসে তোর ওষুধ বেচার কথা?

আমি দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলি!

কেমন যেন মিইয়ে যান মুহূর্তে। আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বলেন, এই বসন্ত! লেগেছে? হ্যাঁরে, বড় জোর মেরে বসেছি নাকি? দূর বোকা ছেলে। কাঁদছিস্ কেন?

দু'হাতে চোখ রগড়ে বল্‌লাম : আনন্দে কাঁদছি দাদা! আনন্দে! এ যে আমার কতবড় প্রাপ্তি তা আপনি কী বুঝবেন!

দু'বছর ছিলাম ওঁর সান্নিধ্যে। ভুল করে তার মধ্যে একদিনই উনি আমাকে ডেকেছিলেন 'বসন্ত' বলে। সেই ভুলটাই বুঝিয়ে দেয়, আমাকে চড় মেরে কতটা ব্যথা পেয়েছিলেন উনি। এমন ভুল রাসবিহারী বোধ হয় জীবনে দুবার করেননি। বিপ্লবীকে তার পিতৃদত্ত নামে ডাকা!

সারা পৃথিবী ওদিকে তোলপাড়। অপরাধীকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। লক্ষ লোকের চোখের সামনে থেকে কেমন করে পালালো সেই দুশমন! সি. আই. ডি. আর পুলিসের মাথা কাটা যাচ্ছে লজ্জায়। প্রতিদিন কাগজে অকর্মণ্য পুলিস বাহিনীকে গালাগালি দিচ্ছে সম্পাদকের দল। সরকার একলক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করলেন। ঐ লক্ষ টাকার অঙ্ক একটা রেকর্ড! তা তো হবেই। দাদাই তো বলেছিলেন, লেভেলটা একটা উঁচুতে ধরতে হবে।

আমি ওষুধ বেচি। বালমুকুন্দ ছেলে ঠেঙায়। দাদা অফিস করেন আর বেহালা বাজান। দিন কেটে যাচ্ছে। মাসখানেক পরে একদিন আমি লাহোর থেকে দেরাদুন এসেছি দাদার কাছে। ঘোষী-মহল্লার সেই ঘরে ঢুকতেই দেখি দাদা ইউনিফর্ম-পরা একজন দারোগার সঙ্গে কথা বলছেন।

সর্বনাশ! রাখী-বহিনের ভাষায় আমি ঝট্‌সে কেটে পড়ি।

দারোগাবাবু চলে যেতে ঘরে এসে বললাম. ও কে দাদা? আপনাকে কি পুলিসে সন্দেহ করছে?

দাদা হেসে বলেন, পাগল! লোকটাকে চিনে রেখেছিস তো? ওর নাম সুনীল ঘোষ! মহা ধড়িবাজ! ঘড়িয়ালস্য ঘড়িয়াল! আমার বাড়ি চন্দননগরে শুনে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল শ্রীশ ঘোষকে আমি চিনি কিনা! এক ঘোষ আর এক ঘোষকে ঘষ্‌তে চায়!

আমার হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। বলি, কি বললেন আপনি?

—বললাম, আলবৎ! শ্রীশ আমার ভাই হয় সম্পর্কে! খুব চিনি।

—সে কি! স্বীকার করলেন কেন আপনি?

—দূর বোকা। ও তো চন্দননগরে গেলেই সেটা জানবে। হয়তো বেটা আগে থেকেই জানত! এই দেখ না, বেটা একশটা টাকা চাঁদা দিয়ে গেল!

—চাঁদা! কিসের চাঁদা?

—আমাদের টেররিস্ট ফাণ্ডে।

শুনলাম বিস্তারিত। দাদা শ্রীঘ্রই চন্দননগর যাচ্ছেন শুনে ঐ সি. আই. ডি. অফিসার দাদাকে টিকটিকির এজেন্ট নিযুক্ত করেছে। চন্দননগরের শ্রীশ ঘোষ, মতিলাল রায়, নরেন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির সম্বন্ধে যাবতীয় খবর দাদাকে এনে দিতে হবে। বিশেষ করে শ্রীশ ঘোষ। তাকে নাকি মাঝে মাঝে কাশীতে, সাহারানপুরে, দিল্লিতে দেখা গেছে! সে কোথায়, কার কাছে যায় তা দাদাকে জেনে আসতে হবে! তারই দাদন ঐ একশ টাকা!

—আপনি নিলেন ওর টাকা!—অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করি আমি।

—নেব না! বর্বরস্য ধনক্ষয়ঃ! তাছাড়া টাকার টানাটানি চল্‌ছেরে বিশে!

পাঁচ মাস পরের কথা। আবার ডাক এল। বালমুকুন্দজী বললে, দিল্লী থেকে অবোধবিহারী আসছেন। আমাকেও তাঁর সঙ্গে থাকতে হবে। অ্যাক্‌শন এই লাহোরেই। বিস্তারিত নির্দেশ অবোধবিহারীর কাছে পাওয়া যাবে। নির্ধারিত দিনে অবোধবিহারী এলেন। সঙ্গে দাদার একটি নির্দেশ পত্র। তাতে সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা আছে আমি ও অবোধবিহারী যাব লরেন্স গার্ডেনে অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার গর্ডনকে হত্যা করতে। অবোধবিহারী বললে, এ নির্দেশটি রাসবিহারীদা দীননাথের হাতে অবোধবিহারীকে পাঠিয়েছেন। আমি ভাবলাম হাতী মেরেছি, এখন ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করি কেন? বললাম সে কথা, কমিশনরাই যখন লাহোরে আছে তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারকে মারা কেন?

অবোধবিহারীকে বললে, তুমি জান না বাবুজী। এই গর্ডন অতি পাজী লোক! এর আগে ও ছিল সিলেটে। তখন ছিল এস. ডি. ও.। জগতশ্রী আশ্রমে লোকটা নারকীয় কাণ্ড করেছিল। স্বামী দয়ানন্দের আশ্রম পুড়িয়ে দিয়েছিল, মেয়েদের ইজ্জত নিয়েছিল আর হাবিবগঞ্জ স্কুলের হেডমাস্টার মহেন্দ্রনাথ দে-কে গুলি করে মেরেছিল। প্রতিশোধ নিতে অনুশীলন সমিতির যোগেন চক্রবর্তী বোমা নিয়ে ওকে মারতে গিয়েছিলেন মৌলভীবাজারে। অসময়ে বোমা ফেটে যাওয়ায় যোগেনবাবুই মারা যান।

বললাম, সে-ক্ষেত্রে অবশ্য—

—শুধু সে-ক্ষেত্রে নয়? স্বামী দয়ানন্দের আশ্রম জ্বালিয়ে দেওয়ার পুরস্কার স্বরূপ ইংরেজ সরকার ওকে প্রমোশন দিয়ে এস. ডি. ও থেকে অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার করে দিয়েছে। বাঙলার বিপ্লবীদের হাত থেকে ওকে বাঁচাতে সুদূর পাঞ্জাবে ওকে বদলি করেছে।

আমি হেসে বলিঃ বাঙালী যেন পাঞ্জাবে আসতে পারে না?

অবোধবিহারী সঙ্গে সঙ্গে বললেঃ পাঞ্জাবী যেন বাঙালীর মত বোমা ছুঁড়তে পারে না।

অবোধবিহারী লাহোর ট্রেনিং কলেজের ছাত্র।

আমি আর অবোধ গিয়েছিলাম অ্যাক্‌শনে। কিন্তু বোমা ছোঁড়ার সুযোগ পাইনি। লরেন্স গর্ডনের বারে ঢুকতে পারিনি আমরা। গর্ডন বসে বসে মদ গিলছিল, তা কাচের জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম। শেষ পর্যন্ত একটা চান্স নিলাম আমরা। মদ্যপানের পর যে পথ দিয়ে ও বেরিয়ে আসবে সেইখানেই রেখে এলাম বোমাটা!

নিয়তিই বলতে হবে। গর্ডন বেরিয়ে আসার আগেই ও পথে গিয়েছিল একজন চাপরাশী। লাইব্রেরী রোড ধরে। বেচারা মারা পড়ল আমার বোমায়।

এ ঘটনা সতেরই মে উনিশ শ তেরর।

ওঠেন : উঠে আয়!

উঠে দাঁড়াতেই ঠাস্ করে এক বেমক্কা চড় আমার গালে!

—হতভাগা! পাঁজি-বাদর! কী বলেছিলাম তোকে? আজ না লাহোরের ডিস্‌পেন্সারিতে বসে তোর ওষুধ বেচার কথা?

আমি দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলি!

কেমন যেন মিইয়ে যান মুহূর্তে। আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বলেন, এই বসন্ত! লেগেছে? হ্যাঁরে, বড় জোর মেরে বসেছি নাকি? দূর বোকা ছেলে। কাঁদছিস্ কেন?

দু'হাতে চোখ রগড়ে বল্‌লাম : আনন্দে কাঁদছি দাদা! আনন্দে! এ যে আমার কতবড় প্রাপ্তি তা আপনি কী বুঝবেন!

দু'বছর ছিলাম ওঁর সান্নিধ্যে। ভুল করে তার মধ্যে একদিনই উনি আমাকে ডেকেছিলেন 'বসন্ত' বলে। সেই ভুলটাই বুঝিয়ে দেয়, আমাকে চড় মেরে কতটা ব্যথা পেয়েছিলেন উনি। এমন ভুল রাসবিহারী বোধ হয় জীবনে দুবার করেননি। বিপ্লবীকে তার পিতৃদত্ত নামে ডাকা!

সারা পৃথিবী ওদিকে তোলপাড়। অপরাধীকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। লক্ষ লোকের চোখের সামনে থেকে কেমন করে পালালো সেই দুশমন! সি. আই. ডি. আর পুলিসের মাথা কাটা যাচ্ছে লজ্জায়। প্রতিদিন কাগজে অকর্মণ্য পুলিস বাহিনীকে গালাগালি দিচ্ছে সম্পাদকের দল। সরকার একলক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করলেন। ঐ লক্ষ টাকার অঙ্ক একটা রেকর্ড! তা তো হবেই। দাদাই তো বলেছিলেন, লেভেলটা একটা উঁচুতে ধরতে হবে।

আমি ওষুধ বেচি। বালমুকুন্দ ছেলে ঠেঙায়। দাদা অফিস করেন আর বেহালা বাজান। দিন কেটে যাচ্ছে। মাসখানেক পরে একদিন আমি লাহোর থেকে দেরাদুন এসেছি দাদার কাছে। ঘোষী-মহল্লার সেই ঘরে ঢুকতেই দেখি দাদা ইউনিফর্ম-পরা একজন দারোগার সঙ্গে কথা বলছেন।

সর্বনাশ! রাখী-বহিনের ভাষায় আমি ঝট্‌সে কেটে পড়ি।

দারোগাবাবু চলে যেতে ঘরে এসে বললাম. ও কে দাদা? আপনাকে কি পুলিসে সন্দেহ করছে?

দাদা হেসে বলেন, পাগল! লোকটাকে চিনে রেখেছিস তো? ওর নাম সুনীল ঘোষ! মহা ধড়িবাজ! ঘড়িয়ালস্য ঘড়িয়াল! আমার বাড়ি চন্দননগরে শুনে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল শ্রীশ ঘোষকে আমি চিনি কিনা! এক ঘোষ আর এক ঘোষকে ঘষ্‌তে চায়!

আমার হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। বলি, কি বললেন আপনি?

—বললাম, আলবৎ! শ্রীশ আমার ভাই হয় সম্পর্কে! খুব চিনি।

—সে কি! স্বীকার করলেন কেন আপনি?

—দূর বোকা। ও তো চন্দননগরে গেলেই সেটা জানবে। হয়তো বেটা আগে থেকেই জানত! এই দেখ না, বেটা একশটা টাকা চাঁদা দিয়ে গেল!

—চাঁদা! কিসের চাঁদা?

—আমাদের টেররিস্ট ফাণ্ডে।

শুনলাম বিস্তারিত। দাদা শ্রীঘ্রই চন্দননগর যাচ্ছেন শুনে ঐ সি. আই. ডি. অফিসার দাদাকে টিকটিকির এজেন্ট নিযুক্ত করেছে। চন্দননগরের শ্রীশ ঘোষ, মতিলাল রায়, নরেন্দ্র

গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদির সম্বন্ধে যাবতীয় খবর দাদাকে এনে দিতে হবে। বিশেষ করে শ্রীশ ঘোষ। তাকে নাকি মাঝে মাঝে কাশীতে, সাহারানপুরে, দিল্লিতে দেখা গেছে! সে কোথায়, কার কাছে যায় তা দাদাকে জেনে আসতে হবে! তারই দাদন ঐ একশ টাকা!

—আপনি নিলেন ওর টাকা!—অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করি আমি।

—নেব না! বর্বরস্য ধনক্ষয়ঃ! তাছাড়া টাকার টানাটানি চল্‌ছেরে বিশে!

পাঁচ মাস পরের কথা। আবার ডাক এল। বালমুকুন্দজী বললে, দিল্লী থেকে অবোধবিহারী আসছেন। আমাকেও তাঁর সঙ্গে থাকতে হবে। অ্যাক্‌শন এই লাহোরেই। বিস্তারিত নির্দেশ অবোধবিহারীর কাছে পাওয়া যাবে। নির্ধারিত দিনে অবোধবিহারী এলেন। সঙ্গে দাদার একটি নির্দেশ পত্র। তাতে সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা আছে আমি ও অবোধবিহারী যাব লরেন্স গার্ডেনে অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার গর্ডনকে হত্যা করতে। অবোধবিহারী বললে, এ নির্দেশটি রাসবিহারীদা দীননাথের হাতে অবোধবিহারীকে পাঠিয়েছেন। আমি ভাবলাম হাতী মেরেছি, এখন ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করি কেন? বললাম সে কথা, কমিশনরাই যখন লাহোরে আছে তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারকে মারা কেন?

অবোধবিহারীকে বললে, তুমি জান না বাবুজী। এই গর্ডন অতি পাজী লোক! এর আগে ও ছিল সিলেটে। তখন ছিল এস. ডি. ও.। জগতশ্রী আশ্রমে লোকটা নারকীয় কাণ্ড করেছিল। স্বামী দয়ানন্দের আশ্রম পুড়িয়ে দিয়েছিল, মেয়েদের ইজ্জত নিয়েছিল আর হাবিবগঞ্জ স্কুলের হেডমাস্টার মহেন্দ্রনাথ দে-কে গুলি করে মেরেছিল। প্রতিশোধ নিতে অনুশীলন সমিতির যোগেন চক্রবর্তী বোমা নিয়ে ওকে মারতে গিয়েছিলেন মৌলভীবাজারে। অসময়ে বোমা ফেটে যাওয়ায় যোগেনবাবুই মারা যান।

বললাম, সে-ক্ষেত্রে অবশ্য—

—শুধু সে-ক্ষেত্রে নয়? স্বামী দয়ানন্দের আশ্রম জ্বালিয়ে দেওয়ার পুরস্কার স্বরূপ ইংরেজ সরকার ওকে প্রমোশন দিয়ে এস. ডি. ও থেকে অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার করে দিয়েছে। বাঙলার বিপ্লবীদের হাত থেকে ওকে বাঁচাতে সুদূর পাঞ্জাবে ওকে বদলি করেছে।

আমি হেসে বলিঃ বাঙালী যেন পাঞ্জাবে আসতে পারে না?

অবোধবিহারী সঙ্গে সঙ্গে বললেঃ পাঞ্জাবী যেন বাঙালীর মত বোমা ছুঁড়তে পারে না।

অবোধবিহারী লাহোর ট্রেনিং কলেজের ছাত্র।

আমি আর অবোধ গিয়েছিলাম অ্যাক্‌শনে। কিন্তু বোমা ছোঁড়ার সুযোগ পাইনি। লরেন্স গর্ডনের বারে ঢুকতে পারিনি আমরা। গর্ডন বসে বসে মদ গিলছিল, তা কাচের জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম। শেষ পর্যন্ত একটা চান্স নিলাম আমরা। মদ্যপানের পর যে পথ দিয়ে ও বেরিয়ে আসবে সেইখানেই রেখে এলাম বোমাটা!

নিয়তিই বলতে হবে। গর্ডন বেরিয়ে আসার আগেই ও পথে গিয়েছিল একজন চাপরাশী। লাইব্রেরী রোড ধরে। বেচারা মারা পড়ল আমার বোমায়।

এ ঘটনা সতেরই মে উনিশ শ তেরর।

এর পরেই আমাকে নিয়ে দাদা কলকাতা চলে আসেন আগস্ট মাসে। দীর্ঘ ছুটি নিয়েছিলেন, তিনি অসুস্থতার অজুহাতে। ছুটি মঞ্জুর হতে অসুবিধা হয়নি। শুনেছি এর পিছনে ঐ আই. বি. দারোগা সুনীল ঘোষেরও হাত ছিল। দাদা চন্দননগর থেকে তাকে রিপোর্ট পাঠাবেন। তাই লম্বা ছুটি।

আমি ঐ সময় একবার পোড়াগাছায় যাই মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। ফিরে এসে দেখি ইতিমধ্যে এক কাণ্ড হয়েছে। দাদার বাঁ হাতের মধ্যমা আঙুলটায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। কী ব্যাপার? শুনলাম, বাদুড়বাগানের মেসে একদিন দাদা আর প্রতুল গাঙ্গুলীমশাই বসে কতকগুলো অস্ত্র পরীক্ষা করছিলেন। বীরেন চট্টোপাধ্যায় সেগুলি ঢাকা থেকে সদ্য সদ্য এনেছেন। দেখতে দেখতে কেমন করে জানি একটা লোডেড রিভলভার ফায়ার হয়ে যায়! দাদার হাতের মাঝের আঙুলটা উড়ে যায়। প্রচণ্ড রক্তপাত হতে থাকে। দাদা তৎক্ষণাৎ একটা বিছানার চাদর ছিঁড়ে আঙুলটা চাপা দিয়ে চলে আসেন ওঁদের রাজাবাজার কেন্দ্রে। সঙ্গে প্রতুল গঙ্গোপাধ্যায়। রাজাবাজার কেন্দ্রে তখন উপস্থিত ছিলেন নলিনীকিশোর গুহ। তিনি প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। সেই রাত্রে রাসুদা চন্দননগরে ফিরে গিয়েছিলেন।

ঐ সেপ্টেম্বর মাসেই দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটীতে রাসবিহারী মিলিত হয়েছিলেন বাঘা-যতীনের সঙ্গে। উপস্থিত ছিলেন, ওঁরা দুজন ছাড়া একমাত্র আমার আদিগুরু অমরেন্দ্রদা। এর আগেও 'শ্রমজীবী সমবায়ে' দিকপাল নেতাদের আলাপ পরিচয় হয়েছিল কিন্তু ঐ পঞ্চবটীতেই ভারতব্যাপী মহাবিপ্লবের কথা প্রথম খোলাখুলি আলোচনা হয়। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ ঐ যাকে তোমরা বল সিপাহী-বিদ্রোহ—সেই রকম সিঙাপুর থেকে কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত এক বৈপ্লবিক উত্থানের স্বপ্ন দেখেছিলেন ওঁরা দুজনই। বাঘা-যতীন রাসুদার চেয়ে বছর ছয়েকের বড় ছিলেন।

এ বছর মেদিনীপুরের বন্যার সময় সব কয়টি দল সেবাকার্যে ছুটে আসে। মেদিনীপুর ও বর্ধমানে সেবার বন্যার সুযোগে সব ক'জন নেতা কাছাকাছি চলে এসেছিলেন। সমাজ-সেবক হিসাবে ওখানে উপস্থিত ছিলেন—মাখনলাল সেন, অশ্বিনীলাল রায়, অমরেন্দ্রদা, বাঘা-যতীন, যাদুগোপাল, মতিলাল ইত্যাদি। বন্যাফেরত কলকাতায় এসে তাঁরা এক নেতৃত্বে আসার চেষ্টা করলেন। সতীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বরিশাল পার্টির নেতা তখন নরেন ঘোষ চৌধুরী,—ফরিদপুর গ্রুপের নিখিলরঞ্জন গুহরায়ের সঙ্গে তিনি ইতিমধ্যেই হাত মিলিয়েছেন। মৈমনসিং-এর সাধনা-সমাজের হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী এবং বগুড়ার যতীন রায় তখন এক নেতৃত্ব চাইছেন। নরেন্দ্র ভট্টাচার্য, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, যোগেন বসু, মনোরঞ্জন গুপ্ত ইত্যাদি নেতৃস্থানীয় সবাই চাইছেন এক নেতার অধীনে আসতে। অনতিবিলম্বে বাঙলার একছত্র নেতা যে বাঘাযতীনই হবেন এটা বোঝা যাচ্ছিল। পরে তিনিই তা হয়েছিলেন।

সেই বাঙলার শার্দুল বাঘা-যতীনের সঙ্গে মিলিত হলেন উত্তর-ভারতের মুকুটহীন সম্রাট রাসবিহারী, ঐ দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটীতে—গভীর রাত্রে।

বয়োজ্যেষ্ঠ যতীন্দ্রনাথ নাকি রাসবিহারীর কাঁধে একটা হাত রেখে প্রশ্ন করেছিলেন : ফোর্ট উইলিয়াম দখল করে নিতে পারবে রাসবিহারী?

তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিলেন রাসবিহারী : আলবৎ!

ওঁর তাচ্ছিল্যে যতীন্দ্রনাথ হেসে বলেছিলেন, কতজন কর্মী চাও?

চট্-জল্‌দি জবাব : দুজন!

বাঘা-যতীন বুঝে উঠতে পারেন না, এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে রাসবিহারী কেন রসিকতা করছেন।

রাসবিহারী তৎক্ষণাৎ বলেন, তারা যেন অনর্গল পুস্তু আর নেপালীভাষায় কথা বলতে পারে। কারণ গুর্মুখী আর উর্দুটা আমিই জানি।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল যতীন্দ্রনাথের : তার মানে রাইফেল নিয়ে বাইরে থেকে আক্রমণ করার কথা তুমি ভাবছ না?

—না! রাইফেল দিয়েই। তবে ভিতর থেকে নানাসাহেবের পথে। এ ছাড়া বিশটা রিভলভার, ত্রিশটা বোমা আর শতখানেক ছেলে নিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম দখল করা যায় না।

বাঘা-যতীন বলেছিলেন, যায়! আমার ছেলেরা দেখিয়ে দেবে, যে যায়! বিশটা রিভলভার নয়, রাসবিহারী—আমি জার্মানী থেকে এক জাহাজ রাইফেল আনবার ব্যবস্থা করেছি!

—ভেরি গুড! আপনি তাহলে বেঙ্গল-জোনের চার্জ নিন। আমি উত্তর খণ্ডের ব্যবস্থা করছি। আপনি একবার আসুন না উত্তর-ভারতে?

—যাব। বল কবে যাব?

—মাস দুয়েকের ভিতরই। আমি খবর দেব।

রাসবিহারী তখন উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছেন। সিঙাপুর থেকে কাবুল! বিরাট অভ্যুত্থানের যে স্বপ্ন তিনি দেখে এসেছেন আকৈশোর এবার তা বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে! নরেন ভট্টাচার্য বা মানবেন্দ্রের সঙ্গেও তাঁর আলাপ হয়েছে। জার্মানী থেকে এক জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র যদি সত্যই এসে পড়ে তা'হলে ইংরেজ মহাপ্রভুদের আর রক্ষা নেই। এবার মিলিটারি ব্যারাকে ব্যারাকে প্রচার কার্য চালাবেন। বিপ্লব শুরু হলেই যেন তাদের রাইফেলের মুখ ঘুরে যায়। নানাসাহেবের আমলে যেমনটি হয়েছিল!

দাদা এই সময় মতিলালদাকে একটা অদ্ভুত অনুরোধ করে বসেন। প্রকাশ, একটা কাজ করতে পার? তুমি ছদ্মবেশে একবার পণ্ডিচেরী চলে যাও। তাঁকে সব কথা খুলে বল। বলবে, তাঁর আশীর্বাদ ছাড়া আমরা এ-কাজে হাত দিতে সাহস পাই না। তাঁর অনুমতি আর আশীর্বাদ চাই।

মতিলাল বলেন, তিনি তো ভিন্ন পথের পথিক হয়ে গেছেন ভাই! তাঁকে আর কেন জড়ানো?

—না জড়াতে চাই না। আমি শুধু তাঁর moral support-টুকু চাইছি। এত বড় ব্যাপারে হাত দেবার আগে তাঁর আশীর্বাদ চাইছি। তিনি অবশ্য আমাকে চেনেন না; তা হোক, তবুও তুমি তাঁর আশীর্বাদ এনে দাও। আমার নাম করা অহেতুক। বাঘাদার কথা বল।

মতিলাল গিয়েছিলেন পণ্ডিচেরীতে। রুদ্ধদ্বার সাধনকক্ষে গুরুশিষ্যে কী কথা হয়েছিল কেউ জানে না। চন্দননগরে ফিরে এসে তিনি দাদাকে বললেন, রাসু, তিনি কিন্তু সব শুনে তোমাকে তিরস্কার করেছেন! বলেছেন, তুমি পাগল!

চমকে ওঠেন রাসবিহারী!

মতিলাল হাসতে হাসতে বলেন, তিনি আমাকে বলেছেন: পাগল ছেলেটা কি বলল? আমি তাকে চিনি না? তাকে বল, দিল্লীর দরবারে তান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে শ্মশানকালীর পূজা সে করেছে তাতেও আমার সমর্থন ছিল, বর্তমানে সে যে বারোয়ারি মাতৃপূজা করতে

চাইছে তাতেও আমার আশীর্বাদ আছে।

রাসবিহারী স্তম্ভিত হয়ে বললেন, দিল্লীর ব্যাপারটা যে আমার কাজ তা তুমি বলেছ?

—মোটেই না।

—তবে তিনি তা কেমন করে জানলেন?

—কারণ তিনি যে শ্রীঅরবিন্দ!

রাসবিহারী তাঁর উদ্দেশে যুক্তকর কপালে ঠেকান।

ডিসেম্বর মাসে বাঘা-যতীনকে নিয়ে দাদা গেলেন বেনারসে। আমিও ওঁদের সঙ্গে ফিরে গেলাম উত্তর-ভারতে। কাশীতে বছর চারেক আগে শচীনদা একটা সমিতি খোলেন, 'যুবক সমিতি'। তার কর্ণধার ছিলেন কুইন্‌স্ কলেজের ছাত্র শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, লাটুদা। কাশীর বিভিন্ন মহল্লায় সমিতির শাখা অফিস খোলা হয়। মদনপুরায় 'আদর্শ বিদ্যালয়' নামে একটা স্কুলও খোলা হয়। কাশীর নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, শেঠ দামোদর স্বরূপ, বীরেশ্বর গোস্বামী, বঙ্কিম সিংহ প্রভৃতি ছিলেন শচীনদার দলে। প্রতুল গাঙ্গুলী, অমরেন্দ্রদা প্রভৃতি এই কেন্দ্রগুলি দেখে এসে কলকাতায় রিপোর্ট করলেন—কাশীতে একটা শক্তিশালী দল গঠিত হয়েছে। এবার সরেজমিনে ঐ কেন্দ্রগুলিকে দেখিয়ে আনতে বাঘা-যতীনকে নিয়ে রাসুদা স্বয়ং চললেন কাশীতে। সঙ্গে হুঁকো-বরদার—পোড়াগাছার পোড়াকপালে এই বিশে।

এই যাত্রার কথাটা বিশেষ করে মনে আছে একটা কারণে। আমরা তিনজনে কাশী স্টেশনে না নেমে মোঘলসরাইতে নেমেছিলাম। সেখানে নৌকো নিয়ে গঙ্গা বেয়ে এসেছিলাম চৌষট্টিযোগিনী ঘাটে। বাঙালীটোলায় তখন আড্ডা ছিল শচীনদার। বোধকরি কাশী স্টেশনে টিকটিকির আধিক্য থাকাতেই এই ব্যবস্থা। ঐ নৌকাযোগে যাওয়ার পথে বাঘা-যতীনদার মুখে শুনেছিলাম এক বিচিত্র কাহিনী। ঐ প্রসঙ্গে মহাবিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রের এক অনুদ্‌ঘাটিত দিক আমার চোখের সামনে ফুটে উঠেছিল।

মোঘলসরাই থেকে একটা এক্কা নিয়ে আমরা চলে এলাম গঙ্গার ধারে। রামনগরের এক আঘাটায়। পিছল পাড় ভেঙে কর্তামশাই আর যতীনদা আগে আগে যাচ্ছেন, হুঁকো-বরদার চলেছে পিছন পিছন। আমার মাথায় গামছার পাগড়ি, তার উপর দুটি স্যুটকেস। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন যতীনদা পিছন ফিরে আমার টলটলায়মান অবস্থাটা দেখে বললেন, একটা স্যুটকেস আমাকে দাও।

কর্তামশাই বললেন, কিছু দরকার নেই যতীনদা, বিশে ঠিক পারবে।

নির্জন গঙ্গাতীরে আমরা তিনটি প্রাণী। ত্রিসীমানায় লোকজন নেই। যতীনদা হেসে বলে, রাসবিহারী, তুমি যতই 'বিশে বিশে' কর—ও যে সত্যই চাকর নয় তা কি আমি বুঝি না? এখানে তো কোন টিকটিকি নেই—ভদ্রলোকের ছেলেকে কেন আর মিছিমিছি কষ্ট দেওয়া?

জোর করে তিনি আমার মাথা থেকে একটা স্যুটকেস কেড়ে নিলেন। বললেন, তোমার নাম কি ভাই?

কর্তামশায়ের দিকে করুণভাবে তাকালাম।

রাসবিহারী গম্ভীরভাবে শুধু বলেন, বলতে পার!

—আজ্ঞে আমার নাম বসন্ত! শ্রীবসন্তকুমার বিশ্বাস। নদীয়ার পোড়াগাছায় বাড়ি।

কর্তামশাই যতীনদার অনুরোধে আমাকে আত্মপরিচয় দিতে অনুমতি দিলেন বটে, কিন্তু তাঁর গাম্ভীর্যে বোধ করি আহত হলেন যতীন্দ্রনাথ।

আর কোন কথা হল না। নদীর ধারে পৌঁছতেই আঘাটায় একটি মাঝি এগিয়ে এল। হিন্দুস্থানী। সেলাম করে বললে, ম্যায় ভি যাউঙ্গা ক্যা?

রাসবিহারী সংক্ষেপে বললেন, নেহী, ম্যায় খুদ লে যাউঙ্গা!

নৌকো সে ছেড়ে দিল আমাদের জিম্মায়। যতীনদা বসলেন পাটাতনে। কর্তামশাই বসলেন হাল ধরে। উত্তর বাহিনী গঙ্গায় আমি বসলাম দাঁড় নিয়ে।

ছপ্-ছপ্-ছপ্। স্রোতে আপনিই ভেসে চলেছে নৌকো। কর্তামশাই একটু পরে বলেন, আপনি হঠাৎ এমন চুপ করে গেলেন যে যতীনদা?

যতীন্দ্রনাথ বলেন, আমার কাছে বসন্তের পরিচয় দিতে তুমি কুণ্ঠিত হচ্ছিলে কেন রাসু?

কর্তামশাই হাসতে হাসতে বলেন, ওটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে দাদা। জনান্তিকে কখনও আমি ওকে 'বসন্ত' বলে ডাকিনি।

আমি প্রতিবাদ করি না! বলি না, একবার তিনি ভুল করে ঐ নামেই ডেকেছিলেন।

—কিন্তু কেন?—যতীনদা প্রশ্ন করেন।

—ঐ যে বললাম : অভ্যাস। কে কখন রাজসাক্ষী হয়ে যাবে কে জানে? পরস্পরের পরিচয় বিপ্লবীরা যত কম জানে ততই মঙ্গল। প্রাণ দিয়ে কানাই এই শিক্ষাই আমাদের দিয়ে গেছে।

যতীনদা প্রতিবাদ করেন : নরেন গোঁসাই একটা ব্যতিক্রম! অমন ঘটনা বিপ্লব-ইতিহাসে দ্বিতীয়বার ঘটেনি।

রাসবিহারী বলেন, ঘটেছে যতীনদা। আপনি ভুলে গেছেন। বীরেন দত্তগুপ্তের স্বীকারোক্তিতে আপনি মরতে বসেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের সর্বনাশ হতে বসেছিল।

কেমন যেন বেদনার্ত হয়ে ওঠেন যতীন্দ্রনাথ। দৃঢ়স্বরে বলেন, বীরেন আমার হাতে গড়া ছেলে! তাকে তোমরা চেন না।

রাসবিহারী বলেন, না, চিনি না। তাকে স্বচক্ষে দেখিনি। কিন্তু তার কীর্তি-কাহিনীর কথা জানি। নিঃসন্দেহে Biren was a traitor!

--Shut up—গর্জন করে উঠে দাঁড়ান যতীন্দ্রনাথ রুদ্রমূর্তিতে!

নৌকোটা প্রচণ্ডভাবে দুলে ওঠে। আমরা দুজনও। আমি স্তম্ভিত। রাসবিহারী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন যতীন্দ্রনাথের দিকে। ধীরে ধীরে বসে পড়েন যতীনদা। ঝুঁকে পড়ে এক-আঁজলা গঙ্গার জল নিয়ে মাথায়-মুখে ছিটিয়ে দেন। তারপর বিচিত্র হেসে দাদার দিকে ফিরে সংক্ষেপে শুধু বলেন, আয়াম সরি!

রাসবিহারী নির্বাক! নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে নৌকোটা। কিছু পরে যতীনদা পুনরায় বলেন, I owe you an explanation! রাসবিহারী, তোমাকে.... তোমাকে একটা কৈফিয়ত দেবার আছে আমার। না হলে তুমি একটা ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে যাবে।

এবারও দাদা কোন কথা বলেন না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে অপেক্ষা করেন। ধীরে ধীরে যতীনদা মেলে ধরেন ইতিহাসের এক অধ্যায়। সামশুল হত্যা কাহিনী—

আলিপুর বোমার মামলার পর যে-সব রাজকর্মচারী বিপ্লবীদের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল একে একে তাদের সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা করা হয়। প্রথম বলি—ইন্সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জি। মোকামাঘাট স্টেশনে সেই ধরতে গিয়েছিল শহীদ প্রফুল্ল চাকীকে। বাধ্য হয়ে প্রফুল্ল আত্মহত্যা করে। তার শেষ কথা ছিল : আপনি বাঙালী হয়ে বাঙালীর সর্বনাশ করলেন।

নন্দলাল নিশ্চয় হেসেছিল। এই সাফল্যের জন্য সরকার মজঃফরপুরের দরবারে নন্দলালকে পুরস্কার দিলেন এক হাজার টাকা। পুরস্কার প্রাপ্তির ঠিক ছয় মাস পরে কলকাতায়, সার্পেন্টাইন লেনে তাকে কুকুরের মত গুলি করে মারলেন শ্রীশচন্দ্র পাল, ওরফে নরেন ৯.১০. ১৯০৮ তারিখে।

দ্বিতীয় ঘটনা বলি, আলিপুর মামলার পাব্‌লিক প্রসিকিউটার। গাউন পরা পাব্‌লিক প্রসিকিউটারকে কোর্টের সামনেই হত্যা করল চারুচন্দ্র বসু। তার ডান হাতটা ছিল পঙ্গু। ঐ পঙ্গু ডান হাতে দড়ি দিয়ে পিস্তল বেঁধে চাদরের তলায় লুকিয়ে সে গিয়েছিল অ্যাক্‌শনে। বাঁ হাতে টিগার টেনে সে পি. পি. কে খতম করে। চারুচন্দ্র বসুর নামটা হয়তো আপনাদের অজানা। তবে ঐ পাব্‌লিক প্রসিকিউটারের নামে কলকাতা কর্পোরেশনের কল্যাণে স্বাধীন ভারতে একটি রাস্তা আছে বলে শুনেছি। ভবানীপুরে। ঘটনাটা ১০. ৩. ১৯০৯ তারিখের। ভবানীপুরে পদ্মপুকুরের পিছনে সেই রাস্তাটির পরিবর্তন করে তার নাম চারুচন্দ্র বসুর নামে রাখা হয়েছে। কর্পোরেশনের ওই অঞ্চলের কংগ্রেস কাউন্সিলার সুবিমল বসু আমাকে ১৯৯৯ সালে একথা বলিতে ছিলেন। নাম পরিবর্তনে তিনিই ছিলেন প্রস্তাবক। সুবিমল বলেছিলেন এই বইয়ের পূর্ববর্তী সংস্কারই তাঁর প্রেরণার উৎস। আমি কৃতার্থ।

এবার তৃতীয়টা বলি। সামশুল আলমের পালা। ধাপে ধাপে নজর উঠছে। ইন্সপেক্টর, পাব্‌লিক প্রসিকিউটার—এবার ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অফ পুলিস। ওপক্ষ এবার অত্যন্ত সতর্ক। সুতরাং খুঁজে বার করতে হবে অত্যন্ত দুঃসাহসী একটি নির্ভীক কর্মীকে। কে সে?

বাঘা-যতীন নিলেন তাঁকে খুঁজে বার করার দায়িত্ব! তাঁর সবার চেয়ে প্রিয় শিষ্য বীরেন দত্তগুপ্ত। আঠারো বছর বয়স তার। ঢাকায় বাড়ি। হীরের টুকরো ছেলে। যতীনদাকে সে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে।

যতীন্দ্রনাথ তাকে ডেকে বললেন, সামশুল আলমকে চিনিস?

—নাম শুনেছি। গানও শুনেছি তাঁর নামে। চিনি না।

আলিপুর বোমার মামলায় যখন সামশুল তদ্বির করতে আসত তখন তাকে দেখে বিপ্লবীরা গান জুড়ত—

"ওহে সামশুল,
তুমি সরকারের শ্যাম, আমাদের শূল
কবে ভিটেয় তোমার চরবে ঘুঘু
তুমি চোখে দেখবে সর্ষে ফুল।।"

যতীন্দ্রনাথ বললেন, ঠিক আছে, সতীশ দূর থেকে তোকে চিনিয়ে দেবে।

বীরেন প্রশ্ন করে, তিনি কী এমন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি যে, তাঁকে দেখতে যাব?

যতীন্দ্রনাথ নীরবে রিভলভার ছোঁড়ার একটা মুদ্রা করেন।

লাফিয়ে ওঠে বীরেন। উৎসাহের আতিশয্যে সে গুরুকে প্রণাম করে বসে।

যতীন্দ্রনাথ হাসেন। আজ ছয় মাস ধরে ছেলেটা তাঁর পিছন পিছন ঘ্যানঘ্যান করে

ঘুরছে। জুতসই একটা অ্যাক্‌শন করার চান্স তাকে দিতে হবে।

২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯১০। প্রকাশ্য দিবালোকে হাইকোর্টের প্রশস্ত বারান্দায় কাজ হাসিল করল বীরেন। সামশুল যখন সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন তখন উপর থেকে নেমে আসছে বীরেন। দুজনে মুখোমুখি দেখা। বীরেন বললে, আপনিই কি সামশুল আলম?

সামশুল বলেন, হ্যাঁ।

হাঁ-মুখটা তাঁর আর বন্ধ হয়নি। পরমুহূর্তেই গর্জে উঠল রিভলভার। এতদিনে সামশুল চোখে দেখলেন যোজন-বিস্তৃত সর্ষে ফুলের ক্ষেত।

চারদিক থেকে ছুটে এল রক্ষী। বীরেন ফায়ার করতে করতে ছুটছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বীরেনের, শেষ পর্যন্ত সে ধরা পড়ল গুলি ফুরিয়ে যাবার পর।

পুলিসকে সে বললে, আমি কোন কথা বলব না, তোমরা যা ইচ্ছে তা করতে পার। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাস। ভদ্রলোকের এক কথা। আমি কিছু বলব না। বীরেনকে দায়রায় সোপর্দ করলেন ম্যাজিস্ট্রেট। এবার হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিস বললেন, তুমি যদি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোন উকিল-ব্যারিস্টার না দাও তবে আমরাই তাঁকে নিয়োগ করব। সরকার নিয়োগ করলেন ব্যারিস্টার নিশীথ সেনকে। নিশীথ সেনকে বীরেন বললে, মাপ করবেন, আপনাকে আমি কিছু বলতে পারব না।

—কেন? আমি তো তোমার ব্যারিস্টার। বল, কেন এ কাজ করলে?

—গুরুর বারণ—সাফ জবাব বীরেনের।

—কে সেই গুরু?

—তাও বলব না; কারণ ঐ একই, গুরুর বারণ।

শেষ পর্যন্ত নিশীথ সেন আসামীকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলে আদালতে ঘোষণা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বীরেনের ফাঁসির হুকুম হল।

বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার শেষ ইচ্ছা কিছু আছে?

বীরেন বললে, আছে হুজুর। আমার শহীদ হবার সাধ আপনি পূর্ণ করেছেন। এবার 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করে দিন। মিষ্টিমুখ করিয়ে দিন।

—কী খাবে তুমি?

—কচুরি, সন্দেশ আর রসগোল্লা।

কী ডাকাবুকো ছেলেরে বাবা! ফাঁসি দিয়ে কি এদের দাবানো যাবে? ভাবছিলেন বিচারক স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্স। দুরন্ত কৌতূহল হয়েছিল তাঁর। নাটক কতদূর গড়ায় তিনি দেখতে চান। চাপরাসীকে বললেন, কচুরি, সন্দেশ আর রসগোল্লা কিনে আনতে। চাপরাসীর হাত থেকে ঠোঙাটা নিয়ে ফিরে আবার বলল, ধর্মাবতার! এঁকে একটু সরে দাঁড়াতে বলুন। উনি নজর দিচ্ছেন। শেষে ফাঁসির আগেই আমার পেট খারাপ করবে।

মাথা নিচু করে পুলিস অফিসার দূরে সরে যান। ঐ আঠারো বছরের তারুণ্যের কাছে উনি আজ নিঃশেষে হেরে গেছেন। বীরেনকে যখন পুলিস মাজায় দড়ি দিয়ে আদালত থেকে বার করে নিয়ে যাচ্ছে তখন আর তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। ভিড়ের মধ্য থেকে দাঁতে দাঁত দিয়ে বললেন—দেখব, যখন ফাঁসির দড়ি গলায় পরাবে তখন ঐ হাসি তোমার কোথায় থাকে!

কানে গেছে কথাটা। চট করে ঘুরে দাঁড়ায় বীরেন। বলে, এখনই নিমন্ত্রণ করে রাখছি!

আসবেন, স্বচক্ষে দেখে যাবেন! আমি চ্যালেঞ্জ রেখে গেলাম! ক্ষমতা থাকে তো কাঁদান আমাকে!

সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন দুঁধে দারোগা। আসলে তাও নয়। পুলিস জানত নাটের গুরু আছেন নেপথ্যে। তাঁকে ফাঁসানো গেল না, এ-দুঃখ ওদের থেকেই গেল। বীরেন যে মুখ খুলল না একেবারে। সব প্রশ্নের জবাব,—বলব না! গুরুর বারণ!

কে সেই গুরু?

অদ্ভুত এক চাল চাল্‌ল পুলিস! সেদিন রাত্রেই ওর সেল্-এ রাত কাটাতে এল আর একজন বিপ্লবী আসামী। বীরেন তাকে চেনে না। পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। ছেলেটি বল্‌লে, তার নাম সত্যেন রায়চৌধুরী। চিংড়িপোতা রেল স্টেশনে ডাকাতি-কেসে সে ধরা পড়েছে! এ কেসটার কথা জানা ছিল বীরেনের। যতীন্দ্রনাথের নির্দেশেই নরেন্দ্রনাথ (ভবিষ্যৎ এম. এন. রায়) ঐ ডাকাতি কেসে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ওদেরই দলের কাজ। ফলে দুজনে অচিরে বন্ধু হয়ে উঠল। সত্যেন অনেক খবর শোনাল তাকে—তার কিছু ওর জানা, কিছু অজানা। শেষে বললে, আমি শুধু আমার কথাই বলে যাচ্ছি ভাই। তোমার নামটা কি? তুমি কোন্ কেসে ধরা পড়েছ?

—সামশুল আলমকে শূলে চড়িয়েছি!

চম্‌কে ওঠে সত্যেন। বলে, ও তুমিই সেই বীরেন দত্ত। নরেন গোঁসাই দি সেকেণ্ড।

আকাশ থেকে পড়ল বীরেন : মানে?

—ও কিছু নয়! —ছেলেটি গুম হয়ে যায়।

বীরেনও চেপে ধরল ওকে। অনেক সাধ্য-সাধনা। কিন্তু কিছুতেই ও মুখ খোলে না। শেষে সে প্রতিপ্রশ্ন করে, আচ্ছা একটা কথা। তোমার ডিফেন্স কাউন্সিলার কেউ ছিল না কেন?

—আমি নিজেই প্রত্যাখ্যান করেছিলাম! সরকার ব্যারিস্টার নিশীথ সেনকে—

বাধা দিয়ে সত্যেন বলে, জানি। কিন্তু আমাদের পার্টি কোন ব্যারিস্টার পাঠাল না কেন?

থতমত খেয়ে যায় বীরেন। তাই তো! যতীন্দ্রনাথের নির্দেশ নিয়ে কোন উকিল-ব্যারিস্টার তো তার সঙ্গে জেলে দেখা করতে আসেনি। এ ছেলেটি অনেক পরে ধরা পড়েছে। এ কিছু জানে? বীরেন প্রশ্ন করে, আমার অ্যাক্‌শনের পরে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

বিচিত্র হাসলে সত্যেন। বললে, হয়েছে! আমরা তাঁকে চেপে ধরেছিলাম তোমার ডিফেন্সের ব্যবস্থা করতে। তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না।

—কেন?

ছেলেটি চুপ করে থাকে। তারপর বলে, সত্যিই তুমি কিছু জান না?

—কী জানি না?

—না ভাই, আমি নিজ মুখে বল্‌ব না। কাল তোমাকে দেখাব।

—কী দেখাবে?

পরদিন বিকেলে ভিজিটিং আওয়ার্সে ওরা যখন গরাদ দেওয়া পাঁচিলের সামনে এসে দাঁড়ালো তখন আর একটি ছেলের সঙ্গে কথা বলছিল সত্যেন। বীরেন রোজই বাইরে আসে, সাক্ষাৎকারের সময়;—কিন্তু দলের কেউই আজ পর্যন্ত তার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। বীরেন ভাবে, ফাঁসির আগে কি যতীনদা একবারও আসবেন না দেখা করতে? গুরু-শিষ্যে

শেষ দেখা হবে না?

সাক্ষাৎকারের সময় শেষ হল। ওরা ফিরে এল সেল-এ। সত্যেন ওকে লুকিয়ে একখণ্ড ইস্তাহার দিল। ওদের বিপ্লবী-দলের গোপন ইস্তাহার। বীরেন তার প্রতিটি সংখ্যা পড়ে। তারই সাম্প্রতিকতম একটি সংখ্যা। ও ধরা পড়ার পর যেটা ছাপা হয়েছে। সল্পালোকিত কন্‌ডেম্‌ড সেল্‌-এ উপরের ঘুলঘুলি দিয়ে অস্তমান সূর্যের যে আলোর রশ্মি আসছিল তাতে কাগজখানা মেলে বীরেন রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়তে থাকে।

পড়তে পড়তে একেবারে পাথর হয়ে গেল বীরেন।

কাগজে বার হয়েছে যতীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত এক স্টেটমেন্ট "—কেন আমরা বীরেনের ডিফেন্স দিই নাই।" —একটা কৈফিয়ত।

যতীন্দ্রনাথ বলেছেন, বীরেন আসলে সামশুলকে হত্যা করেনি। আসল হত্যাকারী সতীশ সরকার। বীরেন শুধু দূর থেকে সামশুলকে চিনিয়ে দিয়েছিল। ভুল করে পুলিস বীরেনকে ধরেছে। ভুল করে নয়, এটা পুলিসের একটা চাল। আসলে বীরেন ছিল পুলিসেরই এজেন্ট। সমস্ত কেসটাই সাজানো। উদ্দেশ্য—সমস্ত দলটাকে ধরা। বীরেনের ফাঁসির হুকুম হলেও দেখা যাবে আপিলে সে খালাস পেয়েছে। এজন্য আমরা কোন ডিফেন্সের ব্যবস্থা করিনি। আসামীর সঙ্গে জেলে কেউ যেন দেখা না করতে যায়, এ বিষয়েও নির্দেশ ছিল।

স্তম্ভিত হয়ে গেল বীরেন। সত্যই তো! কেউ ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে না।

তিল তিল করে ষড়যন্ত্রজাল বিস্তারিত হতে থাকে। মানসিক যন্ত্রণায় বীরেন প্রায় পাগল হয়ে গেল। দুদিন পরে পুলিস অফিসার এসে বললে, হ্যাঁ, মশাই, আপনি যে এমন বর্ণচোরা আম, তা তো জানতাম না। আপনার পিটিশান গভর্নরের কাছে চলে গেছে।

—পিটিশান? কিসের পিটিশান?

—মার্সি পিটিশান। জীবনভিক্ষা করে যে আবেদন করেছেন—

গর্জন করে ওঠে বীরেন—মিথ্যা কথা! আমি কোন দরখাস্ত করিনি।

হাসতে হাসতে পুলিস অফিসার বলেন, আপনি বৃথাই অভিনয় করছেন ভাই, আমি টপ-সিক্রেটটা জানি। আই. জি. স্বয়ং আমাকে বলেছেন।

—কী? কী বলেছেন তিনি?

—আপনি পুলিসের স্পাই! এতো টপ্‌-লেভেলে ব্যাপারটা রাখা হয়েছিল এতদিন যে, আমরা পর্যন্ত জানতাম না। ফাঁসি আপনার হবে না! আপীলে ছাড়া পাবেন!

দিশেহারা হয়ে পড়েন বীরেন। কেমন করে সে বোঝাবে যে, সে স্পাই নয়! কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। উপায় বাত্‌লে দেয় ঐ পুলিস অফিসারই। বলে, দেখুন মশাই, মরতে আপনাকে হবেই। আমরা ছেড়ে দিলেও বিপ্লবীরা আপনাকে গুলি করে মারবে—ঐ নরেন গোঁসাই-এর মত। তার চেয়ে এক কাজ করুন না—বারীন্দ্রনাথ যা করেছিলেন, তাই করে যান। চরম শাস্তি নিশ্চিত বুঝতে পেরে তিনি দুনিয়াকে জানিয়ে গিয়েছেন—তিনি কী করতে চেয়েছিলেন, কী করেছেন আর কী করতে পারেন নি। আপনিও তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে যান। দুনিয়া জানুক—বীরেন দত্তগুপ্ত ট্রেইটার ছিল না! সে সাচ্চা বিপ্লবী!

আলোকের সন্ধান পান বীরেন। বলে, বলব! সব কথা খুলে বলব! পাঠান কোন ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটকে—ফাঁসির আসামী স্বীকারোক্তি করবে!

তাই তো চায় পুলিশ অফিসার। ব্যবস্থা হয়ে গেল মুহূর্তে।

আগেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ। তিনি ছিলেন হাওড়া জেলে। পুলিসবেষ্টিত হয়ে তাঁকে নিয়ে আসা হল প্রেসিডেন্সি জেলে, যেখানে বীরেন বন্দী ছিল। বীরেনকে দিয়ে সনাক্তকরণটা ওরা করিয়ে রাখতে চায়। জেলখানার প্রাঙ্গণে দাঁড়ানো এক সারি লোকের মধ্যে অনায়াসে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বীরেন চীৎকার করে ওঠে—ঐ আমার গুরু, যতীন্দ্রনাথ! ওঁরই হুকুমে আমি গিয়েছিলাম সামশুল আলমকে হত্যা করতে। আমিই তা স্বহস্তে করেছি। সতীশ সরকার নয়, আমি...আমি...আমি!

ক্রোধে-অভিমানে ক্ষোভে আগ্নেয়গিরির মত আঠারো বছরের তরুণটি তখন থরথর করে কাঁপছে। হঠাৎ তার নজর পড়ল গুরুর দিকে! তুষারশুভ্র হিমাচলের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন যতীন্দ্রনাথ, তার গুরু—যেন মহাগুরু দ্রোণ গ্রহণ করছেন অর্জুনের মৃত্যুবান! বীরেন যতীন্দ্রনাথের চোখে কখনও জল দেখেনি। আজ দেখল—হিমালয়ের চূড়া থেকে নেমে আসে হিমপ্রবাহ।

কেমন যেন থমকে গেল বীরেন। কই, উনি তো কিছু বলছেন না! তিরস্কার করছেন না।

পুলিশ অফিসার বললে, সনাক্তকরণ হয়ে গেছে। আপনি চলে আসুন। চীৎকার করে উঠল বীরেন, না! আমাদের ফয়সালাটা বাকি আছে।

তা জানত পুলিস অফিসার। নাটকের কৌতুককর দৃশ্যটা দেখবার লোভও তার ছিল। আপত্তি করল না সে। অপেক্ষা করল।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল বীরেন। বললে, কেন অমন কথা লিখলেন দাদা? আমি...আমি ট্রেইটার?

—কে বলেছে তুই ট্রেইটার! তুই শহীদ রে!

—আমি জানি না ভাবছেন? আমি সব জানি।

—কী জানিস তুই?

পকেট থেকে বার করে সে দেখায় গোপন ইস্তাহারটা।

দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলেন যতীন্দ্রনাথ। বেদনার্ত হয়ে উঠল তাঁর মুখ। একবার চোখ তুলে দেখলেন পুলিস অফিসারটির দিকে। তার মুখে তখন পৈশাচিক হাসি! ফিরলেন বীরেনের দিকে। বললেন, পাগল ছেলে! তুই বুঝতে পারলি না—এটা পুলিসের কারসাজি? পুলিস -প্রেসে এটা নকল ছাপা! আমি তোর নামে এসব কথা বলতে পারি? আমি? যতীন মুখুজ্জে!

পুরো একটি মিনিট স্তম্ভিত হয়ে রইল বীরেন্দ্র। একবার যতীন্দ্রনাথ, একবার পুলিস অফিসারটির দিকে তাকালো। তিল তিল করে বুঝে ফেলল নারকীয় ষড়যন্ত্রটা! কিন্তু এ কী করে ফেলেছে সে। সে যে ধরিয়ে দিল তার গুরুকে! সনাক্তকরণ পর্যন্ত করে বসে আছে! থরথর করে কেঁপে উঠল তার সারা দেহ! আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল গুরুর চরণে। জেলখানার শক্ত পাথরে লেগে তার কপালটা গেল কেটে। রক্ত আর অশ্রুর গঙ্গা-যমুনায় যতীন্দ্রনাথের চরণ দুটি গেল ধুয়ে।

—এ আমি কি করলাম! এ আমি কি করলাম!

—যতীন্দ্রনাথের পায়ে মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে পাগল ছেলেটা বলে চলেছে।

মণিকর্ণিকার ঘাট পার হয়ে গেল। নৌকোর গলুইয়ে বসে গল্প শোনাচ্ছিলেন যতীন্দ্রনাথ।

শুধু বিস্ময়ে শুনছি আমরা দুজন। বলতে বলতে গলা ধরে এল বজ্রকঠিন মহাবিপ্লবীর। বললেন, তোমাকে কী বলব রাসবিহারী, দু'হাতে ওর মুখখানা তুলে ধরলাম। ফুলের মত মুখখানা তখন অশ্রু আর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ওর সেই তাজা খুনে লালে-লাল কপালে চুমো খেয়ে বললাম, বীরেন, কাঁদিস নে—কাঁদতে নেই! ক্ষুদিরাম কাঁদেনি, কানাই কাঁদেনি, চারু বোস কাঁদেনি—আর আমার হাতে গড়া বীরেন দত্ত কাঁদতে কাঁদতে ফাঁসির মঞ্চে এগিয়ে যাবে? এ কী হয় রে? আজ বাদে কাল যে তুই শহীদ হবি! সবাই যে দেখবে—বাঘা-যতীনের শিষ্য কেমন ভাবে মাথা সোজা রেখে মরতে গেল!

পুলিস অফিসার ব্যঙ্গভাবে বললে, উনি চ্যালেঞ্জ থ্রো করেছিলেন! বলেছিলেন—'পারেন তো আমাকে কাঁদান!'

এতবড় আঘাতেও চেতনা ফিরে এল না বীরেনের। তার কানেই গেল না এ বিদ্রূপ। ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল তার। অস্ফুটে বললে ঃ কিন্তু...কিন্তু...আমি যে ট্রেইটার হয়ে গেলাম দাদা!

আমি ওর রক্তরাঙা কপালে হাত বুলিয়ে বললাম, তোর রক্ত হাতে নিয়ে শপথ করছি বীরেন! বাঘা-যতীন বেঁচে থাকতে কেউ তোকে ট্রেইটার বলে পার পাবে না!

—একটু ঝুঁকে গঙ্গার জলে হাতটা ডুবিয়ে দিলেন। যেন এখনও ওঁর হাতে লেগে আছে বীরেনের রক্ত। মাথায় মুখে সেই ভিজা হাতটা বুলিয়ে বললেন, তাই বলছিলাম, রাসবিহারী: I owe you an explanation! কিছু মনে কর না ভাই। আমি তখন সংযম হারিয়ে ফেলেছিলাম!

পরে শুনেছিলাম, বীরেনের ঐ স্বীকারোক্তি শাপে-বর হয়েছিল। যতীন্দ্রনাথের শেষ পর্যন্ত শাস্তি হয়নি। পরদিনই বীরেনের ফাঁসি হয়ে যায়। তাকে ক্রস্-এগ্‌জামিন করা যায়নি বলে আইনত : যতীন্দ্রনাথের অপরাধ প্রমাণিত হয়নি। তবু বীরেনের স্বীকারোক্তির ফলে যতীন্দ্রনাথের চাকরি যায়। তাতে ভালই হয়েছিল—যতীন্দ্রনাথ সর্বক্ষণের জন্য বিপ্লবের কাজে মন দেবার সময় পান। বীরেন্দ্রনাথের জবানবন্দীতে অরবিন্দের নামও উল্লেখ করা হয়েছিল। রাতারাতি ভগ্নী নিবেদিতা এই গোপন খবরটি অরবিন্দকে জানিয়ে দেন। সেই রাত্রেই অরবিন্দ রওনা হন তাঁর নিরুদ্দেশ যাত্রায়—প্রথমে চন্দননগরে এসে আত্মগোপন করেন মতিলালের বাড়িতে, তারপর পণ্ডিচেরীতে।

প্রায় মাস দুয়েক পরের কথা। তারিখটা মনে আছে। বিশে ফেব্রুয়ারী, উনিশ শ'চৌদ্দ। আমি তখন লাহোরে। বালমুকুন্দজীর বাসায়। রামরাখী তখনও গ্রামে। দাদা কদিন আগে দেরাদুন থেকে লাহোরে এসে আমাদের ওখানে উঠেছেন! সারাদিন তিনি কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ান; রাতে কোনদিন ফেরেন, কোনদিন নয়! সেদিন সন্ধ্যায় দাদা ফিরে এসে বললেন, দুঃসংবাদ আছে! এইমাত্র শুনে এলাম দীননাথকে গ্রেপ্তার করেছে।

বালমুকুন্দ ঘনিয়ে এসে বলে, দীননাথ? কার কাছে শুনলেন?

—ডি. এ. ভি. কলেজের ছাত্রাবাসে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার দলের একটি ছাত্র আমাকে জানালো। ব্যাপারটা ভাল লাগছে না। আমি এখনই একবার দেরাদুন যাচ্ছি। দেখি, ওখানে কোন খবর পাই কি না!

—দেরাদুনে কার কাছে খবর পাবেন আশা করছেন?

—ঐ সুনীল ঘোষকে একবার ট্যাপ করি। হাজার হোক, আমি তো ওর এজেন্ট।

সন্ধ্যার ট্রেনেই দাদা চলে গেলেন। আমরা দুশ্চিন্তায় ডুবে রইলাম।

পরদিন মধ্যরাত্রি। আমরা দুজনেই অঘোরে ঘুমোচ্ছি। হঠাৎ মনে হল, সদর দরজায় কে যেন সন্তর্পণে টোকা দিচ্ছে। খুলে দিতেই দেখি—দাদা।

—কী ব্যাপার? এতরাত্রে—

দাদা নীরবে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। বালমুকুন্দও ইতিমধ্যে উঠে এসেছে। দাদা অন্ধকারেই জানালার পর্দাগুলো টেনে দিলেন; তারপর লণ্ঠনের আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে মেঝেতে বসে পড়েন। স্যুটকেস খুলে জামা-কাপড় বারা করতে করতে বলেন, এখনই পালাতে হবে, কুইক!

আমার দিকে বার করে দিলেন কিছু পোশাক। সেই লছমিবাই-এর ঘাগরা, চোলি, পরচুল আর প্রসাধন-সামগ্রী। নিজেও বার করলেন তাঁর সাজ। সর্দার হরবল্লালের পোশাক পরিচ্ছদ।

বালমুকুন্দ তাগাদা দেয়, হঠাৎ কী এমন হল যে...

মাথায় পাগড়ি বাঁধতে বাঁধতে দাদা বলেন, অবোধবিহারী দিল্লীতে ধরা পড়েছে। তোমার নাম-ঠিকানা এখনও পুলিসে পায়নি বোধহয়, তা হোক, তুমিও আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে চলে যাও।

—অ.বোধবিহারী!

—হ্যাঁ। তাছাড়া বিশুদাসের নামেও ওয়ারেন্ট আছে! ওর আসল নাম-ঠিকানা অবশ্য পুলিসে জানে না, কিন্তু ওর ফটো পুলিসের কাছে আছে।

আমি অবাক হয়ে বলি, আমার ফটো! ওরা কেমন করে পেল?

দাদা তখন স্পিরিট-গাম লাগিয়ে চাপদাড়ি বানাচ্ছেন। দুটি হাত দ্রুতচ্ছন্দে তাঁর মুখখানাকে একেবারে বদলে দিচ্ছে। কাজ করতে করতে বলেন, পরে বিস্তারিত বলব। বালমুকুন্দ! কুইক। কী কী সঙ্গে নেবে নিয়ে নাও। রাত পোহালেই এখানে পুলিস এসে যেতে পারে!

ঘরে তালা দিয়ে আমরা যখন পথে বের হলাম তখনও পূব-আকাশটা ফর্সা হতে শুরু করেনি। বেশ শীত আছে শেষ রাত্রে। আমরা জোরে জোরে হাঁটতে হাঁটতে লাহোর রেলস্টেশনে চলে এলাম। সর্দার হরবল্লালজী, তাঁর সহধর্মিণী-লছমীবাঈ আর বালমুকুন্দ। সে ছিল স্যুটেড-বুটেড। এক জোড়া গোঁফেই তার চেহারাটা পালটে গেছে।

স্টেশনে জনমানব নেই। এখানে-ওখানে দেহাতী কুলীর দল কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে ঘুমোচ্ছে। প্রথম ট্রেন সকাল পাঁচটায়। একটা গুডস-ট্রেন শুধু গজরাচ্ছে। আর মাস্টারমশাইয়ের ঘরে শোনা যাচ্ছে টরে-টক্কা। মাঝে মাঝে চোঙায় মুখ দিয়ে কানে যন্ত্র লাগিয়ে তিনি অগ্রবর্তী স্টেশনের কোন নিশাচরের সঙ্গে আপ-ডাউন ভাষায় আলাপচারিতে রত। আচমকা একটা কুকুর ডেকে উঠল আমাদের দেখে।

তিনজনে সরে এলাম প্ল্যাটফর্মের একান্তে। অন্ধকারে সিমেন্ট বাঁধানো একটা বেঞ্চিতে বসলাম আমরা তিনজন। ট্রেন আসতে এখনও দু-ঘন্টা দেরি। দাদা এতক্ষণে অবকাশ পেলেন। ইতিমধ্যে কী ঘটেছে সবিস্তারে শোনালেন আমাদের। আজই সন্ধ্যারাত্রের ঘটনা :

লাহোর থেকে দেরাদুনে ফিরে রাসবিহারী দেখেন তাঁর সদর দরজায় দুটি পুলিস বসে আছে। অভ্যাসবশেই তাঁর বাঁ হাতটা চলে গেল পকেটে। পালানোর সুযোগ নেই। সেপাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, ক্যা বাৎ?

সেপাইটা সেলাম করে বললে, বড়সাহেব বলেছেন আপনি ফিরলেই খবর দিতে।

রাসবিহারী তালা খুলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলেন, ঠিক আছে, খবর দাও!

সাইকেল চেপে পুলিসটি চলে যেতেই উনি দ্রুতগতিতে মালপত্র স্যুটকেসে ভরে নিতে

থাকেন। চারটে রিভলভার, ছদ্মবেশের সাজসরঞ্জাম, বিপ্লবীদের দলিলপত্র। ওঁর ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয় বলছিল, এ বাসা ছাড়তে হবে। বড়সাহেব, অর্থাৎ ডি. এস. পি, সি. আই. ডি. সুনীল ঘোষ ওঁকে খুঁজছে। কেন খুঁজছে জানা নেই। কিন্তু জরুরী কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়! দীননাথ ধরা পড়েছে। দিল্লীর কোন খবর নেই—ওদিকে বেনারসে শচীন সান্যালের কাছ থেকেও ইতিমধ্যে কোন খবর পাননি—

অনতিবিলম্বেই সুনীল ঘোষ সাইকেলে চেপে এসে পড়ল।

—কী ব্যাপার স্যার! আমার বিরহে নাকি আপনি হাঁপিয়ে উঠেছেন?

সুনীল ঘোষের ভাবভঙ্গিতে রসিকতার বাষ্পমাত্র নেই। ঘনিয়ে এসে বসে একটা চেয়ারে। বলে, বসুন আপনি। জরুরী কথা আছে।

রাসবিহারী বসেন না। আবার বাঁ হাতটা যায় ওভারকোটের পকেটে!

—কী ব্যাপার? কিছু একটা হয়েছে মনে হচ্ছে?

সুনীল ঘোষ পকেট থেকে একখণ্ড ফটো বার করে বলে, একে চেনেন?

বসন্ত বিশ্বাসের ফটো! তীক্ষ্ণধী রাসবিহারী মুহূর্ত-মধ্যে বুঝতে পারে—অস্বীকার করাটা হবে চরম নির্বুদ্ধিতা। দেরাদুনের অনেকেই ঐ ফটোটাকে সনাক্ত করবে রাসবিহারীর গৃহভৃত্য হিসাবে। চট্ করে বলেন, বিশুর ফটো কোথায় পেলেন?

—এ তাহলে বিশু দাস? আপনার চাকর? আপনি সনাক্ত করছেন!

—নিঃসন্দেহে; কেন বলুন তো?

—লোকটা এখন কোথায়?

—তা তো জানি না। ছোকরার হাত-দোষ ছিল। পয়সা সরাতো, তাই মাইনে দিয়ে বিদায় করে দিয়েছি। দেশে ফিরে গেছে।

—দেশ কোথায়?

—ঠিকানাটা জানি না। শুনেছি ঢাকায়, বিক্রমপুরে।

একটু চিন্তা করে সুনীল ঘোষ বলে, লোকটাকে আপনি চন্দননগর থেকে নিয়ে এসেছিলেন?

—হ্যাঁ, কেন?

—আপনার ভাই ঐ শ্রীশ ঘোষ ওকে দিয়েছিল আপনার হাতে?

রাসবিহারী বুঝতে পারেন না কোন সূত্রে এত খবর যোগাড় করেছে সুনীল। অন্ধকারে হাতড়াতে থাকেন। কিন্তু জবাব দিতে দেরি হলেই লোকটার সন্দেহ হবে! অম্লানবদনে বলেন, হ্যাঁ, শিরেই দিয়েছিল। কিন্তু কেন বলুন তো?

সুনীল দারোগা বলে ঃ আপনি মূর্খ রাসবিহারীবাবু! আপনার মাথায় গোবর। আপনি বুঝতে পারলেন না—আপনি যেমন আমাদের এজেন্ট হিসাবে ঐ চন্দননগর ঘাঁটির খবর সরবরাহ করছেন, আর ঐ শ্রীশ ঘোষও তার এজেন্ট হিসাবে এই বিশেকে লাগিয়েছিল আপনার পিছনে—টিকটিকি হিসাবে।

একেবারে থ হয়ে গেলেন রাসবিহারী! বিস্ময়ের অভিব্যক্তির একটি নিখুঁত অভিনয়। তাঁর সেই ব্যাদিতবদন মূর্তি দেখে ভুঁড়ি দুলিয়ে ঠা ঠা করে হাসল সুনীল দারোগা। এতক্ষণে আশ্বস্ত হয়ে ওভারকোটের পকেট থেকে রাসবিহারী হাতটা বার করেন। বসে পড়েন ওর মুখোমুখি।

সুনীল বলে, এই বিশু দাস গর্ডন হত্যা মামলার একজন অংশীদার! বিশ্বাস করতে পারেন?

—য্যাঃ! কী বলছেন মাইরি! ছোকরার হাত-দোষ ছিল, তা বলে—

—আজ্ঞে হ্যাঁ! আপনার মাথায় নিরেট গোবর! আমরা নিশ্চিত খবর পেয়েছি ঐ বিশু দাস আর অবোধবিহারী বলে আর একজন ছোকরা সেদিন ঐ লরেন্স গার্ডেনে গিয়েছিল গর্ডনকে হত্যা করতে।

—অবোধবিহারী! সেটা আবার কে?—নির্লিপ্ত প্রশ্ন। বোকার মত।

কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সুনীল দারোগা বলে, আচ্ছা 'চুচেন্দ্রনাথ দত্ত' নামটা কখনও শুনেছেন চন্দননগরের আড্ডায়?

—চুচেন্দ্রনাথ দত্ত? য্যাঃ! কোন ভদ্রলোকের অমন অদ্ভুত নাম হয়?

—না। ওটা ছদ্মনাম। লোকটা এই এরিয়ায় আছে। তার অ্যাক্টিভিটি লাহোর থেকে বেনারসের মধ্যে। বাঙালী। হাইট—এই আপনারই মত। স্বাস্থ্যবান। বাঁ হাতের আঙুলটা নেই। সেই হচ্ছে মূল গায়েন।

রিফ্লেক্স অ্যাক্শান। রাসবিহারীর বাঁ হাতটা চলে যায় পকেটে! কী আশ্চর্য! এত মেলামেশাতেও তাহলে সুনীল দারোগা লক্ষ্য করেনি ঐ নির্ভুল আইডেন্টিফিকেশন মার্ক! উনি তখন মনে মনে হিসাব করছেন। তাঁর চুচেন্দ্রনাথ দত্ত নামটা কে কে জানে। কে খবর দিচ্ছে? নিঃসন্দেহে বিভীষণ ঢুকে পড়েছে তাঁর দলে। কিন্তু কে সে? মুখে বলেন, বসুন, একটু চায়ের জল বসিয়ে দিই। এক কাপ চা না খেলে বুদ্ধিটা খুলছে না! 'চুচেন্দ্রনাথ দত্ত' নামটা শোনা শোনা লাগছে। দাঁড়ান মনে করি। কোথায় শুনেছি!

সুনীল ঘোষ দুটো সিগারেট বার করে। একটা বাড়িয়ে ধরে রাসবিহারীর দিকে। বলে, ভাবুন, ভাল করে ভাবুন। বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দিন।

ডান হাতে সেটা নিয়ে রাসবিহারী পাশের ঘরে চলে যান। একহাতে দেশলাই জ্বালা যায় না।

চায়ের জলটা চাপিয়ে রাসবিহারী যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর দু-হাতে দস্তানা পরা। ইতিমধ্যে চিন্তা করে নিয়েছেন লাহোরে দীননাথ ধরা পড়েছে। লোকটার কথাবার্তা কেমন সন্দেহজনক ছিল। তাছাড়া ওঁর চুচেন্দ্রনাথ নামটাই জানে দীননাথ। ফিরে এসে বলেন, মনে পড়েছে। লোকটাকে লাহোরে দেখেছি! নামটা মনে আসছে না...দীনদয়াল?

—না। দীনদয়াল নয়, দীননাথ। সেও এখন আণ্ডার অ্যারেস্ট। সেই রাজসাক্ষী হবে এ কেসে। কিন্তু চুচেন্দ্রনাথের ঠিকানা সে জানে না। দেখলে সনাক্ত করতে পারবে বলছে।

সব পরিষ্কার হয়ে গেল। দীননাথ। শেষ পর্যন্ত দীননাথ এ-ভাবে বিশ্বাসভঙ্গ করল? হায় ভগবান! মীর্জাফরের দল কী রক্তবীজের বংশ?

সুনীল ঘোষ চলে যেতেই উনি স্যুটকেসটা উঠিয়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ লাহোরে ফিরে আসেন। সবাইকে সতর্ক করে দিতে হবে। সঙ্ঘে বিভীষণ প্রবেশ করেছে। দীননাথ অনেক-অনেককে চেনে—অবোধবিহারী, আমীরচাঁদ, বালমুকুন্দ, রামশরণ এদের নাম ঠিকানা জানে। শচীন, বিভূতি হালদার, বিনায়ক কাপ্‌লে, নলিনী মুখুজ্জে, বসন্ত বিশ্বাস, মন্মথ বিশ্বাস, দামোদর স্বরূপ, রাসবিহারী—এঁদেরকেও চেনে, নাম জানে না। মানে শুধু ছদ্মনামই জানে। দেখলে চাক্ষুষ চিনবে। সুতরাং বিপদের গুরুত্ব ঐ প্রথমোক্তদেরই বেশি। স্থির করলেন, প্রথমেই যাবেন লাহোর—বালমুকুন্দ আর বিশ্বনাথকে পাঠাবেন আণ্ডারগ্রাউণ্ডে। তারপর দিল্লী—অবোধবিহারী আর আমীরচাঁদজীকে সরাতে হবে।

সকাল হয়ে আসছে। মেল ট্রেনের আসার সময় হল। ক্রমশ লোকজন আসছে স্টেশনে। দাদা কাউন্টার থেকে দু'খানি ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কিনে আনলেন। আমার আর তাঁর। বালমুকুন্দ যাবে উল্টোদিকে। একা। আমাদের টিকিট দিল্লীর। মুক্ত পৃথিবীতে বালমুকুন্দের সঙ্গে আমার সেই শেষ সাক্ষাৎ! তারপর তাকে দেখি—দিল্লী বিচারালয়ে, কাঠগড়ায়।

একেবারে ফাঁকা একটা ফার্স্ট ক্লাসে উঠে পড়লাম আমরা। সকালের আলো ফুটে উঠছে। বালমুকুন্দের আর দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। লাহোরে অনেকেই তাকে চেনে। দাদার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে, আমার হাতটা নেড়ে দিয়ে বালমুকুন্দ বিদায় নিল। ফাঁকা কামরা দেখে প্রাণটা ঠাণ্ডা হল। কিন্তু কী বরাত। ট্রেন ছাড়বার পূর্ব-মুহূর্তে তক্‌মা আঁটা চাপরাসীর দল ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল দুজন অফিসারকে। একজন পুলিসের কোন বড় সাহেব—ডি. এস্. পি. বোধহয়; দ্বিতীয়জন মিলিটারি অফিসার। পাঞ্জাবী। র‍্যাঙ্কে মেজর। আমি ঘোমটা টেনে মুখ ঘুরিয়ে বসলাম। দাদা কিন্তু নির্বিকার। হাসতে হাসতে আলাপ জমালেন ঐ দুজনের সঙ্গে। পুলিস অফিসারটি বাঙালী, কিন্তু সর্দার হরবল্লালের সঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন হিন্দুস্থানীতে। আর দেশওয়ালী ভাই ঐ মেজর সাহেবের সঙ্গে দাদা অনর্গল কথা বলছিলেন চোস্ত গুর্মুখী পাঞ্জাবীতে। গ্রন্থ-সাহেব থেকে উদ্ধৃতি, পাঞ্জাবী চারণ-কবিদের দোঁহা, মায় পাঞ্জাবী কাঁচা খিস্তি! সেগুলির মর্মার্থ আমার মগজে ঢোকেনি। একবার দাদার কী একটা অশ্লীল রসিকতায় যখন মেজর-সাহেব ডাব্বা-বিদারী অট্টহাস্য করে উঠলেন তখন ডি. এস. পি. ভদ্রলোক কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করেন, ঐ পাঞ্জাবী লব্‌জ্‌টার অর্থ কি?

মেজর-সাহেব দাদার দিকে ফিরে একটি চোখ বন্ধ করে বলেন, এ রসিকতা নেহাত পাঞ্জাবী ঘরানার! বিজাতীয়ের কাছে এর রহস্য উদঘাটন করা মানা। কী বলেন ভাইসাব?

দাদাও তাঁর একটি চোখ বন্ধ করে ওঁর কর্ণমূলে বলেন, আমার বিবি কিন্তু বিজাতীয়া নন। তিনি সব বুঝতে পারছেন।

কিছু না বুঝেও আমাকে কপট মুখ-ঝাম্‌টা দিতে হল। মেজর-সাহেব উৎফুল্ল হয়ে সিগার ধরালেন। দাদাকেও দিলেন। দাদা খাল্‌সা। সিগারেট মানা। হাত জোড় করে প্রত্যাখ্যান করলেন।

দিল্লিতে নেমেছি। গেটে টিকিটটা জমা দিতে যাব—একজন লোক দেখে দাদা থমকে দাঁড়ালেন। আড়ালে সরে গিয়ে কী দু-একটা কথোপকথন হল। ফিরে এলেন আমার কাছে। বললেন, ঐ লোকটা আমীরচাঁদজীর ভৃত্য। আমীরচাঁদজী অ্যারেস্ট হয়েছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ ভৃত্যটি আপনাকে চেনে?

—হরবল্লালাল হিসাবে। এদিকে এস। দিল্লিতে নামা যাবে না। অনেকেই এখানে সর্দার হরবল্লালালকে আমীরচাঁদজীর বন্ধু হিসাবে চেনে।

আমার হাত ধরে উনি চলে এলেন ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে। ঢুকতে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়েন। দিল্লি প্ল্যাটফর্মে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিংরুমের বাইরের দেওয়ালে সাঁটা আছে একটি ফটো আর বিজ্ঞপ্তি। ফটোটা রাসবিহারী বসুর। তলায় পুরস্কারের অঙ্কটা। জীবিত বা মৃত ঐ রাসবিহারীর সন্ধান চাইছে ভারত সরকার। চুচেন্দ্রনাথ নয়, সতীন্দ্রচন্দ্র নয়, মানিকলাল নয়—রাসবিহারী বসুকে এতদিনে খুঁজছে ভারত সরকার। ছবির তলায় তাঁর একটা বর্ণনা :

"বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। রঙটা ফর্সা। বেশ লম্বা। অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান। চোখ বড়বড়।

বাঙালী। পাঞ্জাবী পাঠান অথবা অন্যান্য ছদ্মবেশ ধারণে অতিশয় দক্ষ। বাম হস্তের মাঝের আঙুলটা নাই।"

আমি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছি। দাদা বিবৃতিটা পড়ছেন। হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে ওঠে : লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু!

দাদা চট করে ঘুরে দাঁড়ান। সেই মেজর-সাহেব। তিনিও আশ্রয় নিয়েছেন ঐ ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিংরুমে। দাদা ঘুরে দাঁড়াতেই হেসে বলেন, ছাপোষা মানুষ আপনি। বিবি নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। ঐ লাখ টাকার স্বপ্নটা আর নাই বা দেখলেন সর্দারজী! ওদের পকেটে সব সময় এইটা থাকে—নিজের মাজায় হাত দিয়ে রিভলভারটা দেখান!

দাদা হাসলেন : করেক্ট! য়ু আর পার্ফেক্টলি করেক্ট!

আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। কানে কানে বললেন, আমরা সোজা চন্দননগর যাব!

চমকে উঠি। বলি, কী বলছেন, ওরা যে জানে, চন্দননগরেই আপনার বাড়ি!

—তাই ওরা সারা দুনিয়া খুঁজবে, একমাত্র আমার বাড়িটা ছাড়া। আমার নামটা যখন জানাজানি হয়ে গেছে তখন ওরা স্বপ্নেও আশা করবে না—আমি চন্দননগর যেতে পারি।

চন্দননগরে এসে পেলাম আর একটা মর্মান্তিক আঘাত। অমরেন্দ্রদার কাছে শুনলাম ঃ পোড়াগাছায় মতিলাল বিশ্বাস মারা গেছেন। আমার বাবা! প্রায় মাসখানেক আগে। আর মাত্র চারদিন পরে, ছাব্বিশ তারিখে তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধ। আজ এই মাসখানেক ধরে ওরা আমার সন্ধান করছে, কোথাও কোন খোঁজ না পেয়ে স্থির হয়েছে আমার ছোট ভাই কামাখ্যা আদ্যশ্রাদ্ধ করবে। মায়ের কথা মনে পড়ল। চোখ বুঝলেই তাঁকে দেখতে পাই—লালপাড় শাড়ি, কপালে সিঁদুরের বড় টিপ, হাতে রুলি আর শাঁখা। সেই মাকে থান-কাপড় পরা অবস্থায় চিন্তাই করতে পারলাম না। কামাখ্যা বাচ্চা ছেলে, বছর পনের বয়স। দাদাকে বললাম, আমি বাড়ি যাব!

দাদা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, পাগলামি করিস্‌নি ভাই। তোর নামে যে বডি-ওয়ারেন্ট আছে!

—না! বিশু দাসের নামে ওয়ারেন্ট আছে। তার আসল নাম-ঠিকানা কেউ জানে না। কোথায় লাহোরের লরেন্স গার্ডেন আর কোথায় নদীয়ার পোড়াগাছা! শুধু একটা দিনের জন্য ছুটি দিন দাদা। শ্রাদ্ধটা সেরেই পালিয়ে আসব। কামাখ্যা একেবারে ছেলেমানুষ—সে পারবে কেন? আর তাছাড়া উপযুক্ত বড় ছেলে বর্তমান থাকতে বাবাইবা কেন...

বড় বড় জলের ফোঁটা ঝরে পড়ল আমার চোখ থেকে।

অমরদা বলেন, যাক্ না একটি দিনের জন্য বৈ তো নয়!

নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত দাদা অনুমতি দিলেন। মাত্র এক রাতের জন্য। জুতো খুলে ফেল্‌লাম। দাদা বাজার থেকে কাচা কিনে আনলেন। খালি গায়ে, খালি পায়ে তাই পরে রওনা দিলাম।

চন্দননগর থেকে গঙ্গা পার হয়ে নৈহাটি। সেখান থেকে ট্রেন ধরে কেষ্টনগর। পোড়াগাছায় পৌঁছলাম শ্রাদ্ধের দিন সকালে। আগের দিন ঘাট কামান হয়েছে, আমার সে সুযোগ হয়নি। এক মাথা রুক্ষ চুল, খালি গা খালি পা, খালি গায়ে একটা চাদর। বাড়ির সামনে মাঠে এ একটা সামিয়ানা খাটানো। গাঁয়ের অনেকেই রয়েছেন। কামাখ্যা বোধহয় শ্রাদ্ধে বসতে যাচ্ছে। হঠাৎ আমার আবির্ভাবে সবাই হকচকিয়ে গেল। প্রথম দেখতে পেয়েছিল কুমি, আমার

ছোট বোন। চীৎকার করে উঠল সে, ওমা—কে এসেছে দেখ!

তারপরেই তার আর্তনাদ : দাদা, তুমি কী দেখতে এলে!

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন আমার মা—থান কাপড় পরা! তিনিও আর্তনাদ করে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। সবাই ছুটে এল আমার কাছে।

আশ্চর্য! আমার চোখে জল এল না। আমি বিস্ফারিত নেত্রে দেখছিলাম শ্রাদ্ধ বাসরে উপস্থিত ধুতি-পাঞ্জাবী পরা একজন ভদ্রলোককে! পকেট থেকে তিনি সদ্য বার করছেন একটা লোডেড রিভলভার। আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন। আমার বিশেষ পরিচিত তিনি। দেরাদুনের ডি. এস. পি. সুনীলচন্দ্র ঘোষ। ডি. এস. পি., ডি. আই. বি.!

—সো দ্যাটস্ দ্যাট! বিশু দাস ইসুক্যালটু বসন্ত বিশ্বাস! এ্যাঁ!

মায়ের বাহুবেষ্টনী থেকে নিজেকে মুক্ত করে বললাম, একটা দিন আমাকে সময় দিন স্যার! বাবার শ্রাদ্ধটা করতে দিন আমাকে। আপনার পায়ে পড়ি।

অম্লানবদনে উনি বললেন, কী দরকার? ও তোমার ভাই কামাখ্যাই পারবে। কিছুদিন বাদেই তো ওকে আবার তোমার জন্য পিণ্ডি মাখতে হবে, আজ অভ্যাসটা হয়ে থাক না!

মা আর কুসমি এ-কথায় বিহ্বল হয়ে তাকায়। তারা তখনও জানে না—আমি বিপ্লবী, আমি শহীদ হতে চলেছি।

কামাখ্যা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল আমাকে। দারোগার নির্দেশে দুজন ছদ্মবেশী পুলিস এগিয়ে এল। আমার হাতে পরিয়ে দিল হ্যাণ্ডকাফ।

ধুলো পায়েই ফিরে চললাম। মাকে শেষ প্রণামটা আর করা হল না। অশৌচান্ত হয়নি যে আমার! বাড়িতে ঢুকতে পর্যন্ত দিল না ওরা।

এতক্ষণে মা সব বুঝতে পেরেছেন। একটা মর্মান্তিক জান্তব আর্তনাদ। আছাড় খেয়ে পড়লেন তিনি। সংজ্ঞা হারিয়েছেন সদ্যবিধবা! জানি না কখন জ্ঞান হয়েছিল তাঁর!

শেষ হয়ে গেল আমার আত্মকথন। বিচার শুরু হল দিল্লিতে, ষোলই মার্চ। আমীরচাঁদ, অবোধবিহারী আর বালমুকুন্দের সঙ্গে। দাদাকে ওরা ধরতে পারেনি এটুকুই সান্ত্বনা। দীননাথ রাজসাক্ষী হওয়ায় ছাড়া পায়। আমাদের চারজনের ফাঁসি হবে আম্বালা জেলে—এগারই মে উনিশ শ'পনেরয়। এখনও দাদা পলাতক।

রাখী-বহিন এসেছিল জেলে, আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। কাঁদেনি সে! এক ফোঁটা চোখের জল ফেলেনি! আশ্চর্য! তখনও তার মুখে ঐ এক বুলি, ইংরেজ সরকার তো তুচ্ছ—পৃথিবীতে এমন শক্তি নেই যে ওকে বালমুকুন্দের বুক থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে!

ছেলেমানুষ! একেবারে ছেলেমানুষ! শুধু ছেলেমানুষ নয় মূর্খ! উন্মাদ। একই দিনে ফাঁসি যাব নাহলে বালমুকুন্দের ফাঁসির পরে এসে দেখতাম তখন সে কী বলে!

দাদার জন্যই তার এতবড় সর্বনাশ! তবু তিলমাত্র অভিমান নেই সেজন্য। বলত, উনি তো দেওতা!

সে নাকি তার জীবনে এমন উদাত্ত, এমন মহান, এমন দেবদুর্লভ চরিত্রের মানুষ, এমন...

সুনীলচন্দ্র ঘোষের জবানবন্দী

...বল, বল, থামলে কেন সোনার চাঁদ? এমন বদমায়েস, এমন বিচ্ছু, এমন ধড়িবাজস্য ধড়িবাজ ঘড়িয়ালস্য ঘড়িয়াল, দুনিয়ায় দুটো পয়দা হয়নি। লোকটা ধনে-প্রাণে আমাকে শেষ করতে চেয়েছিল—ধন আর মানটা গেছে, প্রাণটা নিয়ে সট্‌কেছি কোনমতে।

মি লর্ড! আমি জানি, কেন এই ওয়ান ম্যান-এন্‌কোয়ারি কমিশনে আমাকে সাক্ষী দিতে ডাকা হয়েছে। আমি শুনেছি, উনিশ শ'পঁয়তাল্লিশ সালের একুশে জানুয়ারী অন্তিম-শয়নে সকলকলাপারঙ্গম ঘড়িয়াল-সম্রাট একটি আবেদন করেছিলেন। বলেছিলেন : ভারতবর্ষ পাঁচ বছরের মধ্যে স্বাধীন হবে। সেটা দেখে যাওয়ার সৌভাগ্য হবে না। ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের কাছে আমার অন্তিম অনুরোধ : আমার চিতাভস্ম যেন স্বাধীন ভারতের গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হয়!

অনারেবল জাস্টিস্ মিস্টার পাঠক! আপনি আজ এই দাবীর যৌক্তিকতা বিচার করতে বসেছেন।

মি লর্ড! আমার দৃঢ় অভিমত : ও কথায় কান দেবেন না। কেন, তাই বলছি। যুক্তি-তর্ক দিয়ে বুঝিয়ে দেব। আজ্ঞে হ্যাঁ—'যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না।' একমাত্র 'ইতিগজ'-র একটি ব্যতিক্রম আমার নামের একটি অক্ষর। একটিমাত্র অক্ষর শুধু বদল করেছি আমার নামের। আমি আজও পেনশন পাই, আমার নাতি-নাতনিরা আজও আমার কীর্তিকাহিনী সবটা জানে না। তাদের মধ্যে জনসঙ্ঘ আছে, শিবসেনা আছে, সি. পি. এম, মায় নক্‌শাল পর্যন্ত আছে। ওদের বিশ্বাস নেই হুজুর! তাই এই নলচের একটু আড়াল দিয়েছি। বাদবাকি যা বলব তা নিয্যস্ হক কথা।

ঘড়িয়ালটার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ দেরাদুনের সেই প্রতিবাদ সভায়। পূর্বদিন দিল্লিতে লাটবাহাদুরের উপর বোমা ঝেড়ে ঘড়িয়ালমশাই রাতারাতি ফিরে এসেছিলেন দেরাদুনে। পরের দিন মিটিং-এর পর আলাপ করলুম। শুনলুম, ওর বাড়ি চন্দননগর। বিদ্যুৎচমকের মত বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। চন্দননগর হচ্ছে বিপ্লবীদের ঘাঁটি। অরবিন্দ—ঐ যাকে আপনারা বলেন ঋষি শ্রীঅরবিন্দ, সেও আসলে একটা ...যাক্‌গে, মরুগ্‌গে, মি লর্ড! শুনেছি এখন নাকি অনেক সাহেব-সুবো তাঁর শিষ্য হয়েছে। সাহেবদের চটাতে নেই। বলছিলাম কি—ঐ অরবিন্দ প্রথম লুকিয়েছিলেন চন্দননগরে। কানাই ওখানকার কেউটে! আর ধড়িবাজ-শিরোমণি শ্রীশ ও-পাড়ারই বিচ্ছু। ভাবলুম ঐ রাসবিহারীটাকে টিকটিকি লাগালে কেমন হয়? টোপ ফেললুম একটা। ওমা, কপাৎ করে গিলে ফেলল! তারপর কী বলব মশাই—সত্যি কথাই বলি—পুরো দেড়টা বছর আমাকে বাঁদর নাচ নাচিয়েছে। কত বিচিত্র খবর এনে দিয়েছে আমাকে, ওর নির্দেশে কত দৌড়াদৌড়ি করেছি!

কিন্তু আমিও দুঁদে দারোগা। বসন্ত বিশ্বাসের ফটোটা যে হ্যারিসন রোডের 'শ্রমজীবী সমবায়ে' তোলা, তা ওকে বলিনি। বললে ও ঠিক বুঝতে পারত—পোড়াগাছার মুখপোড়াটাকে

আমরা চিহ্নিত করেছি। তাহলে বাপের শ্রাদ্ধ-বাসরে ব্যাটাকে অমন হাতে-নাতে ধরতে পারতুম না।

নেহাত বরাত মশাই—বাপদাদাদের সুকৃতি। না হলে আমার মত দুঁদে দারোগার হাত ফসকে অমনভাবে পালাতে পারে? একবার নয়, বার-বার! পয়েন্ট-ব্ল্যাংক ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম—'চুচেন্দ্রেনাথ দত্ত' নামে কাউকে চেনেন? বাঙালী, হাইট এই আপনারই মত।

লোকটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আমতা-আমতা করে বললে, চুচেন্দ্রনাথ কখনও কোন ভদ্রলোকের নাম হয়?

ঈস্। তখনই যদি সন্দেহ হত! বাছাধনকে হাতে-নাতে ধরতুম। তাহলে ডিমোশন নয়, প্রমোশন হত আমার। পুলিস কমিশনার হয়ে রিটায়ার করতুম। তার উপর লাখ টাকার পুরস্কার। দুর্ভাগ্য আমার! শিকার ফসকে গেল।

ঐ কি একবার? আরও দু-বার আমার হাত ফসকে ঘড়িয়ালটা পালিয়েছে! একবার বাঙালীটোলায়—কাশীতে। সমস্ত মহল্লাটা আমরা ঘিরে ফেলেছি। নিশ্চিত খবর পেয়েছি—এই মহল্লার মধ্যে আছে রাসবিহারী বোস। সূচ গলতে পারে না সেই বেষ্টনী ভেদ করে। আর ব্যাটা পালিয়ে গেল মড়া সেজে। হিন্দুস্থানীদের মড়া! খাটিয়ায় নয়, মাদুর দিয়ে জড়ানো শুয়োরের মত একটি মাত্র বাঁশ থেকে ঝোলানো। দুই ব্যাটা মেড়ো 'রাম নাম সৎ হ্যায়' বলতে বলতে নাকের উপর দিয়ে ড্যাং-ডেঙিয়ে বেরিয়ে গেল মশাই। আমার আবার বদ অভ্যাস মড়া দেখলেই হাত তুলে নমস্কার করি! তা কে জানবে বলুন—রামনামও ওঁদের পাল্লায় পড়ে স্রেফ্ ঝুট হ্যায়!

আর একবার! সেবার আরও কেলেচ্ছা। সেটা অমৃতসরে। এবার মহল্লা নয়, একটি মাত্র বাড়ি! ইনফর্মার নিশ্চিত খবর দিয়েছে—সে রাসবিহারীকে ঐ বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে। বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছি মধ্যরাত্রে। সেবার ব্যাটা মেথর সেজে পালালো! অমৃতসরে খাটা-পায়খানা! কে বিশ্বাস করবে বলুন? ভদ্রলোকের ছেলে তুই—বিশিষ্ট কায়স্থ-বংশের সন্তান! কপ্‌নিসার উলঙ্গ দেহে সাতজনের 'ইয়ে' ভর্তি মাটির চ্যাঙাড়ি মাথায় করে ঐ পায়খানার সুড়ঙ্গ পথ থেকে বের হয়ে পালালি! লজ্জা-ঘৃণা-ভয় কিছুই কি নেই গা? সর্বাঙ্গে বিষ্ঠা! পুলিস দেখে ব্যাটা আবার হাত তুলে সেলাম করছে। গন্ধে চর্তুদিক ম-ম করছে! আমার স্পষ্ট মনে আছে, বেটাকে ধমক দিয়েছিলুম, চ্যাঙাড়ি উল্টে ফেল না মানিক! বিদায় হও।

যেন ভালুকে শাঁকালু খাচ্ছে। একসার সাদা দাঁত বার করে হাসলে মিশ কালো ম্যাথরটা! খোদায় মালুম, সারা গায়ে সে কী মেখেছিল। রাসবিহারী দিব্যি ফর্সা অথচ জমাদারটা ছিল হাকুচ কালো।

আপনারা হাসছেন? হাসুন! নিষ্যস হক কথা বলব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। কিন্তু মনে করবেন না সে শুধু আমার চোখেই এভাবে ধুলো দিয়েছিল। তা-বড় তা-বড় অনেকেই এই বহুরূপীটিকে চিনতে পারেননি! অনেককেই সে বাঁদর-নাচ নাচিয়েছে! স্বয়ং লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁর আত্মজীবনীতে কি লিখেছিলেন জানেন? তাঁকেও ঐ ঘড়িয়ালটা 'ইয়ে'-নাচ নাচিয়েছিল! "My Indian Years–1910-1916"-গ্রন্থে স্মৃতিচারণরত হার্ডিঞ্জ স্বয়ং লিখেছেন : "At Dehra Dun when driving a car from the station to my bungalow, I passed an Indian standing in front of the gate of his house with several others,

all of whom were very demonstrative in their salaams. On my inquiring...I was told that the principal Indian there had presided two days before at a public meeting at Dehra Dun and had proposed and carried a vote of condolence with me on account of the attack on my life. It was proved later that it was this identical Indian who threw the bomb at me."

["দেরাদুনে আমি যখন স্টেশন থেকে আমার বাঙলার দিকে যাচ্ছিলাম তখন রাস্তার ধারে একটি বাড়ির সম্মুখে কয়েকজন ভারতীয়কে দাঁড়িয়ে থাকতে লক্ষ্য করলাম। তাদের সেলাম ছিল আভূমিনত। খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলাম ঐ সেলামকারীদের মুখপাত্র ছোকরাটি দুদিন আগে দেরাদুনে একটি জনসভায় আমার প্রতি বোমাবর্ষণের তীব্র নিন্দা করে এবং এ-বিষয়ে সভায় একটি প্রস্তাবও পাশ করিয়ে নেয়। দীর্ঘদিন পরে প্রমাণিত হয়েছিল ঐ ছেলেটিই আমাকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েছিল।"]

এই ঘটনা দিল্লিতে বোমা বর্ষণের অব্যবহিত পরে। অসুস্থ বড়লাট-বাহাদুরকে দিল্লি থেকে দেরাদুনে নিয়ে আসা হয়। দেরাদুন স্বাস্থ্যকর জায়গা। সার্কিট-হাউসে ছিলেন তিনি। চারদিকে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা ছিল। আই. বি. ডিপার্টমেন্ট থেকে আমি প্রহরায় নিযুক্ত ছিলুম—কিন্তু ভিতরে ঢুকতে পেতুম না আমি। বাঙালী বলে নয়, ডি. এস. পি. র‍্যাঙ্ক পর্যন্ত কাউকে ভিতরে ঢোকার অনুমতিপত্র দেওয়া হত না। অথচ আমি স্বচক্ষে দেখেছি রাসবিহারী বসু অনায়াসে ভিতরে ঢুকছে! সে পুলিসবিভাগের এতই নেক-নজরে ছিল। তাহলে আমার আর কী দোষ বলুন? আমি তো চুনোপুঁটি।

আর কী শেয়ানা দেখুন! যে মুহূর্তে জানা গেল—সতীন্দ্রচন্দ্র ওরফে চূচেন্দ্রনাথ হচ্ছে ফটকগোড়ার রাসবিহারী বসু, অমনি ব্যাটা পালিয়ে গেল ফটকগোড়ায়। কোন্ ভদ্রলোক এমন কাণ্ডটা করে? আমরা কেমন করে আন্দাজ করব বলুন—সারা ভারত যে এতদিন দাবড়ে বেড়াচ্ছিল সে বেটাচ্ছেলে তার নাম জানাজানি হয়ে যাবার পর নিজের বাড়িতে লুকিয়ে বসে থাকবে। তবু দুঁদে দারোগা আমি—ঠিক খবর পেয়ে গেলুম। ধরতে গেলুম ওকে। আমার গোপন খবরের কথাটা উপরমহলে বলতেই ওঁরা হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। আমাকে বড় কর্তারা বললেন—তোমাকে যেতে হবে না। তা-বড় তা-বড় মহারথীরা স্বয়ং যাবেন। বেশ, তাই যাও! দেখি তোমাদের দৌড়টা।

কে গেলেন জানেন? মিস্টার ক্লীভল্যাণ্ড তখন ছিলেন ভারত সরকারের ডাইরেক্টার জেনারেল অব ক্রিমিনাল ইন্টেলিজেন্স। তাঁর নির্দেশে মিস্টার ডেনহ্যাম আর চার্লস টেগার্ট গেলেন আসামীকে রাতারাতি পাকড়াতে, ফরাসী চন্দননগরের কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমতি আনিয়ে। আমি সঙ্গে ছিলুম। আমাকে ওঁরা দয়া করে সঙ্গে নিয়েছিলেন সনাক্ত করানোর জন্য। না হলে এই রাঘববোয়াল গেঁথে তোলার ব্যাপারে আমার মত চুনোপুঁটিকে ওঁরা দলে নিতেন না। একসঙ্গে তিনটা বাড়িতে 'রেড' হল। ফটকগোড়া রাসবিহারীর বাড়ি, বোড়াইচণ্ডীতলায় মতিলাল রায়ের বাড়ি আর হাটখোলায় নরেন বাঁড়ুয্যের বাড়ি। তোশক-বালিশের শিমুল তুলো পর্যন্ত বার করে ফেললুম মশাই—কিন্তু রাসবিহারীর টিকিটির সন্ধান পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

আজ্ঞে হ্যাঁ,—টিকিটি! পরে জানা গেছে, ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণের বেশে তিনি টিকিধারী হয়েই বিরাজ করছিলেন চন্দননগরে। সে রাত্রে তিনি ছিলেন ঐ বাড়িতেই—বাগানের এক

আমগাছের মগডালে। জানা গেছে, মগডালে বসে বার্ডস্‌আই-ভিয়ুতে তিনি সমস্ত তদন্ত কার্যটা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন! তারিখটা আটই মার্চ—মানে বসন্ত বিশ্বাস ধরা পড়ার দশ দিন পরে। ঘড়িয়ালটা যে ঐ বাড়িতেই ছিল তার প্রমাণ আপনারা আজও দেখতে পাবেন লালবাজারের রেকর্ড-রুমে :—"He (Rash Behari) was present at home on this night of 8.3. 1914 when his house was searched by Mr. Denham & Mr. Tegart, at Chandannagore, and he actually watched the search from behind a mango tree in his garden close by".–Weekly Report of the Bengal Intelligence Branch, Dated July 29, 1914.

পরদিন টেগার্ট আর ডেনহ্যাম-সাহেব রিপোর্ট দাখিল করলেন: "নিঃসন্দেহে রাসবিহারী চন্দননগরে নাই। উত্তর-ভারতে তাহার তল্লাসী কর!"

এই নগণ্য ঘোষের-পোর ধারণা কিন্তু অন্যরকম। সে জানত, ঘড়িয়ালটা চন্দননগরেই ছিল আরও কয়েকমাস। প্রথমে নিজের বাড়িতে তারপর বোড়াইচণ্ডীতলায় এবং শেষ পর্যন্ত নরেন বাঁড়ুয্যের তদারকিতে দীনবন্ধু—ঐ যাকে ওরা বলত ছোড়দা—হাটখোলায় একটা বাড়ি-ভাড়া করে এক ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণকে লুকিয়ে রেখেছিল। সেই হচ্ছে আমাদের ঘড়িয়াল-সম্রাট! কিন্তু গরিবের কথা আর কে শুনছে বলুন? আমার ইনফর্মারি বাজে কথা বলার লোক নন—স্বয়ং রায়সাহেব অটলবিহারী সরকার! ক্রিমিনাল ল-ইয়ার! তাছাড়াও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিচ্ছি :

ঐ বাড়ি সার্চ করার একমাস পরে কোন এক "আপনারই অযোগ্য সন্তান" চন্দননগর থেকে চিঠি লিখেছিল তার বাপকে। চিঠিখানি ৯. ৪. ১৯১৪ তারিখে সিমলাতে তার বাবা বিনোদবিহারী বসু-মশাই পেয়েছিলেন। চিঠিখানি আজও আছে লালবাজারের রেকর্ড-রুমে:

"শতকোটি প্রণামান্তে নিবেদন, আপনি ইতিমধ্যে নিশ্চয় শুনিয়াছেন যে, আমি সম্প্রতি ভীষণ বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। পরমেশ্বর জানেন যে, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ; তবু গ্রহের ফেরে আমি দিল্লির ব্যাপারে লোকের চোখে একজন অভিযুক্ত। সম্ভবতঃ আপনাকে এই আমার শেষ পত্র। কিন্তু আমি এই বিশ্বাস লইয়া শেষপত্র লিখিতেছি যে আপনি আমাকে অন্যায়কারী অথবা দোষী ভাবিবেন না। ঈশ্বরের নামে শপথ লইয়া বলিতেছি আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। সে যাহাই হউক—এ আমার গ্রহের ফের। আমি কি করিতে পারি? ভাগ্যকে কে প্রতিহত করিতে পারে? তদুপরি সর্বশক্তিমান সরকার বাহাদুর যখন আমার বিপক্ষে তখন বিচারালয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার আশা নাই। ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে। আমি শুধু ভাবি বজ্র যেদিন আমার মস্তকে নামিবে সেদিন আপনি এই বৃদ্ধ বয়সে কেমন করিয়া তাহা সহ্য করিবেন! একটা কথা : উকিলের পিছনে সেদিন অযথা অর্থব্যয় করিবেন না। একমাত্র জগদীশ্বর ভিন্ন কেহই আমাকে সরকারের রুদ্ররোষ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। সুতরাং তাঁহার হস্তেই আমাকে সমর্পণ করুন।"

ওরে আমার ননীর গোপাল! ভাজা মাছখানাও উল্‌টে খেতে শেখনি?

যেদিন ঐ ভালমানুষের-পো তার বাপকে চিঠি লেখে তার মাস চারেক পরে রডা-কোম্পানীর অস্ত্র-শস্ত্র লুঠ হয়ে গেল। আর এক ভালোমানুষের-পো ঐ হাবু—শ্রীশ মিত্তির, দিনে দুপুরে নির্দোষ ডাকাতি করলেন। তার গোটাচারেক রিভলভার পকেটস্থ করে আমাদের ননীর গোপাল এবার বাবা বিশ্বনাথের চরণে শরণ নিলেন।

একটি বছর তিনি ঐ বিশ্বনাথের চরণ দুটি জড়িয়ে পড়েছিলেন কাশীতে, অথচ আমরা বিন্দু-বিসর্গও টের পাইনি। মদনপুরা, দেবনাথপুরা, খালিসপুরা, হরিশ্চন্দ্র ঘাট, মিছরি পোকরার গলি—কোন্ বাসাবাড়িতে কখন যে গুরু-মহারাজ ভক্তদের সাধন-ভজনে দীক্ষা দিতেন তা আমরা জানতে পারিনি। বাবার চ্যালা-চামুণ্ডা-ভক্ত জুটেছিল অনেকগুলি। শচীন সান্যাল, নলিনী মুখুজ্জে, নরেন বাঁড়ুয্যে, প্রিয়নাথ ভট্চার্যি, বিভূতি হালদার আশুতোষ রায় আর ঐ বিশে শয়তানের দাদা বিধু, ওঁরফে পোড়াগাছার দু-নম্বর পোড়া কপালে,—মন্মথ বিশ্বাস! গুরুভাইরা সব মেস করে থাকতেন। কেউ ছাত্র, কেউ মাস্টার, কেউ চাকরি করেন, কেউ ব্যবসা, কেউ বা বেকার আত্মীয়। মেসের ঠাকুর ছিলেন এক ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ—যাঁর মাথার দাম লাখ টাকা! তিনিই ওদের রেঁধে খাওয়াতেন বলে শুনেছি। আজও ভাবি, মিছরি পোকরার বাড়িতে যে বেড়ালটা ছিল—তার নিশ্চয় পোয়াবারো। কারণ—আহা এসব ভদ্রসন্তান তো ভাজা মাছের একটা দিকই খেতেন, উল্টো দিকটা নিশ্চয় খেত বেড়ালে! এখানেই নভেম্বরের আঠারো তারিখে কলকাতা থেকে আনা একটি কালীমায়ের প্রসাদী মোয়া পরখ করবার সময় সেটা ফেটে যায়। আবার এখান থেকেই ঐ ঘড়িয়াল-সম্রাট কলকাতার অমৃতবাজার পত্রিকায় বেনামী প্রবন্ধ ছাড়েন ঃ Repeal of the Arms Act। সেটা ছাপাও হয়েছিল। বুঝুন কাণ্ড!

থাক ওসব কথা। আপনাদের দৃঢ়মূল ধারণা তো এসব কথা বলে আমি বদলাতে পারব না। শুধু রামরাখী আর বিশু দাস নয়, আপনারাও বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে বসে আছেন ঃ লোকটা ছিল মহান, উদার, চরিত্রবান ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার মত চুনোপুঁটির কথা, আপনাদের কানে যাবে কেন? এবার তাই খোলাখুলি বলছি মশাই—ভদ্রলোকের চরিত্রদোষও ছিল। পরস্ত্রীর সঙ্গে তার উপপতি হিসাবে একাদিক্রমে সে সতের দিন একবার লাহোরে ছিল। শুধু দিন নয়, রাত্রিবাস! ইয়েস স্যার! এক ঘরে শুতো ওরা। তা-ছাড়া লক্ষ্ণৌয়ে একটি বেশ্যাপল্লীতে—আজ্ঞে হ্যাঁ, এমন চমকে উঠবেন না মিঃ লর্ড!—অকাট্য প্রমাণ আমি পেয়েছিলুম। এবার সে কথাই বলি ঃ

উনিশ শ'পনের সালের মার্চ মাস। মানে, জাপানে কেটে পড়ার মাত্র মাস দুই আগেকার কথা। তার আগে হারাধনের দশটি ছেলের মত ওর সব কটা চেলাই ধরা পড়েছে। নটেগাছটি প্রায় মুড়িয়ে এনেছি আর কি! অবোধ, আমীর, বসন্ত, বালমুকুন্দ, অমর সিং, নিধন সিং, জগগ্‌ৎসিং, বালরাজ, রামশরণ, পরমানন্দ—একে একে নিবিছে দেউটি। বংশে বাতি দিতে তখনও টিকে আছে মাত্র দুজন—পাঞ্জাবে পিংলে আর চন্দননগরে শ্রীশ ঘোষ। ভারতব্যাপী ডামাডোল পাকানোর দিবাস্বপ্ন দেখা শেষ হয়েছে বাছাধনদের। ওর মাথার উপর লাখ টাকার পুরস্কারটা তখনও ঝুলছে—জীবিত বা মৃত!

শয়তনটা যেমন আমাদের মিলিটারী ক্যান্টনমেন্টে তার গুপ্তচর ঢুকিয়েছিল আমরাও তেমনি কৌশল করে ওর বিপ্লবীদলে দু'একটি টিক্‌টিকি ঢুকিয়ে দিয়েছিলুম। কিন্তু ওর মন্ত্রগুপ্তি ছিল অসাধারণ। দলের কেউ কারও পুরো পরিচয় জানতে পারত না রীতিমত বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠার আগে। যাই হোক ঐ জাতীয় আমাদের এক টিক্‌টিকির-লেজ খবর পাঠাল ঘড়িয়ালমশাই সম্প্রতি লক্ষ্ণৌতে যাতায়াত করছেন। চকের-মোড়ে ইম্পিরিয়াল হোটেলে ওঠেন তিনি। সেখানে ওঁর পরিচয়—এ. কে. রে. বার-অ্যাট-ল। স্যুটেড-বুটেড কেতা-দুরস্ত ব্যারিস্টার সাহেব! সন্ধান নিতে গেলুম ইম্পিরিয়াল হোটেলে। খবর ঠিকই। হোটেলে রেজিস্টারে গত ছয়মাসে বার চারেক 'এ. কে. রে.' এসে উঠেছেন। টাকা মিটিয়ে চলেও গেছেন। একটা

চাপ নিলুম। পুলিস বিভাগের দৌলতে ঐ হোটেলে দারোয়ানের চাকরি নিলুম। শুধু হোটেলের মালিক জানল আমার পরিচয়—ম্যানেজার পর্যন্ত নয়।

একটি মাস মশাই দারোয়ানের চাকরি করেছি। ভদ্র কায়স্থ সন্তান আমি, গেজেটেড-অফিসার।—ছত্রিশ জাতের বোর্ডারকে সকাল-সন্ধ্যা সেলাম বাজিয়ে গেছি! লোডেড রিভলভার নিয়ে শবরীর প্রতীক্ষায় দিন কেটেছে—কবে শ্রীরামচন্দ্র পদধূলি দিতে আসবেন সেই ইম্পিরিয়াল হোটেলের আশ্রমে!

তারপর একদিন হঠাৎ শুভলগ্নে এসে দাঁড়াল একটি টাঙ্গা। হোটেলেরই। মেল-ট্রেনের সময় লক্ষ্ণৌ স্টেশনে হাজিরা দেয়, যাত্রীদের নিয়ে আসে। টাঙ্গার পিছন দিকে দুজন ভদ্রলোক, কোচম্যানের পাশে বসে আছে মিশিরলাল, হোটেলের দালাল—সে স্টেশনে যায় যাত্রীদের আনতে। টাঙ্গাটা দাঁড়াতেই নেমে এলেন মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক। বেশ লম্বা, স্বাস্থ্যবান, স্যুটেড-বুটেড রঙ ফর্সা, হাতে দস্তানা, (ফাল্গুন মাসে বেশ গরম পড়তে শুরু করেছে তখন) মাথার টুপিটা এমনভাবে বাঁকানো যে মুখটা ভাল দেখা যাচ্ছে না। মুখে ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি, চোখে গগল্‌স! আমার সেলাম করা হল না, ডান হাতটা চলে গেল পকেটে।

হোটেল থেকে বয় এগিয়ে গিয়ে মালপত্র নামালো। টাঙ্গার দ্বিতীয় যাত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন কাউন্টারে। আমিও সরে এলুম রিসেপ্‌শান কাউন্টারের দিকে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হল। দেখলুম চম্‌কে উঠল লোকটা। ছদ্মবেশ সত্ত্বেও আমাকে চিনতে পারল নাকি? নিশ্চয় তাই, কারণ কাউন্টারে গিয়ে হিন্দিতে বললে, আমার নাম জি. কে. বাসু। দেখুন তো আমার নামে কোন রিসার্ভেশান আছে কিনা?

কাউন্টার-ক্লার্ক রেজিস্টার দেখে বললে, নেহী সা'ব!

—ঠিক আছে। সিংগ্‌ল্‌-সিটেড রুম পাব একটা, দুদিনের জন্য?

—আলবত।

আড়চোখে আমাকে দ্বিতীয়বার দেখে নিয়ে অম্লানবদনে ঘড়িয়ালটা খাতায় সই করলে—জি. কে. বাসু! মনগড়া একটা ঠিকানাও লিখল।

আমি আর স্থির থাকতে পারি না। বলি, এত গরমে আপনি দস্তানা পরে আছেন কেন, স্যার?

লোকটা এতক্ষণে পূর্ণদৃষ্টিতে দেখল আমাকে। কাউন্টারে ক্লার্কের দিকে ফিরে ইংরেজিতে বললো আপনারা হোটেলের দারোয়ানকে সহবত শেখান না? কার সঙ্গে কি-ভাবে কথা বলতে হয়—

যেন মানিব্যাগ বার করছে। ডান হাতটা সে পকেটে ঢোকাতে যায়। জানি, ওখানেই আছে ওর মারণাস্ত্র। বিদ্যুদ্‌গতিতে আমি এগিয়ে এসে চেপে ধরি ওর হাতটা। লোকটা তৎক্ষণাৎ বাঁ হাতে আমার গালে ঠাস করে মারে এক চড়। কিন্তু ততক্ষণে আমি বার করে ফেলেছি আমার রিভলবার। গর্জন করে উঠি: য়ু আর আণ্ডার অ্যারেস্ট এ. কে. রে! পালাবার চেষ্টা করলে খুলি উড়িয়ে দেব।

স্তম্ভিত হয়ে গেল লোকটা : এর মানে কি!

—মাথার ওপর হাত তোল বাছাধন!

আমার কথা লোকটা মেনে নিল, বললে : হোয়াটস্ অল দিস্!

রিসেপশান-ক্লার্কও ভ্যাবাচাকা। কোনক্রমে বললে মোহনদাস! এসব কি?

ইংরেজীতে বললুম, আমার নাম সুনীল ঘোষ! আমি ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অফ পুলিশ। তোমার মালিক জানে। স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্যবস্তুর প্রতি নজর রেখে বাঁ হাতে পকেট থেকে বার করে দেখাই আমার আইডিন্টিটি কার্ডখানা!

লোকটা বললে : দ্যাটস্ অল রাইট! কিন্তু আমাকে এভাবে—

—তোমার বাঁ হাতের দস্তানা খুলে হাতটা দেখাও।

বিনাবাক্যব্যয়ে তাই করল লোকটা! আশ্চর্য! টিপে টিপে দেখলুম নকল নয়—মাঝের আঙুলটা বেমালুন ফিরে এসেছে! হাড়-মাংস-চামড়া নখ।

মোটকথা পরীক্ষা করে বুঝলুম—এ লোক আমার শিকার নয়। এবার সলজ্জে ক্ষমা চেয়ে নিলুম। মারাত্মক ভুল। মিস্টার বাসু অবশ্য সজ্জন ব্যক্তি। বললেন, ঠিক আছে, ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই। আমিই বরং চড় মেরেছি আপনাকে। বাই দ্য ওয়ে—আপনি কি সাম্-মিস্টার এ. কে. রে-কে খুঁজছেন? তিনি কিন্তু এই ট্রেনেই এসেছেন।

চম্‌কে উঠি। বলি, কেমন করে জানলেন?

—আমরা একই ট্রেনে এসেছি। ট্রেনেই আলাপ। একই টাঙ্গায় স্টেশন থেকে হোটেলেও এসেছি। কিন্তু উনি নামলেন না। ঐ টাঙ্গাতেই—

বরাত! বরাত। ঘড়িয়ালটা আবার সট্‌কেছে। বুঝতে পারি, টাঙ্গাটা যখন এসে দাঁড়িয়েছে আর আমি বাসু-সাহেবকে লক্ষ্য করছি, তখনই ঘড়িয়ালমশাই হোটেলের দারোয়ানটিকে চিনে ফেলেছেন! নিঃশব্দে কাপুরুষের মত কেটে পড়েছেন। কিন্তু আমিও সুনীল ঘোষ, দুঁদে দারোগা, তৎক্ষণাৎ লোকাল থানার সঙ্গে যোগাযোগ করলুম। জনা-কয়েক আর্মড এজেন্টকে পাঠিয়ে দিলুম স্টেশনে। লক্ষ্ণৌ ছেড়ে লোকটা যেন না পালাতে পারে। নিষ্ক্রমণের ঐটাই সদর রাস্তা। হোটেলের টাঙ্গাওয়ালাকে ধরে আনল পুলিসে। আমিও পোশাক বদলে ততক্ষণে তৈরী। টাঙ্গাওয়ালা বললে,—ওর দ্বিতীয় সওয়ারি প্রথমে ঘশিয়াড়ি-মণ্ডির দিকে যায়, সেখানে কার সঙ্গে দেখা করে, তারপর দড়িয়াঁকা-পোল-এর কাছে মতিবিবির গলির মুখে নেমে যায়।

দড়িয়াঁকা-পোলের কাছে মতিবিবির গলি! ওটা তো বেশ্যাপল্লী! কয়েক ঘর বাঈজী আর রূপোপজীবিনী থাকে ঐ গলিতে। ঐ মহল্লাটা আমার চেনা। মানে ইয়ে.....রাত কাটাইনি কখনও—তবে আঁধারের কারবারী নিয়েই তো ছিলাম, মি লর্ড। তাই ঐ-সব মহল্লার সন্ধান আমাকে রাখতে হত।

দুজন সহকর্মীকে নিয়ে ঐ টাঙ্গায় চেপে চলে গেলুম দড়িয়াঁকা-পোলে। ঠিক যেখানে ওর সওয়ারি নেমেছিল সেখানে আমাদের নামিয়ে দিল টাঙ্গাওয়ালা। দেখিয়ে দিল—কোন পথে গিয়েছে তার সওয়ারি। ওটা একটা অন্ধগলি। চক্রব্যূহ! ঢুকবার-বেরুবার একটিই মাত্র রাস্তা। রাত তখন নয়টা। দু-একটি ঘরে আলো জ্বলছে। হারমনিয়াম আর তবলার শব্দ শোনা যাচ্ছে। শুধু পান-সিগারেট নয়, বেলফুলের মালাও সেখানে পাওয়া যায়। সঙ্গীদের অন্ধকারে রেখে এগিয়ে গেলুম ঐ পানের দোকানে। ধড়াচূড়া পরা দারোগা দেখে বৃদ্ধ দোকানদার সসম্ভ্রমে আমন্ত্রণ জানালো। এক খিলি জর্দা-দেওয়া তবক-মোড়া পান খাওয়া গেল। দামের কথা জিজ্ঞাসা করতেই দোকানী হাত দুটি জোড় করে গরুড়পক্ষীর মত বললে, হুজুর মা-বাপ। আপনার কাছে দাম নিতে পারি? মেহেরবানি করে যে পায়ের ধুলো দিয়েছেন সেটাই আমার সাত-পুরুষের পুণ্যফল!

—কি নাম হে তোমার?

আপনার টেংরি-কা-গর্দা, নফর-কি-নফর, ছেদিলাল বান্দা।

একেবারে লক্ষ্ণৌয়ী বিনয়ের পরকাষ্ঠা।

দাদা, বাপু ছেদিলাল, আজ রাত সাতটা নাগাদ এই গলিতে একজন লোক এসেছিল। সাহেবের পোশাক, মাথায় টুপি, হাতে চামড়ার স্যুটকেস—লম্বায় আমার চেয়ে আঙুল চারেক বড়, রঙ ফর্সা, বয়স ত্রিশ। চোখ দুটো—

বাধা দিয়ে ছেদিলাল বললে, হুজুর! ফালতু বাত ছেড়ে শুধু একটি কথা বলুন! ঐ দুশমনটার বাঁ হাতের আঙুলটা কি—

—একজ্যাক্টলি! নজর করেছ তুমি?

—জী হুজুর! লোকটা একটা টাঙ্গা থেকে উতরালো। স্যুটকেস হাতে এগিয়ে এল! আমার দোকানে বার্ডস-আই কিনল। সিগারেট ধরাবার সময় নজর হল তার বাঁ হাতের মাঝের আঙুলটার অনেকখানি না পাত্তা। লোকটা জিজ্ঞাসা করল, রঙ্গিলা-বিবির কোঠি কোন্‌টা। আমি বাত্‌লে দিলাম। সে ঘুষে গেল ঐ বাড়িতে।

আমার চোখ বড় বড় হয়ে যায়। এমন সৌভাগ্য হবে ভাবিনি। এক মুখো-গলি। ব্যূহমুখে ধ্রুব্‌ জয়দ্রথ, আমার দুই সহচর। ওদিকে রঙ্গিলা-বিবির হাড়িকাঠে স্বেচ্ছায় মাথা গলিয়েছেন ঘড়িয়াল। লাখ টাকার চেকটা কোন অ্যাকাউন্টে জমা দেব এটুকুই খালি স্থির করা বাকি।

রঙ্গিলা-বিবির বাড়িটা ছেদিলাল আমাকে চিনিয়ে দিল। গলিতে ঢুকেই দ্বিতীয় বাড়ি। নম্বর ১৩/১। রঙ্গিলা ছাড়া বাড়িতে থাকে আর একজন,—ফকির-সাহেব।

—সে আবার কি। পেতনী-পাড়ায় অযোধ্যাপতি! বেশ্যাপল্লীতে ফকির?

ছেদিলাল বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা। ঐ ফকির-সাহেব হচ্ছে এক বিচিত্র জীব—রঙ্গিলা বিবির ধর্মবাপ। সংসার ত্যাগ করে ফকির হয়েছিল। আবার ঐ রঙ্গিলা-বিবিকে নিয়ে ফিরে এসেছে। কেমন যেন সন্দেহ হল আমার। বললুম, লোকটাকে দেখতে কেমন? বয়স কত?

—বেশ দোহারা গড়ন। বয়স ষাটের উপর। একমাথা বাবরি চুল, একমুখ কাঁচাপাকা দাড়ি। পরনে আলখাল্লা, হাতে অষ্টাবক্র লাঠি—

ওকে থামিয়ে দিয়ে বলি, আরে পোশাকের বর্ণনা নয়, সে তো যে-কেউ পরতে পারে। লোকটার রকম-সকম কেমন? কতদিন চেন তাকে?

ছেদিলাল সবিনয়ে বললে, হুজুর যা ভাবছেন তা নয়। লোকটাকে আমি চল্লিশ বছর ধরে চিনি। এই গলিতেই তার জীবনের ত্রিশটা বছর কেটেছে। সে ছিল মতিবিবির পেয়ারের লোক। মতিবিবি মাটি নেওয়ার পর থেকে সে বিবাগী হয়ে যায়। পুলিসের খাতায় তার নাম নেই হুজুর। গুণী মানুষ। আমি জামিন থাকছি। ভাল বেহালা বাজায়! ঐ রঙ্গিলাবিবির ঘরেই তো যাচ্ছেন—দেখতে পাবেন তাকে।

জিজ্ঞাসা করি, আর রঙ্গিলা-বিবি দেখতে কেমন?

মাথা চুলকে ছেদিলাল বলে, ছোটমুখে বড় কথা হয়ে যাবে হুজুর। যেমন গানের গলা, তেমনি খুপসুরৎ! যৌবন যেন ফেটে পড়ছে। তবে ঐ। ঘরে কিছুতেই লোক বসাতে চায় না।

—সে কি গো! বাঈজীর আবার এত সতীপনা!

—না হুজুর, সতীপনা নয়—ঘরে লোক বসালে ঐ বুড়ো ফকির-সাহেব, মানে ওর

ধম্মবাপকে যে পথে পথে রাত কাটাতে হয়। ঘর তো কুল্লে একখানা। তবে বাইরে মুজ্‌রো পেলে যায়।

সঙ্গী দুজনকে গলির মুখে পাহারায় রেখে অকুতোভয়ে এগিয়ে গেলুম বাড়িটার দিকে। ঘরে আলো জ্বলছিল। সুরেলা কণ্ঠে গান গাইছিল একটি মেয়ে। কান পেতে শুনলুম। না, তব্‌লা বাজ্‌ছে না—বাজ্‌ছে বেহালা। ঠেলে দেখলুম, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। আস্তে টোকা দিলুম, যেমন দেয় নাগরে! গান থেমে গেল। বেহালার শব্দটাও। রুদ্ধদ্বারের ওপার থেকে প্রশ্ন হল : কৌন?

বিশুদ্ধ উর্দুতে যা বললুম তার নির্গলিতার্থ : হে প্রাণেশ্বরী, ফাল্গুন যে বৃথা বয়ে যায়। দ্বার খুলে দেখ কোন পতঙ্গ পুড়তে এসেছে তোমার বহ্নি-শিখায়।

ওদিক থেকে কড়া জবাব এল : এগিয়ে দেখ বাছা। এখানে হবে না।

কিন্তু হবে না বললে শুনছে কে? রুদ্ধদ্বারের ও-প্রান্তে যে আমার গুপ্তধন। লাখটাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফটখানাই শুধু নয়, আমার প্রমোশন।

শেষ পর্যন্ত দরজা খুলতে বাধ্য হল রঙ্গিলা। চম্‌কে গেলুম তাকে দেখে। বড় মিথ্যে কথা বলেনি ছেদিলাল! একেবারে মুঘল দরবারের নটী! ময়ূরকণ্ঠী রঙের ঘাগ্‌রা, পান্নারঙের ভেলভেটের চোলি, কপালে টিপ, মাথায় ওড়না। কিন্তু সে-তো যে-কোন মেয়ে পরতে পারে,—আসলে ওর রূপ-যৌবন কানায়-কানায় টলমল। দারোগা দেখে ভ্রুকুটি করল মেয়েটি : কী চাই?

তোমার নাম রঙ্গিলা-বিবি?

—হ্যাঁ, কেন?

—তোমার ঘরে এখন কে আছে?

—কেউ নেই। কেন?

—ফকির-সাহেব কোথায়?

—বেরিয়েছেন।

—ঘরে কেউ নেই তো বেহালা বাজাচ্ছিল কে?

—আমি নিজেই।

দরজা থেকে সরে দাঁড়াও। ঘরটা আমি সার্চ করব?

তবু সরে দাঁড়ায় না মেয়েটা। বলে : সার্চ ওয়ারেন্ট আছে?

আরে ব্বাস! এ যে কপচায়! এক ধাক্কায় ওকে সরিয়ে দিয়ে আমি ঘরের ভিতর ঢুকি। বেশ বড় ঘরটা। একটি মাত্র ঘর। মেঝেতে ঢালাও ফরাস। ও-পাশে মাটিতেই বিছানা পাতা। একটা কাঁসার রেকাবিতে একটি গোড়ে-মালা। ফরাসের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বাঁয়া আর তব্‌লা। আর একটা বেহালা। আতি-পাতি করে খুঁজলুম ঘরটা। ও-পাশে আছে এক চিল্‌তে রান্নাঘর। পিছনে ছোট্ট উঠোন। একটা করবী গাছ। উঠোনের মাঝখানে পাতকুয়ো। টর্চ ফেলে দেখলুম ভিতরটা। ও-পাশে একটি খাটা-পায়খানা। সেটাও দেখলুম। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। পাখি উড়ে গেছে। খাঁচা খালি।

পিছন ফিরে দেখি মেয়েটি চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে।

—আজ সন্ধ্যার সময় তোমার ঘরে একজন স্যুটপরা লোক এসেছিল?

—বল্‌ব না!

ঠাস্ করে এক চড় কষিয়ে দিই ওর গালে। আমার হাতে আচম্‌কা চড়টা খেয়ে মেয়েটা বসে পড়ে। আমার পাঁচ আঙুলের দাগ বসে যায় ওর নরম গালে। পরে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। হাসে। বলে, এসেছিল।

—সে কোথায়?

—আধঘন্টা আগে চলে গেছে।

—লোকটা কে? কী নাম?

অদ্ভুত মিষ্টি হাসল রঙ্গিলা। বললে, হুজুর যদি এখানেই আজ রাতটা কাটিয়ে যান, আর সকালে যদি আপনার বিবি এসে আপনার নাম জিজ্ঞাসা করেন তাহলে নামটা কি আমি বলতে পারব? আমি তো বাঈজী, দেহ বেচে বেঁচে আছি। যে এসেছিল তার নাম জানি না, শুধু জানি—সে পুরুষমানুষ।

মেয়েটা বাঈজী, না দার্শনিক? দুটো টাকা ওকে দিই। আভূমিনত হয়ে সেলাম করে। বলে, আবার আসবেন পায়ের ধুলো দিতে।

বেরিয়ে এসেছিলুম। ঘুরে দাঁড়াই। বলি, নিমন্ত্রণ করছ? অমন চড় খেয়েও!

কটাক্ষ করে মেয়েটি সলজ্জে বলল, যে গালে চড় মেরেছেন সেই গালেই মলম লাগিয়ে দেবেন না হয়!

হক্ কথা বল্‌ব বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ! আমি বিবাহিত। স্ত্রী আছেন দেশের বাড়িতে। ঘড়িয়ালটার পিছনে ঘুরতে ঘুরতে আজ তিন মাস বাড়ি যাওয়া হয়নি। আমার রক্তের মধ্যে কেমন যেন দোলা লাগল। হেসে বললুম, আজ রাতটা যদি সত্যিই এখানে থেকে যাই তাহলে কাল আমার নামটা কেউ জানবে না?

আবার হেসে মেয়েটি বললে, য়ুনিফর্ম পরে? তা আপনি একাই এসেছেন তো হুজুর?

তাই তো! ব্যূহমুখে ডবল জয়দ্রথ যে পাহারায় আছে!

বলি : আজ নয়, কাল আসব।

—কাল নয়, পরশু। কাল আমার ঘরে অন্য মেহ্‌মান আসবেন। বায়না নেওয়া আছে।

বেরিয়ে এলুম পথে। এ. কে. রে. ছেদিলালকে সরাসরি প্রশ্ন করেছিল—রঙ্গিলা-বিবির আস্তানা কোন্‌টা। অর্থাৎ রঙ্গিলা-বিবি রাসবিহারীর পূর্ব-পরিচিত। মেয়েটি সাধারণ বাঈজীর মত নয়। বিনা সার্চ-ওয়ারেন্টে আমি যে তার গৃহে অনধিকার প্রবেশ করতে পারি না, এটুকু আইনজ্ঞান তার আছে। সুতরাং লোকাল থানার সঙ্গে বন্দোবস্ত করলুম দিবারাত্র ঐ গলিটা পাহারা দিতে হবে। তিন শিফ্‌টে চব্বিশ ঘন্টা প্রহরায় থাকল সাদা-পোশাকের পুলিস।

পরদিন সন্ধ্যায় ফিরে গেলুম সেখানে। আজ আর দারোগার পোশাক নয়। চোস্ত আর লক্ষ্ণৌয়ী চিকনের পাঞ্জাবী, মাজায় বাঁধা রিভলভার,—পায়ে নাগরা, হাতে ছড়ি। রঙ্গিলা বলেছিল, পরদিন সন্ধ্যায় ওর ঘরে মেহ্‌মান আসবে। আমি দেখতে চাই—কে সেই অতিথি!

রাত সাড়ে নয়টায় ওখানে পৌঁছলুম। সাদা-পোশাকের পুলিস দুটোকে বললুম, আমি সারারাত ঐ বাড়িটার পিছনে লুকিয়ে থাকব। যদি কাউকে পালাতে দেখ তাড়া করে ধরবে।

এগিয়ে গেলুম। আজও দরজা বন্ধ। আজও ঘরে আলো জ্বলছে এবং ঘরের ভিতর থেকে ভেসে আসছে বেহালার তান ও কণ্ঠসঙ্গীত।

ঘরের পাশেই একটা সরু গলি। সেদিকে একটা জানালা। তার একটা খড়খড়ির পাল্লা ভাঙা! দেওয়াল বেয়ে উঠে ঘরের ভিতর উঁকি দিলুম। ঘরে রঙ্গিলা একা নয় আরও একজন বুড়ো লোক বসে আছে। বেহালা সেই বাজাচ্ছিল। আমি মুখ বাড়াতেই বেহালাটা থেমে গেল। লোকটা বেহালার ছড়টা দিয়ে জানালার দিকে নির্দেশ করল।

রঙ্গিলা চমকে এদিকে তাকালো :

—কে? কে ওখানে?

দরজা খুলে দিতেই আমিই ঢুকলুম। যে লোকটা বেহালা বাজাচ্ছিল যন্ত্রটা রেখে দিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। আভূমি নত হয়ে সেলাম করে।

রঙ্গিলা তার দিকে ফিরে বলে, ফকির-সাহেব, আর গান-বাজনা হবে না। যাও, দোকান থেকে কিছু মিঠে পান নিয়ে এস।

পয়সা নিয়ে লোকটা বেরিয়ে যায়।

জিজ্ঞাসা করি : কই তোমার মেহ্‌মান আসেননি?

মুচকি হেসে বললে, মেহ্‌মান ঠিকই এসেছেন। রামের বদলে রহিম!

শুনলুম যাঁর আসার কথা ছিল তিনি কী একটা কারণে আসতে পারবেন না বলে ঐ ফকিরটাকে বিকালবেলাতেই জানিয়ে দিয়েছেন। ওর ঘর আজ ফাঁকা। তাই গান-বাজনায় বসেছিল।

একটু পরে নফরটা ফিরে এল পান-জর্দা নিয়ে। রঙ্গিলা বললে, তুমি আজ বাইরেই রাতটা কাটাও ফকির-সাহেব। দারোগাসাহেব এখানে—

নিঃশব্দে লোকটা বেহালাখানা তুলে নিল। আবার সেলাম করল আমাকে। আমার কেমন যেন খারাপ লাগল। বলি, আর একটু গান-বাজনা হোক না। বেশ তো চলছিল তোমাদের!

রঙ্গিলা একটু ইতস্তত করল। কিন্তু ঐ লোকটা নির্বিকার। বাক্সটা খুলে সে আবার বসে পড়ে। রঙ্গিলা গান ধরল। বিরহের গান। ফকির আপন মনে ছড় টেনে চলে। গান-বাজনা আমার আসে না। ঠিক বুঝতে পারি না। ওরা দুজনেই কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে বুঁদ হয়ে গেল। রঙ্গিলা-বিবি আর তার ধর্মবাপ ঐ বৃদ্ধ। আমি যেন নেই। আমি বাহুল্য। রঙ্গিলার আঁখো কি কিনারে ননি ননি বুঁদিয়া। মুদিত-নেত্র ফকির-সাহেবের চোখেও নেমেছে ধারা স্রোত।

আমি কেমন যেন তন্ময় হয়ে গেলুম। মনে হল, কে এই রূপোপজীবিনী? কেন সে হতে পারল না কোন ভদ্র গৃহস্থ-ঘরের কন্যা-বনিতা-মাতা? আর কে ঐ উদাসীন সঙ্গীতসাধক ফকির-সাহেব? লোকটার বয়স পঞ্চাশের উপর বাটের কাছাকাছি। মাথায় বাবরি চুল—সাদা হয়ে গেছে বেশির ভাগ। মাথায় লক্ষ্ণৌয়ী টুপি। মুখে বসন্তের দাগ। দোহারা গড়ন। পরনে দরবেশের বিচিত্র তালিমারা আলখাল্লা। অথচ হাতে জড়ানো একটা বেলফুলের মালা। ছেদিলাল লোকটাকে চল্লিশ বছর ধরে চেনে। মতিবিবির মৃত্যুর পর সে নাকি বিবাগী হয়ে যায়। আবার ফিরে এসেছে! আলখাল্লাটা ছাড়েনি—কিন্তু বেলফুলের মালাও জড়িয়েছে হাতে! বিচিত্র এ দুনিয়া।

গান থেমে গেল। আমি প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণ করলুম। ওরা দুজনেই সেলাম করল। মনিব্যাগটা বার করে খান-কয় নোট বাড়িয়ে ধরলুম বান্দাটার দিকে। বললুম, বিলাতির দোকান চেন?

রঙ্গিলা বললে, রাত দশটা বেজে গেছে বাবুজী। দোকান সব বন্ধ। মাল ঘরেই আছে। খাঁটি বিলাইতি!

ইঙ্গিত করলে সে ধর্মবাপকে। সে চলে গেল পাশের গলির দিকে।

বিশ্বাস করুন, মদ আমি খাই না। ওটা সে রাত্রে বাধ্য হয়ে খেয়েছিলুম, কারণ খাওয়াতে চেয়েছিলুম রঙ্গিলাকে। মদের নেশায় যদি মেয়েটা মুখ খোলে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল—মেয়েটা আছে ঐ দলে। নাহলে ঘড়িয়ালটা কেন এসে ছেদিলালকে সরাসরি ওর নাম করে

[১]কানা জিজ্ঞাসা করবে?

এ কাহিনী দীর্ঘতর করে লাভ নেই। সংক্ষেপে বলি, মদের ঝোঁকে আমি এবং রঙ্গিলা দুজনেই বেসামাল হয়ে পড়ি। বুড়োটা অনেক আগেই উঠে চলে গেছে। মেয়েটা কিছুতেই কিছু স্বীকার করেনি—মাতাল হল, কিন্তু কিছুতেই ধরা দিল না—তবু যা জানতে চাই তা জেনেছিলুম আমি। পরদিন সকালবেলা যখন খোঁয়াড় ভাঙলো, দেখি পাখি উড়ে গেছে। রঙ্গিলার সন্ধান আমি আর পাইনি। তবু ওর ঘরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে উদ্ধার করেছিলুম খান-কতক 'লিবার্টি-'র কপি। আর রাসবিহারীর উপস্থিতির অকাট্য প্রমাণ—একটা ভিজিটিং কার্ড। আইভরি ফিনিস্‌ড কাগজে মনোগ্রাম লেখা আছে 'এ. কে. রে. বার-অ্যাট-ল'। ঐ ঘরেই পেয়েছিলুম সেটা।

সে-কথা পুলিস রিপোর্টে অবশ্য পাবেন না। আমি এ আবিষ্কারের কথাটা স্বীকার করতে পারিনি। কারণ ছিল। সে যাই হোক—ঘড়িয়াল-মশাই যে ধোয়া তুলসীপাতাটি নন তার অকাট্য প্রমাণ নিশ্চয় পেলেন আপনারা! নতুবা বাঈজীর ঘরে তার নামাঙ্কিত ভিজিটিং-কার্ড আসবে কোথা থেকে?

উপসংহারে বলি, ঐ ঘড়িয়াল-মশায়ের জন্যই শেষ পর্যন্ত আমার ডিমোশন হয়। অপরাধঃ আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। তাঁকেই টিকটিকি নিযুক্ত করে আমি নাকি সরকারী টাকা অপব্যয় করেছি। সেই সরকারী টাকায় বিচ্ছুটা বুঝি স্মাগল্‌ড্ রিভলভার কিনেছে। স্নেক্-ল্যাডার খেলায় সাপের মুখে পড়লে যা হয়! ডি. এস. পি. থেকে নেমে শেষ-মেশ হলুম ইন্সপেক্টর!

মনে করবেন না—শুধু সেজন্যই আক্রোশবশে আমি আজ এই প্রস্তাব রাখছি যে, ঘড়িয়ালটার চিতাভস্ম যেন ভারতবর্ষে না আনা হয়।

স্বাধীনতার বারো বছর পরে ১৯৫৯ সালে এদেশে একটা হুজুক ওঠে—ওঁর চিতাভস্মটা জাপান থেকে সসম্মানে নাকি ভারতবর্ষে ফিরিয়ে আনা হবে। পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জাপানে রাসবিহারী-তনয়া মিসেস্ তেৎসু-কো হিগুচির কাছে ভারতবর্ষের তরফে একটি অনুরোধ জানান—তাঁর স্বর্গত পিতৃদেবের চিতাভস্মের অর্ধাংশ ভারতবর্ষে নিয়ে আসার অনুমতি চেয়ে। রাসবিহারী-তনয়া তৎক্ষণাৎ রাজী হন—তিনি নাকি উত্তরে জানিয়েছিলেন : এই ছিল তাঁর পিতৃদেবের ইচ্ছা।

ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল সেবার জাপানে গিয়েছিলেন। তিনি রাসবিহারীর কন্যা মিসেস্ তেৎসু-কো হিগুচি এবং রাসবিহারীর বিশিষ্ট বন্ধু মিঃ কুজুর সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা বলে আসেন, যাতে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ঐ চিতাভস্ম আনা যায়।

তখনই ঘাবড়ে গিয়েছিলুম আমি। প্রখ্যাত বিপ্লবী ভূপতি মজুমদার-মশাই সে সময়ে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের একজন মন্ত্রী। তাঁকে মুখপাত্র করে ভারত সরকার এক ডেলিগেশান জাপানে পাঠালেন। ওঁরা গিয়েও রাসবিহারী তনয়ার সঙ্গে জওহরলালের প্রস্তাবের খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করে আসেন। অর্থাৎ কী-ভাবে তিনি চিতাভস্মটা আনবেন তা বুঝিয়ে দেন। কলকাতায় 'বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু স্মারক সমিতি' নামে একটি সংস্থা জন্মগ্রহণ করে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্রের ২১. ১. ৫৯ তারিখে স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্রও জনসাধারণে বিতরিত হল। তাতে ডাঃ বিধানচন্দ্র উপসংহারে বললেন ঃ

> "I understand that his (Rash Behari's) daughter will bring his ashes from Japan to India shortly. A Smarak Samity has been formed to

perpetuate the memory of this great patriot. I appeal to my countrymen to contribute generously to the funds of this Samity."

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে দেশবাসী কতটা 'জেনারাস' হয়েছিলেন জানি না, তবে এটুকু জানি যে, স্মারক-সমিতির চারজন সভ্য পুনরায় জাপানে গেলেন। তাঁরা রাসবিহারী-তনয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঐ ছাইভস্ম আনার যাবতীয় ব্যবস্থা পুনরায় করে আসেন। জানি না, মিসেস হিগুচি বিস্মিত হয়েছিলেন কিনা। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কী-ভাবে তিনি ঐ ছাইভস্মটা আনবেন সেটা বোঝাবার জন্য ভারতবর্ষ থেকে এ-ভাবে কেন দলে দলে মহামান্য ব্যক্তিরা তাঁকে বারে বারে তালিম দিতে যাচ্ছেন সম্ভবত তা তিনি অনুধাবন করতে পারেননি। যাই হোক, তিনি জাপানী-বিনয়ে ওঁদের আশ্বস্ত করেন—দিন-ক্ষণ স্থির হলেই তাঁর পিতার সযত্নরক্ষিত ভস্মাধারটি সসম্মানে নিয়ে আসবেন।

ফাইনাল-টাচ্ রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে স্বয়ং রাষ্ট্রপতির ঘোষণা ঃ

"I am glad that the ashes of the Late Rash Behari Bose are being brought to India from Japan by his daughter.... As the last symbol of his earthly existence, we welcome his ashes back to the country of his birth. I am sure they will be a source of inspiration to all and sundry."

Sd. Rajendraprasad
18. 4. 1959

[স্বর্গত রাসবিহারী বসুর চিতাভস্ম তাঁর কন্যা জাপান থেকে ভারতবর্ষে নিয়ে আসছেন শুনে আমি আনন্দিত...তাঁর নশ্বর দেহের শেষ স্মারক চিহ্নটিকে আমরা তাঁর জন্মভূমিতে স্বাগত জানাই। আমি নিশ্চিত জানি, ঐ চিতাভস্ম আমাদের সকলকেই অনুপ্রাণিত করবে।

স্বাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ
১৮. ৪. ১৯৫৯]

তখনই আমার মনে হল এ-বিষয়ে একটি প্রতিবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশ করা কর্তব্য। 'সম্পাদক সমীপেষু' মার্কা একটা পত্র তখনই লিখে ফেলি। তরপর মনে হয়, দেখাই যাক এঁদের দৌড়টা। জাপানে বসে রাসবিহারী-তনয়া বার বার 'রেডি-স্টেডি' শুনেছেন—'গো' তো কেউ আজ পর্যন্ত বলেনি তাঁকে। দু-চার দিন অপেক্ষা করেই বুঝলুম, আমার আশঙ্কা অমূলক। মহামান্য কুম্ভকর্ণ জাগেননি—পাশ ফিরে শুয়েছেন মাত্র। কেটে গেল আরও বারো বছর।

আজ আবার আপনারা ঐ একই ধুয়ো তুলেছেন। মিঃ লর্ড! বারো বছরে মামলা তামাদি হয়ে যায়। ঘড়িয়াল-সম্রাট ১৯৪৫ সালে আবেদন জানিয়েছিলেন : ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে যেন তাঁর দেহাবশেষ ভারতে নিয়ে আসা হয়। মানলুম! কিন্তু সেই আবেদনটা আটাশ বছর পরে নিঃসন্দেহে এখন তামাদি হয়ে গেছে। সুতরাং ওসব কথা আজ আর ওঠে না! কেন মিথ্যে জল ঘোলা করছেন মশাই?

যমুনা-বাঈয়ের জবানবন্দী

আপনাদের সামনে আমি আমার বক্তব্য রাখতে এগিয়ে এসেছি একটি বিশেষ কারণে—আপনাদের সিদ্ধান্ত যেন মিথ্যা জবানবন্দীর দ্বারা প্রভাবিত না হয়। আই. বি. দারোগা সুনীল ঘোষ-মহাশয়ের জবানবন্দী আমি পড়েছি। আমি মনে করি, তার একটা প্রতিবাদ হওয়া উচিত। তাই কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়িয়েছি :

ঘোষ-মহাশয়কে আমি ভালভাবেই চিনি। তাঁর বর্তমান বয়স ছিয়াশী। তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। ত্রিশ বছর তিনি পেনশন খাচ্ছেন—বড়দাকে পথকুকুরের মত ভারতবর্ষের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত তাড়িয়ে বেড়াবার পুরস্কার! স্বাধীন ভারত তাঁকে ত্রিশ বছর ধরে পেনশন যুগিয়েও কি ঋণমুক্ত হয়নি? না হলে এই শেষ বয়সে তিনি মহানায়কের প্রতি এ-ভাবে কর্দম নিক্ষেপ করতে এগিয়ে এলেন কেন? আর সবচেয়ে দুঃখের কথা—তিনি জ্ঞাতসারে মিথ্যা এজাহার দিয়েছেন—রাসবিহারীর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করবার অসৎ উদ্দেশ্যে! আমার কথাটাও তাই শুনিয়ে যাই :

না। আমার নাম যমুনা-বাঈ নয়। আমার স্বামীর নামও রামস্বরূপ শুকুল নয়। অথচ আমরা দুজনেই বাস্তব জগতের মানুষ—ঐতিহাসিক ব্যক্তি। আমার স্বামীর প্রকৃত নামটা পাবেন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায়, প্রাথমিক মামলায়। তেরই সেপ্টেম্বর উনিশ শ পনের ঐ মামলায় যে চব্বিশজন অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল আমার স্বামী ছিলেন তাঁদেরই একজন। পরে আপিলে ঐ চব্বিশ জনের মধ্যে সতের জনের প্রাণদণ্ড মুকুব করে তাঁদের যাবজ্জীবন দীপান্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়; বাকি সাতজনের ফাঁসি হয়েছিল এক মাস পরে। সেই সাতজন ভাগ্যবান হচ্ছেন—অমৃতসরের বক্‌শিস সিং, সুরেন সিং (ঈশ্বর সিং-এর পুত্র), সুরেন সিং (বুরসিং-এর পুত্র), শিয়ালকোটের হরনাম সিং, জগ্‌গৎ সিং, কর্তার সিং এবং বড়দার প্রিয়-শিষ্য অনুজপ্রতিম বিষ্ণুগণেশ পিংলে। বাকি যে সতের জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় তাদের মধ্যেই আমার স্বামীর নামটা খুঁজে পাবেন। আমার হতভাগ্য স্বামী—সেই বীর স্বাধীনতা-সংগ্রামীর প্রকৃত নামটা আজ ঘোষণা করতে পারলাম না একটি বিশেষ কারণে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্ররা আজও জীবিত—তারা জানে তাদের কাকীমা স্বর্গত। তাদের সে ভুলটা আমি ভেঙে দিতে চাই না। পরবর্তীকালে যে ঘৃণিত জীবন আমি যাপন করতে বাধ্য হয়েছি তা তারা জানে না, সমাজ জানে না। সে নেপথ্যকাহিনী অনাবিষ্কৃতই থাক। না হলে আমার স্বামীর উঁচু মাথাটা অনেকের চোখে হেঁট হয়ে যাবে। মনে করুন—আমার স্বামীর নাম রামস্বরূপ শুকুল।

আমার বিয়ে হয়েছিল পনের বছর বয়সে, ওঁর বয়স তখন উনিশ। তিনি যখন ধরা পড়েন তখন আমার বয়স একুশ। মাত্র ছয় বছরের বিবাহিত জীবন আমাদের। সন্তানাদি আমার হয়নি।

আমার কথা দিয়েই শুরু করি। আমার ড্যাডি ছিলেন বিলাতফেরত মানুষ। অবস্থাপন্ন

ঘরের ছেলে, কিন্তু সমাজে তিনি ছিলেন একঘরে হয়ে। কালাপানি পার হওয়ার জন্যই শুধু নয়, তিনি একটি ফরাসী রমণীর পাণি গ্রহণ করেন—অর্থাৎ আমার মাকে। আমার মায়ের বিবাহিত জীবনও সংক্ষিপ্ত। আমাকে জন্ম দিতে গিয়েই তিনি মারা যান। মা তো দূরের কথা, কোন মাসি-পিসি বা দিদিমা-ঠাকুমার স্নেহও পাইনি আমার শৈশবে। বাবা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেননি। আমি মানুষ হয়েছিলাম আয়াদের কাছে। ড্যাডি ব্যারিস্টার হবার জন্য বিলেত গিয়েছিলেন কিন্তু ব্যারিস্টার হতে পারেন নি। ফিরে এসে তিনি উত্তর-ভারতের একটি বিখ্যাত কলেজে অধ্যাপনা করতেন।

বাপের আদরে এবং শাসনের অভাবে ছেলেবলো থেকে আমি ছিলাম জেদি, একরোখা, নির্ভীক আর ডানপিটে। মা-মরা মেয়ের সব আবদার বাবা মেনে নিতেন,—তাই আমার ধারণা ছিল আমার ইচ্ছায় বুঝি দুনিয়াটা চলবে। ক্রমে বয়স বাড়ল। বাবা মিশনারী স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। উর্দু-হিন্দির চেয়ে ইংরাজিটাই শিখলাম ভাল করে। রামায়ণ-মহাভারতের নাম জানতাম না, বাইবেলের অনেক প্রার্থনা ছিল মুখস্থ। যে আমলের কথা, তখন আট-নয় বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ে হত আমাদের ও-অঞ্চলে। বাবা কিন্তু আমার বিবাহের কোন আয়োজনই করেননি। আমার চৌদ্দ বছর বয়সে বাবার প্রথম অ্যাটাক হয়। সন্ন্যাসরোগ বলতাম তখন আমরা। ধাক্কাটা সামলে উনি উঠে পড়ে লাগলেন—আমার বিয়ে দিতে হবে। সমাজে উনি পতিত—নিজের জাতে, নিজের পরিবারে তিনি অপাঙ্‌ক্তেয়—তাই বিলাতী কায়দায় আলোকপ্রাপ্ত পরিবারের দু-চারটি ছেলেকে বাড়িতে আনতে শুরু করলেন। আমি খুব ভাল গান গাইতে পারতাম—গজল এবং ঠুংরি। রীতিমত ওস্তাদ রেখে বাবা আমাকে শিখিয়েছিলেন। বাবার নিজেরও গান বাজনার প্রতি খুব ঝোঁক ছিল। অসুখে পড়ার পর বাবা দীর্ঘ ছুটি নিলেন। তখন প্রায়ই আমাদের বাড়িতে গান-বাজনার আসর বসত। বাবার বন্ধু ও সহকর্মীরা আসতেন, ছাত্ররা আসত—আর আসত, বাবার ভাষায়—স্যুটার!

ড্যাডির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল খুব খোলামেলা—তিনিই আবাল্য আমার বন্ধু-ভাই-মা! সোজাসুজি প্রশ্ন করতেন—'হ্যাঁরে, সোমেশ্বর ছেলেটাকে কেমন লাগে তোর?' অথবা 'বীরেশ্বর প্রসাদ ছেলেটাকে তোর সঙ্গে খুব মানায়।' আমি শুধু মুখ বাঁকাই। কাউকেই আমার মনে ধরে না। বলি : কালো ভূত!

একটা কথা জনান্তিকে জানাই। আমি আমার মায়ের রূপ পেয়েছিলাম। ছেলেবেলা থেকেই রূপের প্রশংসা শুনতে শুনতে আমি নিজেকে রাজ-রাজেশ্বরী ভাবতাম। কৈশোর পার হয়ে যৌবনে পা দিয়েও আমার সে মতির পরিবর্তন হয়নি। অপরের চোখের আয়নায় আমি নূরজাহান আর ক্লিয়োপেট্রাকে দেখেছি।

এই সময়ে আমাদের বাড়িতে প্রথম এল রামস্বরূপ শুকুল। আঠারো উনিশ বছরের তারুণ্যে ভরপুর—কিন্তু সেও কালো!

শুনলাম, সে বাবার কাছে এসেছে ফরাসী শিখতে। ওর দাদা রামবিলাস ছিলেন বাবার ছাত্র। বাবা বললেন, রামস্বরূপ আমাদের বাড়িতেই থাকবে। সে নাকি মাস ছয়েক পরে বিলাত যাবে—প্যারিসে। তাই বাবার কাছে মোটামুটি ফরাসী ভাষা শিখতে এসেছে।

আলাপ হল ছেলেটির সঙ্গে। প্রথম আলাপেই ধাক্কা লাগল মনে। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা—তবু প্রথম দিনের অনুভূতিটা আমি আজও ভুলতে পারিনি। ছেলেটা আমার মুখের দিকে একবারও তাকালো না! দুধে আলতা রঙের নূপুর-পরা দুটি পায়ের দিকে দৃষ্টি

রেখেই সে আলাপ করে গেল।

আহত হলাম। রূপের অভিমানে ঘা লাগল। তারপর প্রয়োজন অপ্রয়োজনে ওর সামনে এসেছি। ক্রমে তার নজর উঠ্‌ল—তাকালো আমার চোখে চোখ রেখে—কিন্তু পুরুষের চোখে যে দৃষ্টি দেখতে আমি অভ্যস্ত, তা দেখতে পেলাম না একবারও। হয় ছেলেটা পাষাণ, নয় দেবতা, নতুবা ও পুরুষ মানুষ নয়! আমি হেরে গেলাম।

ড্যাডি অভ্যাসবশে প্রশ্ন করেন, রামস্বরূপ ছেলেটাকে মনে ধরে?

আমি চম্‌কে উঠি। প্রতিপ্রশ্ন করি, ও বিলেত যাচ্ছে কী পড়তে?

ড্যাডি চম্‌কে ওঠেন : তাই তো! সে কথাটা তো জানা হয়নি!

দুদিন পরে তিনি আবার এ প্রসঙ্গ তুললেন—রামস্বরূপ বিয়ে করবে না!

আমি ক্ষেপে উঠি : তুমি ওর কাছে আমার বিয়ের কথা বলছিলে?

ড্যাডি হাসতে হাসতে বলেন, না রে। ও আদৌ বিয়ে করবে না?

আমার রোমান্টিক প্রেমের কাহিনী দীর্ঘতর করে লাভ নেই। আলোচ্য জবানবন্দীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। মোট কথা এই প্রথম বাধা পেয়ে আমি রুখে দাঁড়ালাম। আমাকে উপেক্ষা করে যে চলে যাওয়া যায় না, এটা ওকে ভালোমত বুঝিয়ে দিতে হবে। নানাভাবে জাল পেতেছি, ছলনার অবতারণা করেছি—ও যে মনে মনে সে জালে আটকে পড়ে ছট্‌ফট করেছে তা তিলমাত্রও বুঝতে পারিনি আমি। ক্রমে আমার সাহস গেল বেড়ে। বাড়িতে আমার কোন অভিভাবিকা নেই—ড্যাডি তো মাটির মানুষ—তাই সুযোগের কোন অভাব ছিল না। ও রাত জেগে পড়াশুনা করত। ইচ্ছা করে পাচককে ছুটি দিয়ে দিতাম। ওকে খাওয়ানোর অছিলায় কাছে গিয়ে বসতাম।

তারপর যা হবার তাই হল! প্রচণ্ড উত্তেজনায় একদিন বারুদস্তূপে আগুনের ছোঁওয়া লাগল। মুহূর্তে ক্ষিপ্ত হয়ে রামস্বরূপ অকাট্য প্রমাণ দিয়ে বসল—সে পাষাণও নয়, দেবতাও নয়—সে পুরুষ।

এরপর তিন-চার দিন আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারিনি। ছেলেটাও যে তার অপরাধের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল তা বুঝতে পারতাম—যখন ওর অর্ধভুক্ত থালাখানা ফিরিয়ে আনত বাড়ির ঝি। স্থির করলাম, যাই ঘটে থাক—ওর মুখোমুখি গিয়ে আমাকে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু সে সুযোগ হল না। ঘরে গিয়ে দেখি ও নির্জীবের মত পড়ে আছে। কপালে হাত দিয়ে দেখি—প্রচণ্ড জ্বর। যে কথা বলতে এসেছিলাম তা আর বলা হল না। ডেকে আনি ড্যাডিকে।

হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হল ওকে। সেখানে বোঝা গেল ওর বসন্ত হয়েছে। ওর দাদা ছুটে এলেন। আমার কেমন যেন মনে হল আমার পাপেই ওর এই শাস্তি! মনে কিছুতে শান্তি পাই না। যাই হোক, দীর্ঘ রোগ ভোগের পর যেদিন ওকে প্রথম দেখি সেদিন শিউরে উঠেছিলাম আমি! ওর মুখটা বীভৎস হয়ে গেছে! হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার দিন ঘনিয়ে এল। আমরা দেখা করতে গিয়েছিলাম। কোনও সঙ্কোচ করল না। নির্নিমেষ নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। এত লোকের সামনে কী আর বলব?

আমার জেদ দেখে ড্যাডি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন মনে আছে। ঐ বসন্তের দাগে ক্ষতবিক্ষত ছেলেটা—যার বিলেত যাবার স্বপ্ন আপাতত ঘুচে গেছে—মাথা নিচু করে যে গ্রামে ফিরে যেতে চাইছে তাকে ছাড়া আমি আর কাউকে বিয়ে করব না! স্তম্ভিত হয়ে গেলেন

রামবিলাসও। সকলে মিলে আমাকে অনেক বোঝালো—কিন্তু আমি আমার প্রতিজ্ঞায় অটল। শেষে ড্যাডির অনুমতি নিয়ে স্বয়ং রামস্বরূপ এল আমাকে বোঝাতে। আমি তার বুকে মাথা রেখে ফুলে ফুলে সেদিন কেঁদেছিলাম।

জেদী মেয়েটারই জয় হল। ফিরিঙ্গির কন্যাকে বিবাহ করার অপরাধে আমার স্বামীও জাতিচ্যুত হলেন। মাত্র উনিশ বছর বয়স তখন তাঁর। তিনিও অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। কিন্তু জাতিচ্যুত। ড্যাডিই তাঁকে একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন। কিন্তু মেয়ে-জামাই নিয়ে সংসার করার সৌভাগ্য তাঁর ছিল না। আমাদের বিয়ের বছরেই তাঁর দ্বিতীয়বার আক্রমণে তিনি স্বর্গে যান।

উনি কাজ নিয়েছিলেন ডাক বিভাগে। বদলির চাকরি। বিয়ের পর ক্রমে আমার মোহভঙ্গ হতে শুরু করল। ধারণা হল, উনি আমাকে ভালবেসে বিয়ে করেননি। যেন একটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই আমাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। যেন ওঁর জীবনের উদ্দেশ্যটাই বিফল হয়ে গেছে। ওঁর কিসের অভাব তা আমি বুঝতে পারতাম না, কিন্তু বুঝতাম—উনিও ভাবছেন আমি বাধ্য হয়ে ওঁকে বিবাহ করেছি। এটা যে সত্য নয় তা বুঝিয়ে দিতে পারতাম না। আমাদের দাম্পত্য-জীবনের মূলে বিদ্ধ হয়ে রইল সেই একদিনের অবিমৃষ্যকারিতার কাঁটা! আমার রূপ-যৌবন উপেক্ষিতই হয়ে রইল!

আমার প্রতি ওঁর এই অনীহার মূলটা যে কোথায় তা প্রথম টের পেলাম আমাদের বিয়ের পাঁচ বছর পরে। ইতিমধ্যে পনের বছরের কিশোরী পরিণত হয়েছে বিশ বছরের পূর্ণ যুবতীরূপে। পিতৃকূলে এবং শ্বশুরকুলে আমি প্রত্যাখ্যাত। একমাত্র অবলম্বন হতে পারত আমার স্বামী, যাঁর মনের নাগাল আমি তখনও পাইনি।

সেটা জানুয়ারী মাস। আমরা তখন অমৃতসরে। উনি অমৃতসরে ডাকঘরে বদলি হয়েছেন। সারাটা দিন ডাকঘরে বসে কাজ করেন। সন্ধ্যায় ফিরে এসে দুটি নাকে-মুখে গুঁজে বেরিয়ে যান। ফিরে আসেন গভীর রাত্রে। আমি ভাত আগলে বসে থাকি। গোগ্রাসে সেগুলো গিল্‌তে গিল্‌তেই ওঁর চোখের পাতা বুজে আসত। এঁটো ধুয়ে আমি যখন মশারি তুলে শুতে আসতাম তখন সমস্ত দিনের পরিশ্রমে লোকটা অঘোর ঘুমে অচেতন! ওঁর দু-একজন বন্ধুবান্ধব আসত—কিন্তু বসে আড্ডা দিত না। ফিস্‌ফাস কথা বলে সরে পড়ত। আমি নিতান্ত একলা—একেবারে নিঃসঙ্গ।

একদিন ওঁর একটা কুর্তা কাচতে নেবার সময় জামার পকেট থেকে উদ্ধার করলাম একটা খাম। মেয়েলি হস্তাক্ষর দেখে কৌতূহল হল। চিঠিটা ডাকে এসেছে। চিঠিখানা পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম! চিঠি লিখছে যে মেয়েটি তার নাম রুক্‌মিনী। তার নাম আমি স্বামীর মুখে কখনও শুনিনি। অনেক ভণিতা করে শেষের দিকে লিখছে—"তুমি বিয়ে করেছ, সংসারী হয়েছ, তাই তোমাকে পাওয়ার আশা আমি ত্যাগ করেছি। কিন্তু ছোঁওয়া বাঁচিয়েও তো তুমি আমাদের সেই প্রেমকে স্বীকার করতে পার? শোন, আমার স্বামী তোমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছেন। কে জানে হয়তো তোমার পিছনে টিকটিকিও লাগিয়েছেন। তোমার মাথা যাতে হেঁট না হয় সেটা খেয়াল রেখ। ডাকে আমাকে চিঠি দিও না। খুব সজাগ থেক। আমি আগামী বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় স্বর্ণমন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে 'ইম্পিরিয়াল ড্রাগ হাউস'-এর সামনে অপেক্ষা করব। তুমি এস, লক্ষ্মীটি! দু-একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে। ভয় নেই, রাতে স্ত্রীর কাছেই ফিরে যাবে। ইতি তোমারই রুক্‌মিনী।"

আমার মাথার মধ্যে আগুন ধরে গেল! এই মেয়েটাই তাহলে আমার অশান্তির মূল! এর জন্যই আমি আমার স্বামীকে পেয়েও পাইনি! কিন্তু কে ওই রুক্‌মিনী? সে কি স্বর্গের অপ্সরী? যার কথা অহরহ বুকে জেগে আছে বলে আমার স্বামী আমার দিকে তাকাবারও অবসর পান না! বোধহয় দশ মিনিট চুপ করে বসেছিলাম। তারপর খেয়াল হল, আজই তো বুধবার! মনে পড়ল, উনি দফ্‌তরে যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন—অফিস থেকে ফিরতে ওঁর রাত হবে। বিকালে জলখাবার খেতে আসবেন না।

তৈরী হয়ে নিলাম। ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে। আমার বাড়ি থেকে স্বর্ণমন্দির এমন কিছু দূরে নয়। অনেকবার গিয়েছি। পথ চিনতে আমার কোন অসুবিধা হয়নি। জানুয়ারীর শীত। তবু সন্ধ্যারাত্রে পথে লোকজন বেশ আছে। স্বর্ণমন্দিরে সান্ধ্য প্রার্থনা-সঙ্গীত তখনও শেষ হয়নি। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে। ইম্পিরিয়াল ড্রাগ হাউসের সাইন বোর্ডটা নজরে পড়ল—আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। ঐ তো আমার স্বামী! অস্থিরভাবে ঔষধের দোকানের সামনে পদচারণা করছেন! আপাদমস্তক জ্বলে গেল আমার। কী অধীর প্রতীক্ষা! একটা গাছের আড়ালে আমি অন্ধকারে সরে দাঁড়াই। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। স্বর্ণমন্দির থেকে যে সব পূজার্থিনী পাঞ্জাবী মহিলা বের হয়ে আসছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন স্থূলকায় পাঞ্জাবিনী এগিয়ে এলেন আমার স্বামীর কাছে। দূর থেকে তাঁদের কথোপকথন শুনতে পেলাম না—কিন্তু দেখলাম তাঁরা দুজনেই চক্‌বাবা আটলের দিকে চলতে শুরু করলেন। আমার স্বাভাবিক হতে একটু সময় লাগল। কারণ ছিল। আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর বয়স অন্তত ত্রিশ, তিনি পদ্মিনী, শঙ্খিনী নন—একেবারে হস্তিনী! একবার মনে হল এ নিশ্চয় রুক্‌মিনী নয়—তার দূতী।

চিন্তা করে কিছু করিনি। আমি ছুটতে ছুটতে চলে গেলাম ওঁদের কাছে। পিছন থেকে চীৎকরে করে উঠলাম : দাঁড়াও!

ওঁরা দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়েন। আমার স্বামী স্তম্ভিত। পাঞ্জাবী মহিলাটিও বিব্রতা। আমার স্বামী এসে আমার বাহুমূল চেপে ধরে বলেন, তুমি কেমন করে এলে এখানে?

আমি চাপা গর্জন করে উঠি : ওটা আমার প্রশ্নের জবাব নয়! এরই নাম রুক্‌মিনী! এরই প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে...

—চুপ কর। রাস্তার মধ্যে একটা কেলেঙ্কারি কর না!

পাঞ্জাবী মহিলাটি আমার স্বামীকে প্রশ্ন করেন, তোমার ঔরৎ?

—হ্যাঁ! —মাথা নিচু করে অপরাধটা স্বীকার করেন উনি।

—আজ আমি তাহলে চলে যাই বরং!

আমি আবার গর্জন করে উঠি : না! বলে যাও, তুমিই রুক্‌মিনী?

মহিলাটি ফিরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিলেন। কী ভেবে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। ওঁর দিকে ফিরে বলেন—ব্যাপারটা তোমার স্ত্রীকে না জানালে সর্বনাশ হতে পারে। একটা টাঙা ধর। তোমার বাড়িতেই যাব।

তারপর আমার দিকে ফিরে বলেন, বহিনজী! রাস্তার মধ্যে সীন কর না। আমি তোমাদের বাড়িতেই যাচ্ছি। এখানে তুমি খালি হাতে আছ, বাড়িতে চ্যালাকাঠের অভাব হবে না। কিন্তু একটা কথা! টাঙাতে তুমি কোন কথা বলবে না। তোমার স্বামী অমৃতসরের একজন মানী লোক।

বাড়িতে পৌঁছে ঘরে ঢুকে ভদ্রমহিলা ভিতর থেকে দরজায় খিল দিলেন। তারপর আমার স্বামীকে বললেন, দু-দিন খাওয়া হয়নি, দু-রাত্রি ঘুমও হয়নি। তোমার বউকে বল রান্না চাপিয়ে দিতে! আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। ততক্ষণে তোমাকে বউকে বুঝিয়ে দেও আমি লোকটা কে।

আমাদের অনুমতির অপেক্ষা না করেই উনি গটগট করে আমাদের শোবার ঘরে ঢুকে গেলেন। পট করে মাথা থেকে খোঁপা-সমেত পরচুলোটা খুলে ফেলে দিলেন মাটিতে। চৌকিতে উঠে কম্বলটা টেনে নিয়ে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিলেন। আমার বাক্যস্ফূর্তি হবার আগেই সগর্জনে ওঁর নাসিকা ঘোষণা করল রুক্‌মিনী দেবী নিদ্রাগত!

স্তম্ভিত হয়ে স্বামীকে প্রশ্ন করি—উনি কে? কী নাম?

দু-টি হাত কপালে ছুঁইয়ে উনি সংক্ষেপে বললেন ওঁর আসল নাম জানি না—লেকিন বহ্ হ্যয় মেরা গুরু! মেরা দেওতা!

ঘণ্টা-তিনেক ঘুমিয়ে উনি উঠে বসলেন। এর মধ্যে আমার পুনর্জন্ম হয়েছে। আমার স্বামী সব কথা খুলে বলেছেন আমাকে। আমি বসে বসে রান্না করেছি, আর উনি অদূরে বসে গল্প করে গেছেন—কেমন করে উনি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন আমার স্বামীকে। ঐ গুরুজীর নির্দেশেই তিনি সাগর পারে যাচ্ছিলেন ভারত-উদ্ধারের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র আমদানি করতে। আমার স্বামী মরণাপন্ন অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওঁর বদলে কেদাররেশ্বর গুহ নামে একজন বাঙালী সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন। তিনি সফলকাম হয়ে সম্প্রতি ফিরে এসেছেন। তার ফলশ্রুতি ইন্দো-বার্লিন চুক্তি। জার্মানী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত। ঐ যে অদ্ভুতদর্শন লোকটা মাথার পরচুলখোলা আমার খাটে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে সেই নাকি এই বিপ্লবের নেতা। তার ঐ পটচুল খুলো মাথার দাম,—এবং লাখটাকা!

ঘুম থেকে উঠেই উনি বললেন, কই হে রামস্বরূপ, তোমার বউ-এর রান্না হয়েছে? বড্ড খিদে পেয়েছে যে!

আমার স্বামী ছুটে গেলেন ও ঘরে। আমিও ঘোমটা মাথায় ওঁর পিছু পিছু। কী বিচিত্র দেখাচ্ছিল ওঁকে! কৃত্রিম পীনোদ্ধত বক্ষের উপর পুরোহাতা জ্যাকেট, পরনে সালওয়ার, হাতের কাচের চুড়ি, মাথায় পরচুলো নেই। আমাকে দেখে কোন লজ্জা পেলেন না উনি। হেসে বললেন, কী রে, পাগলি! কই, তোর চ্যালাকাঠ কই?

আমি গড় হয়ে প্রণাম করলাম ওঁকে।

সেই ওঁকে প্রথম দেখি!

তারপর কতবার ওঁকে দেখেছি। এসেছেন আমাদের বাড়ি। খেয়েছেন, থেকেছেন। ওঁর আসল নামটা জানতাম না। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনাকে কি বলে ডাকব?

হেসে বলেছিলেন, তুই তো আমার সতীন রে! 'সতীন' বলে ডাকবি!

আমি ওঁকে ডাকতাম বড়দা বলে।

বড়দার আবির্ভাবের পরেই আমি আমার স্বামীকে পুরোপুরি পেলাম। আমাদের দুজনের মধ্যে যে ব্যবধান, যে অন্তরায়টা ছিল সেটা ঘুচে গেল। আমার স্বামী তাঁর আসল পরিচয়টা আমাকে দিতে পারছিলেন না। সেই মন্ত্রগুপ্তিই ওঁকে অপরাধী করে রেখেছিল। এখন সে বাধা ঘুচে গেল। বড়দা একবার বলেছিলেন, হ্যাঁ রে সতীন, তোর মরদকে আমি যে এইসব কাজে লাগাচ্ছি এতে তোর আপত্তি নেই তো? যে-কোনদিন কিন্তু ওর হাতে হাতকড়া

পড়তে পারে। ওকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিতে পারে!

জবাবে বলেছিলাম, আমার একমাত্র দুঃখ—আমাকে আপনি কোন কাজ দেন না।

—দেব রে দেব। সময় হলেই ডাকব তোকে।

সেই সময় এল অচিরেই। কিন্তু সে কথা বলার আগে বড়দার জীবনের বাকি কাহিনীটুকু আপনাদের জানা দরকার। সুনীলবাবু তাঁর জবানবন্দী কোথায় শেষ করেছিলেন যেন? সেই কলকাতা থেকে বাবাকে চিঠি লিখে বড়দা বেনারসে চলে এলেন, উনিশ শ'চোদ্দ সালের মাঝামাঝি। হ্যাঁ, তারপর:

কাশীতে গোটা একটি বছর ছিলেন রাসবিহারী। ক্রমাগত বাড়ি বদলে।

পুলিশ তাঁর সন্ধান পায়নি পুরো একটি বছর। এখানেই বোমা বিস্ফোরণে তিনি একবার আহত হয়ে পড়েন।

একদিন ওঁদের দেবনাথপুরার বাসা-বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় ঘটল একটা ঘটনা। বাইরের ঘরে বসে চারজনে তাস খেলছেন মাদুর পেতে। সামনে কলাই-করা বাটিতে মাখা মুড়ি। তাস খেলছেন যাঁরা তাঁরা সকলেই কাশীর বাসিন্দা। যুবক-সমিতির শচীন সান্যাল, তাঁর মেজভাই রবীন্দ্র, বিভূতি হালদার আর নলিনী মুখুজ্জে। এছাড়াও খেলা দেখছেন নরেন বাঁড়ুয্যে, প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য আর আশুতোষ রায়। এঁরা সকলেই কাশীর গুপ্ত-সমিতির সভ্য। বাইরের ঘরে এই তাসের আড্ডাটি অবশ্য একটা আছিলা—ভিতরে চলছে আসল কাজ।

হঠাৎ বাইরে কিশোর-কণ্ঠে রামপ্রসাদী : 'এবার কালী তোমায় খাব।'

'চোখে চোখে' কথা হয়ে গেল। অপরিচিত কেউ বা বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। কণ্ঠস্বর ভূপেন্দ্রর—অর্থাৎ শচীন সান্যালের সর্বকনিষ্ঠ দ্বাদশবর্ষীয় ভ্রাতার। ঐ বয়সেই সে পাহারায় থাকার দায়িত্ব পেয়েছে।

অনতিবিলম্বে সদর দরজায় কড়া নাড়ল কেউ। বিভূতি হালদার উঠে দরজা খুলে দিলেন। আগন্তুক বছর চব্বিশ-পঁচিশের একটি ছেলে। পরনে স্যুট, গলায় টাই, মাথায় হ্যাট। সম্পূর্ণ অচেনা আগন্তুক, পরিষ্কার ইংরাজীতে প্রশ্ন করলেন, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল কার নাম?

শচীন উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি। কোথা থেকে আসছেন আপনি?

—কলকাতা থেকে। আপনার সঙ্গে কথা ছিল। একটু বাইরে আসবেন?

শচীন্দ্রনাথ নীরবে উঠে আসেন। বাইরে গলি-পথে দাঁড়িয়ে আগন্তুক বললে, নরেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই। তিনি কি এখানে আছেন?

শচীন সান্যাল ততদিনে রাসবিহারীর ডান-হাত হয়ে উঠেছেন। রাসবিহারীর এই সাম্প্রতিক ছদ্মনামটা জানা ছিল তাঁর। বললেন, নরেন্দ্রনাথ সেন? ঠিক চিনতে পারছি না তো! কার কাছ থেকে আসছেন আপনি? কী দরকার?

আগন্তুক হাসল। বললে, আমারই ভুল। সে কথাটা আগেই ঘোষণা করা উচিত ছিল আমার। আমি আসছি স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে—যাঁকে আপনারা বলেন বাঘা-যতীন।

শচীন্দ্রনাথের ভ্রূতে একটা কুঞ্চন মুহূর্তমধ্যে মিলিয়ে গেল। বললেন, আপনাকে আমি চিনি না, কিন্তু বাঘা-যতীনের নাম শুনেছি। আমি শুনেছি, সামশুল আলম হত্যায় তাঁকে একবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আপনি যে টিকটিকি নন এবং আমাদের ফাঁসাতে আসেননি তা বুঝব কি করে? আপনার নাম কি?

—আমার নাম বিষ্ণুগণেশ পিংলে। আমি মহারাষ্ট্রীয়। যতীনবাবুর ইনট্রোডাক্টরী চিঠি আমার কাছে আছে; কিন্তু সেটা আপনাকে দেখাতে পারব না। আমার উপর নির্দেশ আছে—চিঠিখানা নরেন্দ্রনাথ সেনের হাতে দিতে। আমাকে যতীনবাবু এই ঠিকানা দিয়ে বলেছিলেন এখানকার শচীন স্যান্যাল নরেন্দ্রবাবুর সন্ধান দিতে পারবেন।

কি করা উচিত বুঝে উঠতে পারেন না শচীন। ছেলেটি যা বলেছে তা সত্য হতে পারে। হয়তো ও সত্যই বিপ্লবী, কলকাতা থেকে এতটা পথ এসেছে রাসবিহারীর সঙ্গে দেখা করতে, বাঘা-যতীনের কোন জরুরী নির্দেশ নিয়ে। আবার এ পুলিসের চরও হতে পারে! রাসবিহারীর মাথার উপর পুরস্কারটা তখনও ঝুলছে—হয়তো তাঁর এই নতুন ছদ্মনামটা পুলিস জানতে পেরেছে। এ একটা টোপও হতে পারে। কী জবাব দেবেন স্থির করে ওঠার আগেই ঘরের ভিতর থেকে বার হয়ে এল জিতেন্দ্র—ওঁর তৃতীয় ভ্রাতা। বললে, বড়দা, মা একটু ভিতরে ডাকছেন।

প্রথমটা চম্‌কে উঠেছিলেন শচীন্দ্রনাথ, ওদের মা এ বাসা-বাড়িতে থাকেন না। এটার বাহ্য পরিচয়—মেস-বাড়ি। কিন্তু মুহূর্তে বুঝে ফেলেন 'মা' এখানে স্বয়ং রাসবিহারী। তিনি আছেন ভিতরে। পিংলেকে গলির মুখে রেখে শচীন্দ্রনাথ ভিতরে গেলেন এবং একটু পরে ফিরে এসে পুনরায় জেরা শুরু করলেন তিনি, আপনার নাম বিষ্ণুগণেশ পিংলে?

—হ্যাঁ, এখনি তো বললাম।

—কোন্ স্কুলে পড়তেন আপনি?

—কোন্ স্কুলে পড়তাম? তা জেনে আপনার কি লাভ?

—তবু বলুন না।

—পুণার আর্যসমাজে।

—আপনার সহপাঠী একটি বাঙালী ছেলে, চন্দননগরে বাড়ি.....

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পিংলে বললে, হ্যাঁ, কানাইলাল দত্ত। নরেন গোঁসাইকে খুন করে যে শহীদ হয়েছে।

শচীন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ বাড়িয়ে দিলেন তাঁর ডান হাত। বললেন, আসুন, নরেন্দ্রনাথ সেন এ বাড়িতেই আছেন।

বসন্ত বিশ্বাস গেছে। এল বিষ্ণুগণেশ পিংলে। রাসবিহারীর নূতন অনুচর। একটি আগুনের ফুল্‌কি। উনিশ বছর বয়সে সে চলে যায় আমেরিকায়। সিয়াট্‌ল্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এঞ্জিনিয়ারিং পাস করে গদর-আন্দোলনের সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়ায়।

ভারতবর্ষে ফিরে এসেই বিপ্লবী-দলে নাম লেখায়। বাঘা-যতীনের নির্দেশে সে এসেছে নরেন্দ্রনাথ সেনের কাছে—অর্থাৎ রাসবিহারীর কাছে।

পিংলের কাছেই রাসবিহারী প্রথম শুনলেন—মার্কিন-মুলুক থেকে কয়েক হাজার পাঞ্জাবী ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেছে। কোমাগাটামারু জাহাজের যাত্রীদলের নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথাও শুনলেন। মার্কিন মুলুকে হরদয়াল, খান্‌খোজে, তারক দাস প্রভৃতি গদর দলের মাধ্যমে কীভাবে আন্দোলন চালিয়েছিলেন তার একটা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাওয়া গেল। রাসবিহারী বুঝলেন, এই পিংলে তাঁর হাতে এসেছে এক ঈশ্বরদত্ত ব্রহ্মাস্ত্ররূপে।

দু-দিন পরেই পিংলে এবং শচীন্দ্রনাথ চলে গেলেন পাঞ্জাবে। বিক্ষুব্ধ পাঞ্জাবকে নেতৃত্ব দিতে হবে। মাস কয়েক আগে, উনিশ শ'চৌদ্দর অক্টোবরে মার্কিন-মুলুক এবং কানাডা থেকে

বিতাড়িত কয়েক হাজার পাঞ্জাবী এসে সমবেত হয়েছে পাঞ্জাবে। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তাদের তীব্র বিদ্বেষ। বিদেশ থেকে বিতাড়িত এবং দেশে অনাদৃত এই সব পাঞ্জাবী ছোট ছোট দল পাকালো। এখানে সেখানে লুটতরাজ শুরু করল। এই সুযোগ! এদের এক নেতৃত্বের অধীনে আনতে হবে। পিংলে প্রথমে এলেন কাপুরতলায়। সেখানে তিনি মিলিত হলেন বিক্ষুব্ধ পাঞ্জাবী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে—অমর সিং, নিধন সিং, কর্তারসিং, ভাই পরমানন্দ এবং রামশরণ দাসের সঙ্গে। পিংলে তাঁদের বোঝালেন এমন বিক্ষিপ্ত আন্দোলনে শক্তিক্ষয় ছাড়া কিছুই লাভ হবে না। চাই একযোগে সুপরিকল্পিত বিপ্লব। পিংলে ওঁদের বললেন, সেই কাজে নেতৃত্ব দিতে একজন মহাবিপ্লবী বাঙালী নেতা শীঘ্রই পাঞ্জাবে আসবেন। ওঁরা মন দিয়ে শুনলেন। দু-দিন পরে অমৃতসরে বীরপল্লী ধর্মশালায় এক গোপন বৈঠক বসল। সেটা হচ্ছে উনিশ শ'চৌদ্দ সালের শেষ দিন, একত্রিশে ডিসেম্বর। সেদিন ঐ ক-জন ছাড়া আরও কয়েকজন পাঞ্জাবী নেতা উপস্থিত ছিলেন বৈঠকে; যথা—হরনাথ সিং, বলবন্ত সিং, মুলা সিং, সুরেন সিং, জগৎগৎ সিং এবং উপস্থিত ছিলেন—যাঁর নাম এ কাহিনীতে রামস্বরূপ শুকুল।

পিংলের প্রস্তাব ওঁরা মেনে নিলেন—সকলে এক নেতৃত্বের অধীনে আসতে প্রস্তুত। কিন্তু কে সেই বাঙালী নেতা? কেমন করে বোঝা যাবে তিনি এই পাঞ্জাবী শার্দুলদের পরিচালনা করতে পারবেন। কী নাম তাঁর?

পিংলে গম্ভীর হয়ে বলেন, তাঁর পিতৃদত্ত নাম আমি জানি না, কিন্তু এটুকু জানি তাঁর মাথার পিছনে এক লাখ টাকা ঘোষণা করেছে বেনিয়ার বাচ্চা ইংরেজ সরকার। লক্ষ টাকার অঙ্কটা ছেলেখেলা নয়! তাই সর্বসমক্ষে তাঁর নাম বা পরিচয় আমি দিতে পারবো না। আপনাদের কাউকে আমি অবিশ্বাস করছি না—কিন্তু বিপ্লবীর পথ বড় বন্ধুর। তাদের একটা 'কোড অব এথিক্স্' আছে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের পরিচয় জানবে না। আপনারা যে কোন তিনজন নেতাকে নির্বাচিত করে দিন। আমি ঐ বাঙালী নেতার সঙ্গে তাঁদের তিনজনের সাক্ষাৎ করিয়ে দেব।

কর্তার সিং হেসে বলেন, ভাইসাব, ঐ লাখ টাকার অঙ্কটায় আমার মনে পড়ে যাচ্ছে—দিল্লির একটা ঘটনা। দু-বছর আগেকার। আপনি কি তাঁর কথাই বলছেন?

পিংলে আরও গম্ভীর হয়ে বলেন, বড় ভাই, আপনি আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।

এর বারো দিন পরে পিংলে এবং শচীন সান্যালের হাতে অমৃতসরের সর্বজনবরেণ্য নেতা মূলা সিং, নগদ পাঁচশ টাকা তুলে দিয়ে বলেন, বাবুজী, আপনি বঙ্গালকা শেরকে নিয়ে আসুন। আমরা তাঁর নেতৃত্ব অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিতে প্রস্তুত।

—এত টাকা কি হবে?—বিস্মিত শচীন্দ্রনাথের প্রশ্ন।

—আমাদের নেতার পথ খরচ। লাখ টাকা যাঁর মাথার দাম তাঁর চরণ জোড়া চালু করতে অন্তত পাঁচশ টাকা লাগা উচিত!

হা-হা করে ঠারে ঠারে হাসলেন মূলা সিং।

পিংলে এবং শচীন্দ্রনাথ অনতিবিলম্বে কাশীতে ফিরে গেলেন। ইতিমধ্যে রাসবিহারীকে

বাড়ি বদল করতে হয়েছে। হরিশ্চন্দ্রঘাট রোডের নূতন বাড়িতে সেদিন বসল আবার এক গোপন বৈঠক। এই গোপন বৈঠকেই রাসবিহারী প্রথম ঘোষণা করলেন, ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি—অর্থাৎ মাত্র একমাস পরে সর্বভারতীয় বিপ্লব শুরু হবে। সমস্ত রাত বৈঠক চলল। সমস্ত কার্যসূচী ছকে ফেলা হল। সেই মিটিঙে উপস্থিত ছিলেন শচীন্দ্রনাথ, দামোদর স্বরূপ, পিংলে, নরেন বাঁড়ুয্যে, বিনায়ক রাও কাপ্‌লে, যমুনা দাস আর বিভূতি হালদার। রাসবিহারী যে কর্মসূচী প্রণয়ন করলেন তা মোটামুটি এই রকম :

(১) নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য পরদিনই কলকাতা চলে যাবেন। প্রিয়নাথ বাঘা যতীনের সঙ্গে যোগাযোগ করে মারণাস্ত্র সংগ্রহ করবেন এবং নরেন্দ্রনাথ চন্দননগর থেকে কালী বোমা সংগ্রহ করবেন। সাতদিনের মধ্যে ওঁরা কাশীতে সেগুলি নিয়ে আসবেন।

(২) কাশী থেকে সেগুলি পাঞ্জাবে নিয়ে যাবেন বিনায়ক রাও কাপ্‌লে এবং হেমচন্দ্র দত্ত।

(৩) কে কোন এলাকায় কাজ করবেন তাও ছকে ফেলা হল; যথা—দামোদর স্বরূপ প্রয়াগে, বিভূতি আর প্রিয়নাথ যাবেন বেনারসের সৈন্যবাহিনীর ছাউনিতে, নলিনী যাবেন জব্বলপুর ক্যান্টনমেন্টে, বিনায়ক কাপ্‌লে পাঞ্জাবে মাল পৌঁছে ফিরে আসবেন এবং চলে যাবেন কানপুরে। কালীপদ মুখোপাধ্যায় আর আনন্দ ভট্টাচার্য থাকবেন কাশীতে, রিসার্ভ ফোর্সে। অ্যাক্‌শনে কেউ মারা গেলে শূন্যপদ পূর্ণ করতে ছুটবেন তাঁরা।

(৪) রাসবিহারী তাঁর দুই প্রধান সহচর পিংলে আর শচীন সান্যালকে নিয়ে চলে যাবেন অমৃতসরে। গদর দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলে তিনি বিপ্লব-অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত দিন স্থির করবেন এবং প্রত্যেককে জানাবেন।

এইসব করতে করতে রাত শেষ হয়ে এল। তবু রাসবিহারী মিটিং ভাঙলেন না। কীভাবে নিজে অক্ষত থেকে ব্রীজ উড়িয়ে দেওয়া যায়, ইলেকট্রিক শক না খেয়ে বৈদ্যুতিক তার কেটে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা যায়, কীভাবে রেলের ফিশ্-প্লেট খুলে রেলগাড়িকে লাইনচ্যুত করা যায় তা ছবি এঁকে এবং বর্ণনা দিয়ে সকলকে বুঝিয়ে দিলেন।

পরদিন নরেন্দ্র আর প্রিয়নাথ রওনা হলেন পূর্ব-মুখে, পিংলে আর শচীন্দ্রনাথ পশ্চিম-মুখো। সময় বাকি আছে মাত্র একমাস। এর মধ্যেই সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। অমৃতসরে হবে রাসবিহারীর কেন্দ্রীয় ঘাঁটি। সেখানে একটা বাড়ি ভাড়া করে পিংলে ফিরে আসবেন কাশীতে। নিয়ে যাবেন রাসবিহারীকে।

প্রিয়নাথের মুখে রাসবিহারীর অভ্যুত্থানের কথা শুনে বাঘা যতীন তৎক্ষণাৎ একজন দূতকে পাঠিয়ে দিলেন বেনারসে। যতীন্দ্রনাথের মতে অভ্যুত্থান আরও মাস ছয়েক পেছিয়ে দেওয়া উচিত। বাঘা-যতীনের বিশেষ দূত এসে রাসবিহারীর কাছে আত্মপরিচয় দিলেন। রাসবিহারী পশ্চিমা মাঝির বেশে গঙ্গায় নৌকো বাইছিলেন। শচীন্দ্রনাথ আগন্তুককে পৌঁছে দিয়ে এলেন চৈত সিং-এর ঘাটে। শচীন্দ্র আর অচেনা বাঙালী ডেংচিবাবুকে দেখে হৃষ্টপুষ্ট পশ্চিমা মাঝি সালাম করে আমন্ত্রণ জানালো: আঁই, আঁই রউয়ে ইধার পাধারিয়ে!

মাথার গামছা খুলে সে পাটাতনের একটা অংশ সযত্নে মুছে দেয়। শচীন্দ্রনাথ আগন্তুককে

নিয়ে নৌকোয় উঠে বসেন। আগন্তুক বিস্ফারিত নয়নে দেখছিলেন বলিয়া জেলার ঐ মাঝিটাকে। মাথায় গামছার পাগড়ি বাঁধা ছিল এতক্ষণ, পাগড়িটা খুলে ফেলায় বের হয়ে পড়ল দীর্ঘায়ত অর্কফলা। কে বলবে—ঐ শিখা-সমন্বিত কদমফুলছাঁট মাথাটার দাম এক লক্ষ টাকা!

আগন্তুক আত্মপরিচয় দিলেন। অনুশীলন সমিতির কেদারেশ্বর গুহ। যে বছর রাসবিহারী দিল্লিতে বোমা ফেলেন সেই বছর তিনি অনুশীলন সমিতির সত্যকারের নরেন সেনের নির্দেশে জার্মান মুলুকে পালিয়ে যান। প্রবাসী বিপ্লবীরা জার্মান সরকারের কাছ থেকে এতদিনে প্রতিশ্রুতি আদায় করেছেন—ইন্দো-বার্লিন সমিতি গঠিত হয়েছে। জার্মানীর সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম বছর সেটা। মাত্র কয়েকমাস হল বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ভারতবর্ষ হচ্ছে ইংরেজ পক্ষের রত্নভাণ্ডার। তাই জার্মানী সর্বান্তঃকরণে ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য করতে আজ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কেদারেশ্বর গুহের সহপাঠী ধীরেন সরকার বিপ্লবীদের খরব পাঠিয়েছেন—অনতিবিলম্বে এক জাহাজ মারণাস্ত্র নিয়ে একটি জার্মান যুদ্ধ জাহাজ বঙ্গোপসাগরে—উড়িষ্যার উপকূলে অথবা সুন্দরবন অঞ্চলে এসে পৌঁছবে। কেদারেশ্বর তাঁর আঙরাখার ভিতর থেকে সযত্ন-রক্ষিত একটি পত্র মেলে ধরেন। নৌকার মাঝি একটি টর্চ জ্বেলে চিঠিখানা পড়ে ফেলেন। চিঠি লিখেছে অনুশীলন সমিতির অনুকূল চক্রবর্তী বা অনুকূল ঠাকুর। তিনি রাসবিহারীকে অনুরোধ জানিয়েছেন—জার্মান অস্ত্রশস্ত্র এসে পৌঁছানোর আগে সর্বভারতীয় অভ্যুত্থান যেন শুরু করা না হয়।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে রাসবিহারী অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন। শচীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে দাঁড়-জোড়া হাতে তুলে নিয়েছেন। ছপছপ করে নৌকা এগিয়ে চলেছে। বেণীমাধবের ধ্বজার চূড়ায় শোনা গেল সান্ধ্য আজান ধ্বনি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাসবিহারী বলেন, যতীন্দ্রনাথ কী বলেন?

কেদারেশ্বর জবাব দেন, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। যতদূর জানি, তিনি অনুকূলবাবুর সঙ্গে একমত। আপনি অভ্যুত্থানের তারিখ পিছেয়ে দিন।

মাথা নেড়ে রাসবিহারী বলেন, তা আজ আর সম্ভবপর নয় ভাই কেদার। পাঞ্জাব এখন একটা আগ্নেয়গিরি। মার্কিন-মুলুক থেকে বিতাড়িত কয়েক হাজার পাঞ্জাবী সেখানে আজ বিক্ষুব্ধ-চঞ্চল। তারা ফেটে পড়তে চাইছে। আমরা নির্দেশ দিই আর না দিই বিস্ফোরণ একটা হবেই। আমরা সহযোগিতা না করলে কয়েকটা বিচ্ছিন্ন বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্টায় কয়েক'শ পাঞ্জাবী প্রাণ দেবে—অপরপক্ষে আমরা নেতৃত্ব দিল সেটা একটা সুপরিকল্পিত বিপ্লবে রূপান্তরিত হতে পারে। তা ছাড়া য়ুরোপের-রণাঙ্গনে কাইজার যতই আধিপত্য বিস্তার করুক—সমুদ্র শাসন আজও করছে ইংরেজ। এতটা সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে কোন জার্মান জাহাজ অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ভারতবর্ষে আদৌ পৌঁছাতে পারবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। আমি আমার পরিকল্পনা পিছিয়ে দিতে পারব না। ওঁদের বল।

রাসবিহারীর কাছে এরপর ছুটে এলেন অনুকূল চক্রবর্তী আর নগেন দত্ত (ছদ্মনাম—গিরিজাবাবু)। তাঁরা এসে দেখলেন, ইতিমধ্যে পিংলে পাঞ্জাব থেকে ফিরে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে কাশীতে এসেছেন সর্দার কর্তার সিং। অভ্যুত্থানের যাবতীয় পরিকল্পনা ঘড়ির কাঁটা

ধরে এগিয়ে চলেছে। অনুকূলের অনুরোধে রাসবিহারী কর্ণপাত করলেন না—বরং তাঁকে অনুরোধ করলেন যেন পাঞ্জাবে অভ্যুত্থান শুরু হলেই বাঙলায় তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়—এমন অবস্থা করতে। ওঁরা দুজনে বাধ্য হয়ে বাঙলায় ফিরে এলেন।

গিরিজাবাবু নিলেন কলকাতার দায়িত্ব—অনুকূলচন্দ্র চলে গেলেন ঢাকায়। সংবাদ পাঠানো হল রাজসাহী কেন্দ্রের অধিনায়ক নলিনীকান্ত ঘোষের কাছে। মালদা, কুচবিহার, দিনাজপুর কেন্দ্রেও চলে গেল গোপন বার্তা। মুসলমানপাড়ায় বোমা বিস্ফোরণের পর প্রফুল্লকুমার বিশ্বাস চলে গেলেন পাটনায়—দানাপুর ক্যান্টনমেন্টে অভ্যুত্থানের বন্দোবস্ত করতে।

দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে ব্যবস্থা। কিন্তু সেটা মনঃপূত নয় বাঙলার অবিসংবাদিত নেতা যতীন্দ্রনাথের। অবশেষে বাধ্য হয়ে স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ এলেন কাশীতে। সঙ্গে তাঁর একান্ত অনুচর নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—ভবিষ্যৎ এম. এন. রায় আর অতুলকৃষ্ণ ঘোষ।

আবার গঙ্গাবক্ষে হল বিপ্লবীদের সম্মেলন।

রাসবিহারী কিন্তু তাঁর সঙ্কল্পে অটল। বললেন : যতীনদা! এ বিশ্বযুদ্ধও যেমন রাতারাতি মিটবে না, আমাদের মুক্তি-সংগ্রামও তেমনি রাতারাতি সফল হবে না। আমি চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি—ক্ষেত্র প্রস্তুত। আমরা নেতৃত্ব না দিলে ঐ বিক্ষুব্ধ পাঞ্জাবীরা নিজেরাই একটা বিস্ফোরণ ঘটাবে। ওরা আপনার-আমার মত ডিসিপ্লিনড বিপ্লবী নয় যে, নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত মুখ বুজে মাসের পর মাস প্রতীক্ষা করবে।

যতীন্দ্রনাথ উত্তেজিত হয়ে বলেন, কিন্তু কয়েক ডজন রিভলবার আর বোমা নিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যদলকে পরাস্ত করা যায় না রাসবিহারী।

রাসবিহারী হেসে বলেন, ও কথাটা আমিই আপনাকে একদিন বলেছিলাম যতীনদা।

—তাহলে জার্মান জাহাজ এসে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছ না কেন?

—ঐ যে বললাম! এখন প্রতিটি দিন মূল্যবান। বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষ যে শুধু রসদ যুগিয়ে যাচ্ছে ইংরেজদের তরফে! অবিলম্বে একটা অভ্যুত্থান হলে সেই যুদ্ধ প্রচেষ্টা প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হবে। ইংরেজ আমার জন্মশত্রু, তাই জার্মানী আজ আমার বন্ধু! আমি শুরু করি—আপনি না হয় শেষ করবেন!

যতীন্দ্রনাথ বাধ্য হয়ে সম্মত হলেন।

জানুয়ারীর মাঝামাঝি পিংলের সঙ্গে রাসবিহারী এলেন অমৃতসরে। ইতিমধ্যে চকবাবা-আটলে মুশ্যামৎ আত্রির বাড়িতে তার গোপন ঘাঁটি খোলা হয়েছে। সেখানে থাকেন ওঁরা দুজন। গোপন বৈঠক বসে সন্ত গুলাব সিং-এর ধর্মশালায়। রামশরণ দাস, রামস্বরূপ শুকুল আর অমর সিং-এর উপরও ভার পড়ল একের পর এক বোমা বানিয়ে যাবার। দিন-তিনেক পরেই এসে যুক্ত হলেন শচীন সান্যাল। সঙ্গে বিস্কুটের টিন। তাতে কালী মায়ের প্রসাদী বোমা ভর্তি—চন্দননগর থেকে উপহার পাঠিয়েছেন শ্রীশচন্দ্র। মণীন্দ্র নায়েকের হাতে গড়া মুচমুচে খাসা বিস্কুট!

এসব কথা আমি জেনেছিলাম আমার স্বামীর কাছ থেকে। আগেই বলেছি, রাসবিহারীকে আমি প্রথম দেখি জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে স্বর্ণমন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে। মাত্র একদিনের জন্য তিনি সেবার অমৃতসরে এসেছিলেন। আমার স্বামীর উপর একটি বিশেষ কাজের ভার

দিতে। কাজটা ছিল সম্পূর্ণ সরকারী। আমার স্বামী ছিলেন অমৃতসর ডাকঘরের টেলিগ্রাফ কর্মী। তাঁকে উনি কতকগুলি ঠিকানা দিয়ে গেলেন। প্রয়োজন-বোধে কোথায় কাকে কি ভাষায় তার করতে হবে তাই বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন।

এর দিন পনের পরেই উনি এসে উঠলেন মুশ্যামৎ আত্রির ডেরায়। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কাজকর্ম এগিয়ে চলেছে। ক্যান্টনমেন্টে ক্যান্টনমেন্টে চলছে গোপন প্রচার। বিপ্লব ঠিক কবে শুরু হবে তা তখনও কেউ জানে না। শুধু প্রস্তুতি-পর্ব চলেছে। সবাই অবশ্য জানে, সময় আছে মাত্র এক মাস।

তারিখটা মনে আছে। ফেব্রুয়ারীর তিন তারিখ। আমার স্বামী এসে জানালেন, কয়েকজন মেহ্মানকে নৈশভোজে তিনি আপ্যায়ন করেছেন। বলাবাহুল্য তাঁদের মধ্যে থাকবেন স্বয়ং বড়দা।

আমি সারাদিন রান্না নিয়ে হিমসিম। উনি দফ্তর আর গুপ্তচক্রান্ত নিয়ে এতই ব্যস্ত যে, বাজারটা পর্যন্ত করে দিয়ে গেলেন না। তাতে অসুবিধা নেই। অমৃতসরে পাঞ্জাবী মেয়েরা নিজেরাই বাজার করে। আমি কিনে আনলাম আনাজপত্র; অমৃতসরে জলকষ্ট ছিল—তবু বিকালে আমার গা ধোওয়ার অভ্যাস। কী শীত, কী গ্রীষ্ম! রান্নাবান্না সেরে গা ধুয়ে নিলাম। সালোয়ার-পাঞ্জাবী নয় আজ পরলাম শাড়ি। জামরঙের। ঐ রঙেরই জ্যাকেট। কপালে কুমকুমের টিপ।

সন্ধ্যায় এসে উপস্থিত হলেন অতিথিবৃন্দ। আমি পর্দানসীন নই। ছেলেবেলা থেকেই বাইরের লোকের সামনে বের হতে অভ্যস্ত। পরিচয় হল আগন্তুকদের সঙ্গে। দশাসই আকৃতির একজন পাঞ্জাবী, নাম শুনলাম সর্দার মূলা সিং। এই অমৃতসরেরই লোক। সম্প্রতি আমেরিকা থেকে এসেছেন। সেখানে গদর পার্টিতে উৎসাহী কর্মী ছিলেন। একজন অতি সুশ্রী যুবক, বাঙালী—তাঁর নাম সত্যেনবাবু। বয়সে আমার চেয়ে ছোটোই হবেন। টক্‌টক্ করছে গায়ের রঙ। চুলগুলি কোঁকড়ানো। চোখে স্বপ্নালু দৃষ্টি! আমার দিকে তাকিয়ে হাত তুলে নমস্কার করলেন। বড়দার গায়ে আজ একটা গলাবন্ধ কোট। পরনে পাৎলুন। মাথায় কালো গোল টুপি। ঝোলা গোঁফ আর কালো ফ্রেমের চশমায় চেনাই যায় না তাঁকে।

ওঁরা বাইরের ঘরে বসলেন। মাংসটা বসিয়ে এসেছি। নরম আঁচে গুমেগুমে সিদ্ধ হচ্ছে সকাল থেকে। মাঝে মাঝে দেখে আসছি। আবার এসে বসছি ওঁদের খোশগল্পে।

সর্দার মূলা সিং বড়দাকে প্রশ্ন করলেন, বাবুজী, অনেকদিন থেকেই আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব ভাবছি, সময় আর সুযোগ হয়ে ওঠে না। আজ যখন সুযোগ হয়েছে তখন জেনেই নিই, কি বলেন?

রাসবিহারী তাঁর বর্মা চুরুটের ছাইটা ছাইদানে ঝেড়ে বলেন, বলুন।

—দিল্লিতে লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর উপর বোমাটা কি আপনিই ছুঁড়েছিলেন?

রাসবিহারী পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকালেন মূলা সিং-এর দিকে। হাসলেন। তারপর তাঁর অভ্যস্ত গাম্ভীর্যে বললেন, সর্দারজী, আমি আমার সহকর্মীদের বলি—ডান হাতে কোন কাজ করলে লক্ষ্য রেখ, তোমার বাঁ হাত যেন সেটা জানতে না পারে।

মূলা সিংও হেসে বলেন, জানি বাবুজী, জানি। নিছক কৌতূহলবশেই প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করিনি। একজনের কাছে জবান দেওয়া আছে বলেই ওটা জানতে চেয়েছিলাম।

—জবান দেওয়া আছে! কার কাছে? কী প্রসঙ্গে?

সর্দার মূলা সিং বলতে থাকেন, দিল্লিতে যখন ভাইস্‌রয়ের উপর বোমা ফেলা হয় আমি তখন ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলেতে। তার দিন পনেরো আগে শিকাগোতে 'হিন্দুস্থান অ্যাসোসিয়েশান অফ ইণ্ডিয়া' জন্ম নিয়েছে!

তারকনাথ দাসজী তার আগে থেকেই কাজ করে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সর্দার হরদয়াল মার্কিন মুলুকে পদার্পণ করার পরেই গদর পার্টি নূতন করে প্রাণ পেল যেন। শিকাগো অ্যাসোসিয়েশানে তারক দাস ছাড়াও অনেকে এসে মাথা দিলেন—সুরেন্দ্রমোহন বসু, সুধীন বোস, খান্‌-খোজে, বসন্ত রায়, বাণেশ্বর দাস, সুরেন কর, শাস্ত্রীজী, আর. আমেদ, আইয়ার প্রভৃতি। ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলেতেও এসে লাগল তার ঢেউ। আমরা ওখানে একটি মাসিক পত্রিকা বের করবার ব্যবস্থায় তখন ব্যস্ত। হঠাৎ সংবাদ এল, দিল্লিতে বোমাবিধ্বস্ত ভাইস্‌রয় হাতীর হাওদা থেকে মাটিতে উল্টে পড়েছেন! সর্দার হরদয়াল তখন বার্কলেতে। সেই রাত্রেই তিনি একটা ডিনার থ্রো করলেন —ঐ মহা সাফল্যকে অভিনন্দন জানাতে। আমরা বিশ-পঁচিশজন ভারতীয় সমবেত হলাম হোটেলের 'ব্যাঙ্কোয়েট হল'-এ। প্রৌঢ় সর্দার হরদয়াল সেদিন বাচ্চা ছেলের মত খুশিয়াল হয়ে উঠেছিলেন। আমাদের এক একজনকে জড়িয়ে ধরে তিনি ক্রমাগত নাচতে থাকেন। গান বেঁধেছিলেন নিজেই, গাইছেন গলা ছেড়ে—"পাগড়ী আপনি সাম্‌হালিয়েগা মীর! ঔর বস্তী নহি! ইয়ে দেহ্‌লি হ্যায়!" আমাদের জনে জনে উনি বললেন—লুকিয়ে-চুরিয়ে গাঁয়ের ভিতর গুপ্ত-হত্যা নয় হে, খাস দিল্লি শহরে লক্ষ লোকের চোখের উপর ভাইস্‌রয় ইস্‌ চিৎপটাং! এ কাজ যে করেছে সে বাহাদুর! শের-ই হিন্দ্‌! জানি না এ কার কাজ! আমার অবশ্য দৃঢ় বিশ্বাস এ আমার দলেরই কাজ! যাই হোক, বন্ধুগণ! যে আন্দোলন এখানে চালিয়েছি তাতে কোনদিনই আর আমি ভারতবর্ষে ফিরে যেতে পারব না! আপনারা যদি কেউ দেশে ফিরে ঐ শের-ই-হিন্দের সাক্ষাৎ পান তাহলে তাকে জানাবেন—পৃথিবীর অপরপ্রান্তে সেদিন সর্দার হরদয়াল তাকে লাখো সেলাম জানিয়েছিল।

রাসবিহারী মৃদু হাসলেন। জবাব দিলেন না।

মূলা সিংও উঠে দাঁড়িয়ে আভূমিনত হয়ে সেলাম করলেন রাসবিহারীকে। বললেন, সর্দার হরদয়াল আমার গুরু, তাঁর ইচ্ছা আজ পূর্ণ হল।

রাত্রে ওঁরা চারজনে মাটিতে আসন-পিঁড়ি হয়ে সবে খেতে বসেছেন—হঠাৎ কে যেন টোকা দিল সদর দরজায়। সকলেই চমকে ওঠেন; কিন্তু মনে হল টোকা দেওয়ার কায়দায় একটা বিশেষ তাল-লয়-মাত্রা আছে— কারণ পরমুহূর্তেই দেখলাম ওঁরা বেশ নিশ্চিন্ত হলেন। আমার স্বামী গিয়ে দরজাটা খুলে দিলেন। আগন্তুক একজন দীর্ঘদেহী পাঞ্জাবী, তাঁর সারা দেহ একটা কালো ওভারকোটে ঢাকা। মাথার টুপি খুলে তিনি সকলকে অভিবাদন জানালেন। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে বড়দা প্রশ্ন করেন, কী খবর কৃপাল সিং?

কৃপাল সিং নির্নিমেষ লোচনে আমাকে দেখছিল। পরিবেশনের পাত্র ধরে থাকায় আমার দু-হাত জোড়া—না হলে ঘোমটাটা টেনে দিতাম। বড়দার প্রশ্নে চম্‌কে উঠে বল্লে—এখানে বলব?

—হ্যাঁ বলতে পার। ও হচ্ছে আমাদের রামস্বরূপের স্ত্রী। ইনি মূলা সিং, ও হল সনাতন।

সবাই আমার লোক!

একটা প্যাকিং বাক্সের উপর বসতে বসতে কৃপাল সিং গম্ভীরভাবে বলে, বাবুজী, খবর খুব খারাপ।

মূলা সিং চমকে ওঠেন। সত্যেনবাবু এবং আমার স্বামীরও খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সবাই উৎসুক হয়ে তাকায়। বড়দা কিন্তু নির্বিকার ভাবে বলে ওঠেন—তবে এখন থাক। অনেকদিন পর বেশ কব্জি ডুবিয়ে মাংস খাবার আয়োজন করেছি, এখন খারাপ খবর বরদাস্ত হবে না।

কিন্তু সর্দার মূলা সিং-এর ধৈর্য মানল না। বললেন, বলুন আপনি। কী খারাপ খবর?

কৃপাল সিং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন বড়দার দিকে। মাংস চিবোতে-চিবোতে বড়দা নির্লিপ্তভাবে বলেন, ঠিক হ্যায়, সর্দারজী যদি শুরুতুনি দিয়ে শুরু করতে চান, তাহলে আমি বাধা দেবার কে?

কৃপাল সিং বলে, মুশ্যামৎ আব্রিতে যে বাড়িটায় আপনি উঠেছেন তার কাছাকাছি ছাব্বাতে আজ একটা স্বদেশী ডাকাতি হয়েছে। পাঁচ-ছয়জন সশস্ত্র ডাকাত এসে কিষেণলালজীর গদিতে চড়াও হয়। বন্দুক দেখিয়ে ওরা কয়েক হাজার টাকা লুঠ করে নিয়েছে। সমস্ত মহল্লাটা পুলিসে ঘিরে আছে।

বড়দা বিরক্ত হয়ে বলেন, এসব কী হচ্ছে মূলা সিং? আমি লক্ষ বার বলছি এখন এসব ছেলেমানুষি করবেন না—

বাধা দিয়ে মূলা সিং বলেন, আমি করছি? ওরা কারও নির্দেশ মেনে চলে? দশ পনের হাজার পাঞ্জাবী হঠাৎ এসে জুটেছে এখানে। তারা মার্কিন মুলুক আর কানাডা থেকে বিতাড়িত। তারা দুর্ধর্ষ, বেপরোয়া—দেশে এসে খেতে পাচ্ছে না। এই সপ্তাহে এই নিয়ে তিনটে ডাকাতি হল। সাতাশে জানুয়ারী লুধিয়ানার মনসুরানে, তার দুদিন পরে মালেককোটলায় আর আজ ছাব্বাতে! এরা কি আমাকে জানিয়ে কিছু করছে?

সত্যেনবাবু বললেন, দাদা, আপনি আজ রাতটা এখানেই থেকে যান।

কৃপাল সিং বড়দাকে প্রশ্ন করে, আচ্ছা বাবুজী, আপনি তো দেরাদুনে অনেকদিন ছিলেন। সেখানকার ডি. এস. পি. সুনীল ঘোষকে চেনেন?

—হ্যাঁ, চিনি। কেন বলতো?

—লোকটা দূর থেকে আপনাকে দেখলে চিনতে পারবে?

—খুব সম্ভব। কিন্তু এ সব কথা কেন?

কৃপাল সিং একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, গরিবের একটা কথা শুনবেন বাবুজী? আপনি পাঞ্জাব ছেড়ে এখনই চলে যান। এটা হচ্ছে নেমকহারামের দেশ। গোটা শিখ জাতটাই—

হঠাৎ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান সর্দার মূলা সিং। চাপা গর্জন করে ওঠেন ঃ খবরদার!

সত্যেনবাবু বলেন, আপনিও তো পাঞ্জাবী, শিখ!

—না। আমি শিখ নই। পাঞ্জাবী হিন্দু।—সাফ-জবাব কৃপালের।

বড়দা মূলা সিং-এর হাত ধরে আকর্ষণ করেন। গম্ভীরভাবে কৃপাল সিংকে বলেন, তোমার একটা কৈফিয়ত বাকি আছে। কৃপাল, জাত তুলে অমন একটা বিশ্রী কথা তুমি কেন বললে?

জবাবদিহি করে যাও!

কৃপাল সিংও উঠে দাঁড়িয়েছিল। ঝড়ের বেগে সে বলে গেল—আপনার দলে বিভীষণ আছে! পুলিসকে কেউ খবর যোগাচ্ছে!

—কি করে বুঝলে তুমি?

—অমৃতসর-পুলিস জানে রাসবিহারী বোস সম্প্রতি পাঞ্জাবে এসেছেন। লিয়াকৎ হায়াৎ খাঁ তাই দেরাদুন থেকে সুনীল ঘোষকে তলব করেছেন। প্রয়োজনমত সে যেন আপনাকে সনাক্ত করতে পারে।

সত্যেনবাবু প্রশ্ন করেন—লিয়াকৎ খাঁ লোকটা কে?

—অমৃতসরের ডেপুটি পুলিস কমিশনার।

মূলা সিং এবার প্রশ্ন করেন, আপনি এতসব খবর পেলেন কোথায়?

জবাব দেন বড়দা : কৃপাল সিং হচ্ছে পুলিসের স্পাই। থানার সঙ্গে তার খুব দহরম-মহরম। আজ পাঁচ-ছয় মাস সে আমাকে ও-পক্ষের গোপন খবর সরবরাহ করে যাচ্ছে।

নীরবতা ঘনিয়ে আসে ক্রমে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কৃপাল সিং বলে—আপনি সাবধান বাবুজী। আপনার সঙ্গে বিভীষণ প্রবেশ করেছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে বড়দার! বললেন, জানি কৃপাল। মীরজাফরের বংশ রক্ত-বীজের বংশ!

এরপর আর খাবার কথা কার মনে থাকে! সর্দার মূলা সিং আগেই উঠে পড়েছিলেন। পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত পায়চারি করছিলেন তিনি। সত্যেন বাবু উঠে চলে গেলেন হাত ধুতে। বড়দা শুধু বললেন, আমাকে আর একখানা ফুলকা। কাঁচা-পেঁয়াজ আছে সতীন? দাও তো।

মূলা সিং পদচারণায় ক্ষান্ত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ান। বলেন, দায়িত্বটা আমারই। অমৃতসরের সমস্ত দায়িত্ব আমার। এখানে কেউ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে তবে সেই দুশমনকে খুঁজে বের করব আমিই। আপনি কাকে কাকে জানিয়েছেন পাঞ্জাবে আসার কথা?

প্রশ্নটা বড়দাকে। তিনি নিমীলিতনেত্রে চর্বন-কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। ঐ অবস্থাতেই বলেন, আর কাঁচালঙ্কা যদি থাকে। একটু ঝাল-ঝাল না হলে মাংস জমে?

আমি লঙ্কা-পেঁয়াজ আনতে ছুটি। মূলা সিং-এর প্রশ্নটার জবাব দিলেন সত্যেনবাবু। বললেন, আমরা ক'জন ছাড়া কাশীর কয়েকজন জানেন। তাঁরা অত্যন্ত ট্রাস্টেড। চন্দননগরেও খবর গেছে—কিন্তু সেখান থেকে কোন খবর কোনদিন বের হয়নি। আর আপনাদের এখানকার—কর্তার সিং, জগৎ সিং জানেন। বাড়িওয়ালা জানেন উনি ব্যবসায়ী, নাম রমেশকুমার দত্ত।

ঝুঁকে পড়ে সর্দার মূলা সিং বড়দাকে প্রশ্ন করেন, এখন কী করবেন?

এতক্ষণে চোখ তুলে তাকান। জবাবে বলেন, আপাতত আহারটা শেষ করব। কোর্মাটা বড় জবর জমেছে হে! খোয়া ক্ষীর দিয়েছ নাকি?

কী বলব? আমি চুপ করে থাকি।

আহারান্তে বড়দা তাঁর গলাবন্ধ কোটটা গায়ে দিলেন। ধীরে-সুস্থে বললেন, সত্যেন, তুমি বেনারসে চলে যাও। ওদের জানিয়ে দিও মুশ্যামৎ আত্রির বাড়ি ছেড়ে দিয়েছি আমি। আচমকা কেউ এসে না ধরা পড়ে। ভয় ঐ লাট্টুটাকে। কেবল পাক মারে।

লাট্টু হচ্ছেন শচীন সান্যাল। বড়দার আদরের ডাক।

—আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

—মুশ্যামৎ আত্রিতে।

এতক্ষণে এগিয়ে আসেন আমার স্বামী। বলেন, সে হয় না। গোটা মহল্লাটা পুলিস ঘিরে আছে।

বড়দা হাসলেন। বললেন, ও বাড়িতে আমার বুকের চারখানা পাঁজরা ফেলে রেখে এসেছি যে শুকুল। সে চারটে যন্ত্র উদ্ধার না করলে হাবু আমাকে কোনদিন ক্ষমা করবে না!

—হাবু কে?

—শ্রীশ মিত্তির। সে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছে জানি না—রডা আর্মস্, লুটের মহানায়ক হাবু মিত্র।

মূলা সিং এগিয়ে এসে বলেন, বাবুজী রিভলভার চারটে কোথায় আছে বলুন্। আমি নিয়ে আসব। আপনাকে আমরা ওখানে যেতে দিতে পারি না!

ঠিক তখনই আবার টোকা পড়ল দরজায়। একই ছন্দে।

এবার এলেন পিংলে। রাত তখন দশটা। পিংলে কিছু একটা কথা বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বড়দা বলেন, ওহে সতীন, তোমার ভাঁড়ারে গোস্-রুটি আর আছে? পিংলে-ভায়াকে কিছু দাও।

বিষ্ণুগণেশ পিংলের নাম শোনা ছিল। চাক্ষুষ তাঁকে দেখিনি। উনি আমাকে হাত তুলে নমস্কার করলেন। নীরবে বসলেন এক কোণায়। নির্বাক। বড়দা মূলা সিংকে বলেন, ঠিক আছে। আপনি ব্যস্ত হবেন না। ও চারটে যন্ত্র আনিয়ে নেবার ব্যবস্থা আমি করছি। আমি ও আস্তানা ছাড়লাম। আমার নির্দেশ ওই শুকুলের মাধ্যমেই পাবেন। আমি এবার থেকে কোথায় থাকব তা ঐ রামস্বরূপ শুকুলই শুধু জানবে। আপনাদেরও জানাব কিন্তু তার আগে ঐ বিভীষণটিকে খুঁজে বার করুন আপনারা।

সর্দার মূলা সিং মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে। অস্ফুটে বললেন, ঠিক হ্যায়। দায়িত্বটা আমারই।

কৃপাল সিং টুপিটা তুলে নিয়ে বললে, চলি বাবুজী। রাত অনেক হল। আপনি কিন্তু খুব সাবধানে থাকবেন। দলে বিভীষণ ঢুকে পড়েছে।

একে একে সবাই চলে গেলেন। সত্যেন, মূলা সিং এবং কৃপাল। এতক্ষণে পিংলের দিকে ফিরে বড়দা জানতে চান, এবার বল?

পিংলে বলেন, লাহোরে বাড়ি পাওয়া গেল না।

—গেল না? বল কি। অতবড় শহরে একখানা ঘর—

—না। লাহোর-পুলিস কোন সূত্রে খবর পেয়েছে আমরা পাঞ্জাবে ঘাঁটি বানাতে চাইছি। তাই মেস-বাড়ির জন্য বা কোন ব্যাচিলারকে বাড়ি ভাড়া দিতে হলে বাড়িওয়ালাকে থানা থেকে অনুমতি নিতে হবে।

গম্ভীর হয়ে গেলেন বড়দা।

আমার স্বামী বলেন, কিন্তু এদিকে মুশ্যামৎ আত্রির ডেরার উপর পুলিশের নজর পড়েছে।

ও-বাসা তো এখনই ছাড়তে হবে।

পিংলে বলেন, আমি শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে এক কাজ করে এসেছি। রামস্বরূপ শুকুলজীর নামে লাহোরে একখানা ঘর ভাড়া করে এসেছি। বাড়িওয়ালাকে বলেছি রামস্বরূপজী সরকারী চাকুরে। অমৃতসরের ডাকবিভাগে কাজ করে। তিনি লাহোর বদলী হয়েছেন। সস্ত্রীক ঐ ঘরখানায় থাকবেন।

—তাতে কি সুরাহা হল?

—শুকুলজী দিন পনের ছুটি নিন। ঐ বাড়ীতে গিয়ে উঠুন। আপনি ওঁর চাকর বা ঠাকুর সেজে—

—সে হয় না। —বড়দার সাফ জবাব।

—কেন হবে না? এ ছাড়া উপায় কি?

বড়দা অস্থিরভাবে বলে ওঠেন, তুমি বুঝতে পারছ না পিংলে। শুকুল হচ্ছে আমার ট্রাম্প কার্ড। শুকুল আর কৃপাল ওরা অমৃতসরেই থাকবে। শুকুল এখন আছে টেলিগ্রাফ-বিভাগে। ওর মাধ্যমে আমরা অতি সহজেই যোগাযোগ রাখতে পারব। কৃপাল যে কোন গুপ্ত খবর জানাবে তা শুকুল কোড-মেসেজে আমাকে টেলিগ্রাফ করে জানাতে পারবে। শুকুলের মাধ্যমেই আমি শেষ মুহূর্তে সকলকে নির্দেশ দেব স্থির করেছি। রামস্বরূপ শুকুল এ সময়ে কিছুতেই অমৃতসর পোস্টাপিস ছাড়তে পারে না।

—কিন্তু আপনার লাহোরে মূল কেন্দ্র তৈরী করার পরিকল্পনা?

—সেটারই এখন সমস্যা।

তিনজনে নীরব হয়ে যান। গভীর চিন্তায় ডুবে যান।

আমার মাথার মধ্যে একটা চিন্তা দানা বেঁধে ওঠে। একবার ওঁর দিকে তাকাই। চোখাচোখি হয় না। উনি মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টিতে গভীর চিন্তায় মগ্ন। আমার আর ধৈর্য মানে না। বলে উঠি—আমি বলছি। উপায় আছে।

সকলেই আমার মুখের দিকে তাকায়।

—বড়দা আমার স্বামীর পরিচয়ে লাহোরে চলুন। আমি ওঁর স্ত্রী সাজব।

তিনজনেই চম্‌কে ওঠে।

পিংলে ইতস্তত করে বলে, তা কেমন করে সম্ভব। সেখানে একখানা মাত্র ঘর...

আমার স্বামী বলে ওঠেন, যমুনা সাহস পেলে আমার আপত্তি নেই।

যেন এর মধ্যে বিসদৃশ কিছুই নেই। বড়দা বলে ওঠেন, দ্যাটস্ ফাইন! সতীন আমার বউ সাজবে।

নির্দেশ যখন দিতেন তখন ঝড়ের বেগে নির্ভুল নির্দেশ দিয়ে যেতেন। যে মুহূর্তে স্থির হল আমি ওঁর স্ত্রী সেজে ওঁর সঙ্গে লাহোরে যাব, সেই মুহূর্তেই সমস্ত পরিকল্পনাটা ছকে ফেললেন তিনি। পিংলেকে পর-পর কতকগুলি আদেশ দিলেন। আমার স্বামীকে বুঝিয়ে দিলেন—বিপ্লবের দিন চূড়ান্তভাবে স্থির করে তিনি কী ভাষায় তা জানাবেন এবং সে খবর কাকে কোন ঠিকানায় কী ভাষায় জানাতে হবে। আমাকে বললেন, গৃহস্থালির সাজসরঞ্জাম আর তোমার জামা-কাপড় বেঁধে আজ রাত্রেই তৈরী থেক। কাল ভোরবেলা এসে আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

আমার স্বামী বলেন, রাতটা আপনি কোথায় কাটাবেন বলুন তো?

—আপাতত যাচ্ছি হাবু মিত্তিরের গচ্ছিত সম্পত্তি উদ্ধার করতে। সম্ভবপর হলে ঐ বাড়িতেই রাতটা কাটাব। না হলে পথে পথে।

আমার স্বামী এগিয়ে এসে পথ রুখে দাঁড়ান : না! আপনাকে যেতে দেওয়া হবে না! বলুন, কোথায় রেখে এসেছেন আপনার যন্ত্র? হয় আমি না হয় পিংলেজী সেটা উদ্ধার করে আনতে যাবে।

দরজায় পিঠ দিয়ে ও দু'হাত দুদিকে বাড়িয়ে দিয়েছে—'যেতে নাহি দিব'র ভঙ্গিতে। বড়দা ওর ভঙ্গি দেখে হোহো করে হেসে ওঠেন। আমার দিকে ফিরে বলেন, এতবড় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যাকে রুখতে হিমসিম খাচ্ছে তোর মরদ তাকে কেমন করে রুখছে দেখ। ও! একেবারে যীসাস্ ক্রাইস্ট!

বললাম, কিন্তু ঠিকই তো বলছেন উনি। আপনার বদলে আর কেউ গেলে ক্ষতি কি?

বড়দা ওঁকে সরিয়ে দিয়ে পথে নামেন। আমার দিকে ফিরে মিষ্টি হেসে বলেন ক্ষতি এই যে, আর কেউ গেলেই ধরা পড়ে যাবে। অথচ রাসবিহারী বোস কোনদিন ধরা দেবে না। তাকে ধরবার তাকৎ বৃটিশ-সরকারের নেই।

কী প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস!

রাতে কথা হল ওঁর সঙ্গে। ওঁর মনে কোনও সঙ্কোচ নেই। ওঁকে না জিজ্ঞাসা করে হঠাৎ এ প্রস্তাব করায় উনি রাগ করেননি। সে প্রশ্ন তুলতেই বলেন, ঘরে তো তুমি রামজীর মূর্তি রেখেছো। যে রাত্রে ফিরি না, সে রাত্রে তিনিই তো তোমার দেখ্ ভাল্ করেন। তাই বলে কি আমি রামজীকে ঈর্ষা করি?

পরদিন রাত থাকতেই উঠেছি। মুখ হাত ধুয়ে শৌচাগারের দিকে যেতে গিয়ে সরু গলি পথে যেন ভূত দেখলাম! আঁতকে উঠি আমি—ও মা গো!

পায়খানার সুড়ঙ্গ পথে দাঁড়িয়ে আছে নেংটি-সার মিশকালো একটা মেথর। তার মাথায় দুর্গন্ধযুক্ত মাটির চ্যাঙাড়ি। লোকটা হেসে ফেলল আমাকে দেখে। বলে, সতীন, চ্যাঁচাস নে! তোর কর্তাকে ডেকে দে। কুয়ো থেকে জল তুলে দিক। আর শোন, আমাকে একটা সাবান দিয়ে যা!

আমি তো স্তম্ভিত!

ময়লা-ভর্তি চ্যাঙাড়িটা নিয়ে সুড়ঙ্গ পথে লোকটা চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে দাঁড়াল কুয়োতলায়। উনি খবর পেয়ে ছুটে এলেন—এমন দুর্দশা হল কি করে আপনার?

—চুপ! আগে জল তুলে দে। ঢাল আমার মাথায়! সাবানটা দে।

জানুয়ারীর শীতের সকাল। ঘড়া ঘড়া জল ঢেলে ওঁকে ভদ্রস্থ করা হল। আমি এক শিশি ওডিকোলন এনে ঢেলে দিলাম ওঁর গায়ে। বললেন, একটু কেরোসিন আর ন্যাকড়া নিয়ে আয়। না হলে এগুলোতে মরচে ধরে যাবে।

ঘন্টাখানেক ধস্তাধস্তি করে ওঁকে ঘরে তোলার অবস্থায় আনা গেল। কম্বল মুড়ি দিয়ে বসলেন উনি গরম চায়ের মগটা হাতে নিয়ে। বললেন, কৃপাল সিং ঠিকই বলেছিল শুকুল। আমাদের দলে বিভীষণ ঢুকে পড়েছে। কাল-রাতে কিষেণলালজীর গদিতে যে ডাকাতি হয়েছে

তার কিনারা করতে পুলিস যায়নি—ওরা এসেছিল আমারই সন্ধানে।

—কেমন করে বুঝলেন?

—না হলে স্থানীয় দারোগাই আসত রেড-এ। দেরাদুন থেকে সুনীল ঘোষকে টেনে আনত না।

শুনলাম বিস্তারিত। কাল রাত এগারোটায় ওবাড়িতে ঢুকবার সময় বড়দার কোন অসুবিধা হয়নি। ব্যাপারটা টের পেলেন মধ্য রাত্রিতে। সমস্ত বাড়িটা ঘিরে রয়েছে পুলিসে। ভোর হলেই রেড শুরু হবে। পালাবার কোন ছিদ্রপথই ওরা রাখেনি। উনি নিরুপায় হয়ে সর্বাঙ্গে ভুসো কালি মাখলেন। তারপর নেংটি-সার অবস্থায় চারটে রিভলভার নিয়ে লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন খাটা-পায়খানার নিচের দিকে। সর্বাঙ্গে বিষ্ঠা মেখে ঐ হাঁড়ি মাথায় বেরিয়ে এলেন সরু গলিপথ দিয়ে। বললেন, বড় রাস্তায় পড়েই দেখি আমার পুরানো বন্ধু সুনীল দারোগা দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা সেলাম করলাম বেটাকে। ও বললে, সেলাম করতে গিয়ে চ্যাঙাড়িটা উল্টে ফেল না মানিক, —বিদায় হও।—তা হুকুম তামিল করেছি আমি। দারোগাবাবুর হুকুম! না শুনলে চলে?

উনি বলেন, আর রিভলভার চারটে?

—ঐ চ্যাঙাড়িতেই ছিল। ভারি জিনিস তো ডুবে গিয়েছিল। এই যে—

সাবান দিয়ে সেগুলি ধুয়েছেন। এখন কেরোসিন মাখাচ্ছেন! মাগো!

কী বলব ওঁকে? উনি কি পিশাচ, রাক্ষস, না দেবতা?

চৌঠা ফেব্রুয়ারী থেকে উনিশে ফেব্রুয়ারী—ঐ পনেরটা দিন এই দুনিয়ায় আমার পরিচয় ছিল—রাসবিহারী বসুর স্ত্রী। সারাটা দিন উনি কোথায় কোথায় ঘুরতেন—ফিরে আসতেন রাত্রে। আমি রান্না করে তাঁকে পাশে বসিয়ে খাওয়াতাম। তারপর শুতে যেতাম। একটি মাত্র ঘর! বাড়িওয়ালা একটা বড় চৌকি দিয়েছিলেন—দুজনের বিছানা তাতে পাতা। ঠিকা-ঝি এসে বাসন মাজতো, ঘর ঝাঁট দিত, বিছানা তুলে রাখত। প্রথম রাত্রেই ঘরে খিল দিয়ে বড়দা তাঁর বিছানাটা মাটিতে পেড়ে নামালেন। আমি আপত্তি করেছিলাম, বলেছিলাম—আমিই মাটিতে শোব। উনি সে কথায় কান দেননি। বললেন, এতে ওঁর শিভ্যাল্‌রির বেলুনটা নাকি চুপসে যাবে।

আমি রাগ করে বললাম, তাহলে কাউকেই মাটিতে শুতে হবে না। আপনি খাটেই শুয়ে থাকুন। আপনি তো মানুষ নন। আমার অসুবিধা হবে না।

উনি হেসে বলেছিলেন, না রে সতীন, তাতে আমার গুরুর মানা।

—গুরু! আপনারও গুরু আছেন?

—আছেন। তবে তাঁকে সাক্ষাতে কখনও দেখিনি। তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যের কাছেই আমি শিখেছি কি করে ইন্দ্রিয়কে বশে রাখতে হয়।

গুরুর নাম উনি করেননি। শিষ্যের পরিচয় অবশ্য দিয়েছিলেন—চন্দননগরের মতিলাল রায়। ওঁর চেয়ে বছর-চারেকের বড়, কিন্তু বন্ধুস্থানীয়। তিনি গৃহী অথচ সন্ন্যাসী। তাঁর স্ত্রী আছেন, কিন্তু তিনি ব্রহ্মচারী। এমন কি স্বামী-স্ত্রী নাকি এক ঘরেই শয়ন করেন।

আমার বিশ্বাস হয়নি। দুরন্ত কৌতূহল হয়েছিল। বড়দা রুদ্ধদ্বার কক্ষে পরস্ত্রীর কাছে সেই বন্ধুর দাম্পত্যজীবনের কথা নিঃসঙ্কোচে গল্প করেছিলেন। ঐ মতিলাল নাকি তাঁকে একদিন গীতার আত্মসমর্পণ-যোগের কথা শুনিয়ে ছিলেন, ব্রহ্মচর্য-ধর্মের কথা আলোচনা করেছিলেন। সে সময় রাসবিহারীর ধারণা ছিল মতিলাল অবিবাহিত। পরের দিন বড়দা জেনেছিলেন, তিনি বিবাহিত অথচ ব্রহ্মচারী।

পনের বছর বয়সে মতিলালের বিবাহ হয়, তাঁর স্ত্রীর বয়স মাত্র নয় বৎসর। বিবাহের পাঁচ বছর পরে ওঁদের একটি কন্যা সন্তান হয়, কিন্তু শিশুটি বাঁচেনি; মাত্র দশমাস বয়সে বাচ্চাটা মারা যায়। কন্যার মৃত্যুতে মতিলাল একেবারে ভেঙে পড়েন, ধর্ম-জগতের দিকে ঝোঁক হয়—নানান সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী-অবধূত-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে ধর্মালোচনা শুরু করেন। মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। এই সময় একজন অবধূত—রামজী তাঁর নাম—স্বয়ং তাঁর বাড়িতে আসেন। তিনি বলেন, মতিলাল, তুমি বিবাহিত; তোমার পত্নী যুবতী। কিন্তু ভগবানের কাছে যেতে হলে স্ত্রীকে ত্যাগ করতে হবে!

—স্ত্রীকে ত্যাগ করব? বিনা অপরাধে?

—ব্রহ্মচর্য ছাড়া ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না!

মাথা নিচু করে ফিরে এলেন মতিলাল। স্থির করলেন, খোলাখুলি কথা বলবেন স্ত্রীর সঙ্গে। তখন তাঁর নিজের বয়স চব্বিশ, স্ত্রীর আঠারো। নয় বৎসরের বিবাহিত জীবন। অষ্টাদশবর্ষীয়া সন্তানহারা রাধারানীকে মতিলাল বলেছিলেন—অবধূত বললেন, বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য পরমার্থ লাভ করেছিলেন স্ত্রীকে ত্যাগ করে—

নিরক্ষরা রাধারানী তাঁর কাজল-কালো দুটি চোখের দৃষ্টি মেলে জবাবে বলেছিলেন দেখ, তোমরা পণ্ডিত, আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ—কিন্তু অবধূতকে জিজ্ঞাসা কর তো, তাহলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কেমন করে ভগবানকে পেলেন? কই, তাঁকে তো শ্রীমাকে ত্যাগ করে বনে চলে যেতে হয়নি।

চমকে উঠেছিলেন মতিলাল। বলেছিলেন, পারবে? তুমি পারবে রাধা?

—তুমি যখন আমার সহায় তখন আর আমার ভয় কি?

সেই সিদ্ধান্তই জানিয়েছিলেন মতিলাল, ঐ রামজী অবধূতকে। ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা নিলেন তিনি। স্ত্রীকে ত্যাগ করলেন না। গড়ে তুললেন প্রবর্তকসঙ্ঘ। রাধারানী সঙ্ঘজননী। স্বামী-স্ত্রী আজীবন একত্রে ছিলেন—ব্রহ্মচর্য পালন করে। গল্প শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম আমি।

আটদিন অধীর প্রতীক্ষা করার পর অমৃতসর ডাকঘরে এল প্রত্যাশিত টেলিগ্রাফখানা। লাহোর থেকে জনৈক শঙ্করপ্রসাদ ত্রিবেদী তাঁর নিকট আত্মীয় হরদেওপ্রসাদ ত্রিবেদীকে জানাচ্ছেন ঃ বিবাহের তারিখ স্থির হয়েছে একুশে ফেব্রুয়ারী। আত্মীয়স্বজনকে খবর দাও।

টরে-টক্কা, টরে-টক্কা! মামুলী তারবার্তা জানিয়ে দিল অমৃতসর ডাকঘরের তারবাবুকে নিদারুণ এক গোপন বার্তা। তৎক্ষণাৎ সচকিত হয়ে উঠলেন রামস্বরূপ শুকুল। সাত-আটখানি টেলিগ্রাফ তিনি পাঠিয়ে দিলেন। ত্রিবেদী পরিবারের বিভিন্ন মেহমানের কাছে কাশীতে, কানপুরে, কলকাত্তায়, শিয়ালকোটে, সাহারানপুরে, আম্বালায় এবং চন্দননগরে। মৌখিক জানিয়ে এলেন সর্দার মূলা সিংকে, কৃপাল সিংকে।

দিন পাঁচেক পরে আবার এল একটি টেলিগ্রাফ। লাহোর থেকে শঙ্করপ্রসাদ ত্রিবেদী জানাচ্ছেন, বিশেষ কারণে বিবাহের তারিখ এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। একুশে নয়, উনিশে।

দিশেহারা হয়ে পড়েন রামশুকুল। কী এমন কাণ্ড ঘটল যাতে শেষ মুহূর্তে এমনভাবে তারিখ বদলানো হল? এখন কেমন করে তিনি সবাইকে জানাবেন? সেটা সতেরই বিকালবেলা। মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টা বাকি আছে শুভবিবাহের লগ্নের। রামস্বরূপ পোস্টমাস্টারের কাছে ছুটি চাইলেন। অফিস ছুটি হতে এখনও দু'ঘন্টা বাকি। স্থির করলেন, এখনই একবার যাবেন কৃপাল সিং-এর কাছে। গুরুজী বলে গেছেন কৃপাল সিং-এর সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করতে। কিন্তু পোস্টমাস্টার-মশাই ছুটি দিতে রাজী হলেন না। বলেন, শিউপ্রসাদ ছুটিতে আছে, টেলিগ্রাফ সেক্‌শানে আজ এমনিতেই লোক কম—ঐ শুনুন আবার টরে-টক্কা শুরু হয়েছে। যান, যান মেসেজটা ধরুন।

রামস্বরূপ দ্রুতগতিতে ফিরে আসেন তাঁর টেবিলে। ধরেন মেসেজটা! লাহোর থেকেই আসছে আবার। জরুরী তার। প্রেরক এক্স-ওয়াই-জেড। প্রাপক লিয়াকৎ হায়াৎ খাঁ, ডেপুটি কমিশনার অব পুলিস, অমৃতসর। টরে-টক্কার ভাষা ডি-কোড করতে রামস্বরূপের ডান হাতখানা থরথর করে কাঁপছিল। তার বার্তার মর্মার্থ ঃ "সন্ধান পেয়েছি। লাহোরে। পরশু অর্থাৎ উনিশে সন্ধ্যায় সবাইকে একস্থানে পাওয়া যাবে। সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে স্বয়ং আসুন। উনিশে সন্ধ্যা সাতটার ডাক-গাড়িতে লাহোর স্টেশনে অপেক্ষা করব। এক্স-ওয়াই-জেড।"

টেলিগ্রাফ পিয়ন দাঁড়িয়ে আছে। রামস্বরূপের সমস্ত শরীর তখন উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। বিভীষণও তাহলে ঘাঁটি গেড়েছে লাহোরে। ঠিকই বলেছিল তাহলে কৃপাল সিং। নেমকহারামের জাত! কিন্তু এখন কী করতে পারে রামস্বরূপ? কী করবেন তিনি?

—দিজিয়ে সাব—তাগাদা দেয় টেলিগ্রাফ পিয়ন।

একটা মারাত্মক অনিচ্ছাকৃত ভুল করবেন কি? 'নাইনটিন্থ' শব্দটা যদি ভুল করে অন্য কিছু লেখেন? কিন্তু তাতেও কি কিছু লাভ হবে? অমৃতসর থেকে লাহোর তো আড়াই-ঘন্টার পথ। এমন একটা খবর পেয়ে হায়াৎ খাঁ নিশ্চয় এখনই যাবতীয় ব্যবস্থা করে ফেলবে। হয়তো আর তিন-চার ঘন্টার মধ্যেই কোন পদস্থ অফিসার লাহোরে পৌঁছে যোগাযোগ করবে ঐ এক্স-ওয়াই-জেড বিভীষণটার সঙ্গে।

—কা ভইলব্ শুকুলজী? তবিয়ৎ গড়বড় হৈ কা?

নিরুপায় রামস্বরূপ মৃত্যুবাণটা বাড়িয়ে ধরেন টেলিগ্রাফ পিয়নের দিকে।

অফিস ছুটি হতেই উনি প্রথমে গেলেন সর্দার মূলা সিং-এর ডেরায়। সেখানে কেউ নেই। সদলবলে মূলা সিং চলে গেছেন লাহোরে। ছুটে গেলেন কৃপাল সিং-এর ওখানে! লোকটা থানার ইন্‌ফর্মার! ওকে আগে জানানো দরকার। ওই বারে বারে বলেছে সাবধান হতে। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য! কৃপাল সিংকেও পাওয়া গেল না। অগত্যা সিক্‌লীভ-এর জন্য একটা দরখাস্ত করে ছুটলেন স্টেশনে। নিতান্ত বরাত। শেষ ট্রেনটা ধরতে পারলেন না। ফিরে এলেন শূন্যগৃহে। সারারাত ছটফট করে পরদিন ভোরের ট্রেনেই রওনা হলেন লাহোর!

লাহোর স্টেশনেই দেখা হয়ে গেল কৃপাল সিং-এর সঙ্গে। রামস্বরূপ তাঁকে জনান্তিকে টেনে এনে বললে, কৃপালজী! সর্বনাশ হয়ে গেছে! আজ বিকালেই অমৃতসর থেকে

সশস্ত্রবাহিনী আসছে! এখনই সবাইকে সতর্ক করে দিতে হবে!

কৃপাল সিং নিম্নকণ্ঠে বললে, জানি। সেইজন্য দিবারাত্র স্টেশনে পাহারা দিচ্ছি! কে কোন ট্রেনে এসে পড়বে কে জানে! ভয় নেই, বোস-সাহেবকে ও-বাড়ি থেকে সরিয়ে দিয়েছি। আপনার স্ত্রীকেও। কাল রাত্রের ট্রেনেই ওঁরা দু'জন বেনারস চলে গেছেন। এখন শুধু দেখতে হবে এই আপনার মত হুট করে কেউ না এসে ফাঁদে পা দেয়।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল রামস্বরূপের। বললে, আপনি বাঁচালেন আমাকে।

কৃপাল সিং মাথা নেড়ে বললে, বাবুজীকে সেদিনই বলেছিলাম—ঐ শিখ জাতটাই হচ্ছে নেমকহারাম! তা উনি কান করলেন না!

—আপনি কেমন করে খবর পেলেন?—উৎসুক রামস্বরূপের প্রশ্ন।

—বাঃ! আমি যে সি. আই. ডি-র গুপ্তচর! এখান থেকে ঐ বিভীষণ অমৃতসরে মেসেজ পাঠাতেই আমি খবর পেয়েছি। তৎক্ষণাৎ সরিয়ে ফেলেছি বাবুজীকে। কিন্তু আপনি কোন সূত্রে খবরটা পেলেন?

—আমিই তো টেলিগ্রাফখানা রিসিভ করলাম অমৃতসরে!

—মানে? ডেপুটি কমিশনারের তরফে?

—আরে না। আপনি জানেন না? আমি অমৃতসর পোস্ট-অফিসের টেলিগ্রাফ ক্লার্ক।

—হায় রামজী! তা তো আমি জানতাম না! যাই হোক, এখন কি করবেন?

—অমৃতসরেই ফিরে যাব। আমার ট্রেন বেলা দুটোয়।

—তাই যান। ঘন্টা পাঁচেক এখানেই থাকতে হবে। এক কাজ করুন, স্টেশনেই অপেক্ষা করুন। শহরে যাওয়া ঠিক হবে না। টিকটিকিতে ছেয়ে গেছে লাহোর।

রামস্বরূপ এতক্ষণে ধাতস্থ হয়েছে। এতক্ষণে মনে পড়ল কাল রাত্রে কিছু খাওয়া হয়নি। খাওয়ার কথা মনেই ছিল না। ভাবল, শহরে গেলে ক্ষতি কি? সে রীতিমত ছুটি নিয়ে এসেছে, সে সরকারী কর্মচারী, নিজ পরিচয়েই এসেছে—ছদ্মনামে নয়। পুলিসে কতটা তৎপর হয়ে উঠেছে দেখাই যাক না। একটা পাঞ্জাবী দোকানে ঢুকে তরকা রুটি খেল পেটভরে। ঘন্টা-চারেক সময় হাতে আছে। স্থির করল মোচি গেট এলাকায়-যেখানে রাসবিহারী যমুনাকে নিয়ে বাস করতেন—সেদিকে যাব না। ও বরং পায়ে পায়ে চলে আসে ঘড়িঘরের দিকে, চকের মোড়ে। অলসছন্দগতিতে বয়ে চলেছে নাগরিক জীবন। মূলতানী বলদে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বোঝাই গো-গাড়ি। সব্‌জি, আনাজ, গমের বোরা অথবা গৃহনির্মাণের জন্য পাথর। ছুটছে এক্কা, টাঙ্গা, সাইকেল—তফাত যাও! জান্ বাঁচাকে ভাইসাব! অধিকাংশই পদাতিক। সুরকি-মিলে পেষাই হচ্ছে। পাঞ্জাবী, আফগান আর কাবুলি মেওয়া-ওয়ালা মিঠাই-ওয়ালা, আর সব্‌জি-ওয়ালা বসেছে বাজার জাঁকিয়ে। খচ্‌খচ্ করে পা-মেশিনে কুর্তা সেলাই করছে বৃদ্ধ পাঞ্জাবী সর্দারজী। দেশ বিদেশ থেকে সওদাগর এসেছে শহর-লাহোরে দু-কুড়ি সাতের খেলায় অংশ নিতে।

হঠাৎ নজর হল, অদূরে সব্‌জিওয়ালার দোকান থেকে একটি লোক ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হৃষ্টপুষ্ট একজন কনৌজি ব্রাহ্মণ—মুণ্ডিত মস্তক, মাথার টিকিতে একটা ফুল বাঁধা, কপালে তিলক, হাতে বাজারের থলে, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা, মস্ত ঝোলা গোঁফ।

চম্‌কে ওঠে শুকুলজী। এ কে!

লোকটা ঘনিয়ে এসে নিম্নকণ্ঠে বলে, তুমি কখন এলে লাহোরে?

—গুরুজী!

—চুপ! সরে এস এই গলিতে।

স্তম্ভিত হয়ে গেল রামশুকুল। সে কী? রাসবিহারী তাহলে এখনও বেনারস রওনা হননি?

জনবিরল একটা অন্ধ-গলিতে সরে এলেন ওঁরা। নিম্নকণ্ঠে কথোপকথন হল। এক নিশ্বাসে রামস্বরূপ বলে আদ্যোপান্ত ইতিহাস। অমৃতসরে বসে সে পর-পর তিনখানি টেলিগ্রাফ পায়। এক্স-ওয়াই-জেডের টেলিগ্রামখানা পেয়ে সে ছুটি নিয়ে ছুটে আসে লাহোরে। স্টেশনে দেখা হয়েছিল কৃপাল সিং-এর সঙ্গে। বললে, কিন্তু আপনি এখনও লাহোরে আছেন? কৃপাল যে বললে কাল আপনি বেনারসে রওনা হয়ে গেছেন—

বেদনার্ত হয়ে ওঠে রাসবিহারীর মুখ। পরমুহূর্তে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে সেটা। দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, আহ্! আমারই ভুল! মারাত্মক ভুল! কালসাপটাকে আমি চিনতে পারিনি! বিভীষণটা—

—কে? কী বলছেন আপনি?

—ঐ কৃপাল সিং!

—কৃপাল সিং কী?

—মীরজাফর!

সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল মুহূর্তে। কৃপাল সিং জানত না—রামস্বরূপ অমৃতসর টেলিগ্রাফ ক্লার্ক! সেটা জানা থাকলে হায়াৎ খাঁকে টেলিগ্রাফ না করে সে লোক পাঠাতো। রাসবিহরীকে ধরিয়ে দেবার একাধিক সুযোগ পেয়েছিল কৃপাল—কিন্তু সে চেয়েছিল বিপ্লবের পূর্বমুহূর্তে সমস্ত যন্ত্রপাতি সমেত সদলবলে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে। তাই এই মহাসম্মেলনের জন্য সে অধীর প্রতীক্ষায় দিন গুণছে। আজ এই উদ্যোগপর্বের সন্ধ্যায় এখানে অষ্টবজ্র সম্মেলন হচ্ছে—ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে মোচি-গেট ডেরায় আসছে দশ-বারোজন প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী—মূলা সিং, কর্তার সিং, জগৎ সিং, সুরেন সিং, পিংলে, শচীন, বিভূতি, দামোদর ইত্যাদি ইত্যাদি। একসঙ্গে সব কটাকে গেঁথে তুলতে না পারলে কৃপাল সিং-এর স্বস্তি নেই। সে জানে—এদের মধ্যে একজনও যদি জাল ছিঁড়ে পালায় তবে সে-ই নেবে চরম প্রতিশোধ।

নিমেষমধ্যে নূতন কার্যপ্রণালী স্থির করে ফেলেন রাসবিহারী। রামস্বরূপের পকেটে গুঁজে দেন একটা সিগারেটের টিন। বলেন, তুমি বিকেলের মেল ট্রেনটা অ্যাটেণ্ড করবে। ঐ ট্রেনে পিংলের আসার কথা। সে অবশ্য খুব চালাক ছেলে। ট্রেনে হায়াৎ খাঁকে দেখলে নিশ্চয় সরে পড়বে। কৃপাল সিংকে যদি বাগে পাও—

—আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

—মোচি-গেট মহল্লায়। সেখানে ইতিমধ্যেই সাত-আট জন সমবেত হয়েছে। তোমার বউও আছে। এখনই তাদের সরাতে হবে।

ইতিহাস জানে এঁদের দুজনের কেউ সফলকাম হননি। রামস্বরূপ শুকুল বাগে পায়নি

কৃপাল সিংকে। দেখাই পায়নি তার। বড়দাও বাঁচাতে পরেননি আমাদের। উনি মোচি-গেট এলাকার বাড়িতে পৌঁছে দেখেন তার আগেই বাড়িটা ঘিরে ফেলেছে রাইফেলধারী সৈনিক। ভারতীয় নয়, হাইল্যাণ্ডার গোরা সৈনিক। সপার্ষদ রাসবিহারীকে ঘিরে ফেলেছে ওরা—এই ছিল ওদের বিশ্বাস। প্রতি দশ হাত তফাত তফাত দাঁড়িয়ে ছিল লালমুখো গোরা সৈন্য রাইফেল উঁচিয়ে। দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে কৌতূহলী জনতা। সেই জনতায় দাঁড়িয়ে ছিলেন এক কনৌজী ব্রাহ্মণ, চক্রব্যূহের দ্বারপথে অসহায় বৃকোদরের মত। গৃহের অভ্যন্তরে তখন অভিমন্যুবধ হচ্ছে! খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ওরা মারছে আমাদের! অশ্বারোহী সৈনিকের দল ভিড় হটিয়ে দিল। মাথা নিচু করে ফিরে চললেন নিরুপায় মধ্যমপাণ্ডব। কেউ বাধা দিল না তাঁকে। পিছনে তখন দাউদাউ করে পুড়ে যাচ্ছে একটা আকৈশোরের স্বপ্ন—সিঙ্গাপুর থেকে কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত মহাবিপ্লবের পরিকল্পনা!

একযোগে বিভিন্ন এলাকায় 'রেড' করে বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হল। তিনশা জন আসামীর বিরুদ্ধে ক্রমে শুরু হল বিখ্যাত লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা। স্যার মাইকেল ও'ডায়ার তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন : "ঐদিন (১৯.২.১৫) বিকেলের মধ্যে লাহোরের চারটি ভিন্ন ভিন্ন বাড়িতে তল্লাসী চালিয়ে বিদ্রোহীদের সদর-দপ্তর পুলিসে তছনছ করে দেয়। তের জন বিপজ্জনক বিপ্লবী ধরা পড়ে। সেই সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্র, বোমা, বোমা-তৈরীর সরঞ্জাম, বিপ্লবী পুস্তক-পুস্তিকা এবং বিদ্রোহীদের চারটি পতাকা আটক করা হয়। তার একটি পতাকা আমি স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে নিজের কাছে রাখি।"

ঐ পতাকাটা আমার নিজের হাতে তৈরী। তেরঙ্গা ঝাণ্ডা। হলুদ, লাল ও নীল। হরিদ্রাবর্ণ ছিল শিখ জাতির প্রতীক, রক্তবর্ণ হিন্দুর এবং নীলাভ অংশটা মুসলমানদের। এই জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা স্বয়ং রাসবিহারীর। একযোগে ধরা পড়লেন সকলে। পুলিসের বড়-কর্তার একমাত্র দুঃখ—তবু ধরা পড়েনি মূলনায়ক রাসবিহারী, আর তাঁর প্রধান অনুচর বিষ্ণুগণেশ পিংলে।

অপরের কথা জানি না, আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হল লাহোরের কোতোয়ালিতে। প্রথম দিন-তিনেক আমার সঙ্গে ওরা ভাল ব্যবহার করেছিল। থাকতে দিত নির্জন সেল-এ। দিবারাত্র পালা করে ওরা আমাকে নানান প্রশ্ন করে যেত। বীরেন দত্তগুপ্তের গল্প শুনেছিলাম বড়দার কাছে। আমার ঐ এক উত্তর—বলব না!

ক্রমশ ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল তদন্তকারী আই. বি. দারোগার। লোকটা শেষমেশ ক্ষিপ্ত হয়ে বললে—ভাবছ তোমার সব কথা জানি না আমরা? সবই জানি। তোমার স্বামীর নাম রামস্বরূপ শুকুল, অথচ তুমি রাসবিহারীর উপপত্নী হিসাবে এখানে বাস করতে? কী? অস্বীকার করতে পার?

—বলব না!

—বেশ ব'ল না! কিন্তু স্বেচ্ছায় যখন দ্রৌপদী সেজেছ তখন আরও কিছু উপপতিকে আপাতত সহ্য কর! জবাব যদি না দাও তোমাকে ঐ বেলুচ-রেজিমেন্টের ব্যারাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে আজ রাতে! কী, রাজী আছ?

আমি জবাব দিতে পারিনি। হাত-পা হিম হয়ে আসে আমার।

—কী? সব কথা স্বীকার করবে?

—না।

এর পরের পর্যায়টা আর বর্ণনা করতে পারব না! সে রাত্রে আমাকে নির্জন সেল-এ ফিরতে দিল না ওরা। চরম শাস্তি দিল আমাকে। আমার নগ্ন-দেহটাকে নিয়ে ওরা ছিনিমিনি খেলল। সপ্তম কি অষ্টম দানবটার অক্রমণে আমি জ্ঞান হারাই। তারপর আর কিছু জানি না। জ্ঞান যখন ফিরে এল তখন দেখি আমি পড়ে আছি এক নির্জন প্রান্তরে। আমি তখনও সম্পূর্ণ উলঙ্গ। দেহের উপর বিছানো আছে একটা কম্বল। চোখ মেলে তাকাতেই, দেখি একজন বৃদ্ধ মুসলমান ফকির আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলছেন : আর ভয় নেই বেটি! তুই বেঁচে গেছিস্। এইটা খেয়ে নে।

উনি কে, আমি কোথায়, কিছুই বুঝতে পারি না। সর্বাঙ্গে অসহ্য বেদনা। উনি মুখের কাছে কী একটা পানীয় ধরলেন। আমি আকণ্ঠ তাই পান করে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

ক্রমে সুস্থ হলাম। শুনলাম আমাকে উদ্ধার করেছেন ঐ ফকির সাহেব! লাহোর-অমৃতসর সড়কের ধারে ফকির-সাহেবের আস্তানা। পথের ধারে উনি আমাকে কুড়িয়ে পান। ঐ নরপশু-গুলো একটা উলঙ্গ স্ত্রীলোককে পথের ধারে নয়ানজুলিতে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল—ওরা ভেবেছিল আমি মৃত। ফকির-সাহেব আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে আসেন তাঁর আস্তানায়। গাছগাছড়ার রস খাইয়ে বাঁচিয়ে তোলেন আমাকে। গ্রাম থেকে ভিক্ষা করে এনে দিলেন পরিধেয় শাড়ি। বললাম—কেন বাঁচালেন আমাকে? মৃত্যুই তো ছিল আমার একমাত্র মুক্তি!

আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন দূর পাগলী! খোদাতালার দুনিয়ায় ঘন্টা না বাজলে কি কেউ ছুটি পায়?

অদ্ভুত মানুষ ফকির সাহেব। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। সুফি-পণ্ডিত। বয়স ষাটের কাছাকাছি। তবু বার্ধক্যে নুয়ে পড়েননি। দশাসই জোয়ানের মত দেখতে। পরনে দরবেশের বিচিত্র পোশাক। এক মুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি, মাথায় বাবরি চুল, গলায় তিন-চার ছড়া পুঁতির মালা। উনি জানতে চাইলেন—তিনকুলে আমার কেউ আছে কিনা? বললাম, না নেই। শুনতে চাইলেন আমার ইতিহাস। অকপটে সব কথা খুলে বললাম তাঁকে। মায় রাসবিহারীর কথাও। সব শুনে দীর্ঘশ্বাস পড়ল ওঁর। বললেন বেটি! আমি তোর ধর্ম-বাপ! আমাকে ভয় করিস না। ভেবেছিলাম দুনিয়াদারী শেষ হয়েছে আমার। সব ছেড়ে ছুড়ে বের হয়ে পড়েছিলাম আল্লারসুলের নাম নিয়ে। কিন্তু মনে হচ্ছে অভিনয় আমার শেষ হয়নি। শেষ দৃশ্যে একটা অভিনয় মনে হচ্ছে বাকি আছে আমার। না হলে রাসবিহারী বোসের—

—রাসবিহারী বোসকে চেনেন আপনি?

ফকির সাহেব ম্লান হাসলেন। বললেন, জন্ম থেকেই অমি নাঙ্গা ফকির সাজিনি রে বেটি! দুনিয়াদারীর ঘাটে-ঘাটে ডুব দিয়ে এসেছি আমি!

—কোথায় দেশ আপনার?

—দেশ কোথায় সে কথা থাক। জীবনের ত্রিশটা বছর কেটেছে লক্ষ্ণৌয়ে। একজন বাঈজীর আশ্রমে ছিলাম আমি। তার সঙ্গীত-শিক্ষক।

—আপনি সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন? আশ্চর্য! ছেলেবেলায় আমিও ওস্তাদ রেখে গান শিখতাম ঠুংরি আর ভজন!

চম্‌কে ওঠেন ফকির সাহেব। বলেন, বলিস কিরে! কই, শোনা তো একখানা! অনেকদিন ভজন শুনিনি।

এ কাহিনী দীর্ঘতর করে লাভ নেই। আমারই পাপে ফকির সাহেব শেষ পর্যন্ত আবার ফিরে এলেন সংসারাশ্রমে। দুটি পেটের দাবি তো বড় কম নয়। তার উপর আমার আবার আছে আক্রর প্রয়োজন। ফকির সাহেব ফিরে এলেন তাঁর চেনা মহলে। লক্ষ্ণৌয়ে। দড়িয়া-কা-পোলের পাশে মতিবিবির গলিতে। এখানেই জীবনের ত্রিশটা বছর কাটিয়েছেন তিনি। যাঁর নামে এই গলির পরিচয় সেই মতিবিবির সঙ্গীত-শিক্ষকরূপে। শোনা যায়, ফকির-সাহেব ছিলেন কোন জায়গীদারের পুত্র। বাঈজীর প্রেমে সংসার ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন সব ছেড়ে-ছুড়ে। মতিবিবি ছিলেন সে-আমলে লক্ষ্ণৌয়ের সবচেয়ে নাম করা বাঈজী। মোহর শুনে মুজরো নিতেন তিনি। মতিবিবি দেহ রাখার পর তাঁর সঙ্গীত-শিক্ষক ফকিরের বেশে বের হয়ে পড়েছিলেন। চেনামহলে অচেনা নূতন বাঈজী নিয়ে ফিরে আসায় সবাই খুশী হল। এবার বাঈজী ওঁর মহব্বতের মানুষ নয়, এবার উনি তাঁর ধর্মবাপ!

যত্ন করে গান শেখালেন আমাকে। ঠুংরি আর ভজন। যা কিছু কিছু আগেই শিখেছিলাম আমি। উনি তবলা বাজাতেন, বেহালা বাজাতেন—তানপুরা আমি নিজেই বাজাতাম। এক মাসের মধ্যেই রামস্বরূপ শুকুলের গৃহলক্ষ্মী হয়ে উঠল লক্ষ্ণৌয়ের নাম করা বাঈজী।

তারপর একদিন। ফকির সাহেব বাড়ি ছিলেন না। সেটা ফাল্গুন মাস। সন্ধ্যাবেলা আমি একাই বসে গলা সাধছি। হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল। ফকির সাহেব ফিরে এসেছেন মনে করে উঠে গেলাম। দরজা খুলে দিতেই দেখি স্যুট পরা একজন ভদ্রলোক। মাথায় হ্যাট, হাতে চামড়ার স্যুটকেস। মুখে সিগারেট। তাড়াতাড়ি বলি এখানে হবে না। আগিয়ে দেখুন।

লোকটা নির্নিমেষ-নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছি, লোকটা বললে—সতীন! আমাকে চিনতে পারলি না?

ভূত দেখলাম যেন। আঁতকে উঠি : কে? কে আপনি?

লোকটা ভিতরে এসে দরজা বন্ধ করে দিল। মাথা থেকে টুপিটা খুলে বসে পড়ল আমার ফরাশের উপর।

—আপনি! বড়দা!

—হাঁ-রে। অনেক কষ্টে তোর সন্ধান পেয়েছি। রামস্বরূপ আছে আম্বালার জেলে। ওরা সব কজনই ধরা পড়েছে, জানিস বোধহয়। বংশে বাতি দিতে শুধু বাকি আছি আমি আর পিংলে!

—এখানে থাকবেন আজ রাতে?

—উপায় কি বল? কথা ছিল আজ রাতে থাকব ইম্পিরিয়াল হোটেলে—কিন্তু সেখানে টিকটিকির বড় উপদ্রব। তাই চলে এলাম তোর কাছে। মতিবিধির গলিতে রঙিলা-বিবির সন্ধান আমি পেয়েছিলাম! তুই কি এখানে একা আছিস?

—না। এখানে থাকেন আমার ধর্মবাবা—ফকির সাহেব। এখনই এসে পড়বেন তিনি।

—কী মনে হয়? ধরিয়ে দেবে আমাকে?

—নিশ্চয় না। উনি আমার সব কথা জানেন। আপনার নামও শুনেছেন।

—তা হোক। তবু আমার পরিচয়টা দিস্ না।

কথা বলতে বলতেই এসে গেলেন ফকির সাহেব। আমার ঘরে অপরিচিত লোক দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন দ্বারের কাছে।

আমাকে প্রশ্ন করেন : আমি কি ঘন্টা-খানেক পরে আসব বেটি।

আমি বলি, না। আপনি ভিতরে আসুন। কথা আছে।

ওঁকে ভিতরে এনে দরজা বন্ধ করে বলি, ইনি আমার পরিচিত লোক।

একনজর বড়দাকে দেখে নিয়ে ফকির-সাহেব হেসে বলেন, তোর মরদ?

কী জবাব দেব বুঝে উঠতে পারি না। কিন্তু জবাবের অপেক্ষায় ফকিরসাহেব দেরি করেন না। পুনরায় বলেন, অর্থাৎ দু-নম্বর!

চমকে উঠি আমি। বলি, দু-নম্বর মানে?

—মানে—এক নম্বর রামস্বরূপ শুকুল নন।

বড়দা উঠে দাঁড়ান। একেবারে ফকির সাহেবের মুখোমুখি। হাতটা মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে তাঁর। চোয়ালের হাড়টা শক্ত হয়ে ওঠে!

ফকির সাহেব হাসতে হাসতে বলেন, হাতটা মুঠো করছিস কেন ভাই? তোর হাতের মাঝের আঙুলটা দেখে তোকে সনাক্ত করিনি। তোর চোখে যে আগুন জ্বলতে দেখছি রে। ভয় পাস্‌নে! নাঙ্গা ফকির লাখ টাকা নিয়ে কী করবে?

—ভয়? না। আমি ভাবছিলাম—বড়দা আমতা আমতা করেন।

—জানি!—তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ফকির সাহেব আমার দিকে ফিরে বলেন—তাহলে আমার ছুটি? তোর তো একটা হিল্লে হয়ে গেল মনে হচ্ছে!

আমি বড়দার দিকে ফিরি। উনি বলেন, আপনি যদি ছুটিই চান ফকিরসাহেব, তবে নিশ্চয় আপনার ছুটি। যমুনা বোনের দায়িত্ব আমি নিলাম।

—আহ্ বাঁচলাম!—স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল ফকির-সাহেবের। তারপর বড়দার দিকে ফিরে বললেন, একটা কথা ভাইসাব। শহরে একটা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলাম আসবার পথে। রাস্তায় অনেক মাউন্টেড পুলিস দেখলাম। কোতোয়ালির সামনেও একটা কর্মচঞ্চলতা। ওরা বোধহয় তোমার লক্ষ্ণৌয়ে আসার কথা টের পেয়েছে!

তীক্ষ্ণধী রাসবিহারী মুহূর্তমধ্যে বুঝতে পারেন—ঐ ফকির সাহেব সামান্য মানুষ নন। তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি না থাকলে পুলিস-বাহিনীর এই সূক্ষ্ম কর্মচঞ্চলতা সাধারণ মানুষের নজরে পড়বে না। সেই প্রশ্নটাই করেন উনি : ফকির সাহেব! আপনার এ কথাটা তো ঠিক নাঙ্গা-ফকিরের মত হল না! এ সূক্ষ্ম পরিবর্তন একমাত্র তারই নজরে পড়বে যে পলাতক জীবনে অভ্যস্ত!

হাসলেন ফকির-সাহেব। তস্‌বি ছড়াটায় অভ্যস্ত আঙুল চালাতে চালাতে বলেন, ভাইসাব্, তুমি আমার বেটিকে তোমার গুরুর গল্প বলেছ। তাঁর নামটা করনি! আমি কিন্তু তাঁকে চিনেছি। শুধু এইটুকু বলি—তোমার গুরু আমার গুরুভাই!

—মানে?

উদয়পুর স্টেটের ঠাকুর-সাহেবের নাম শুনেছিস? তিনিই অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তোর গুরুকে। আমি সেই ঠাকুর-সাহেবের হাতে গড়া!

রাসবিহারী আভূমিনত হয়ে সেলাম জানালেন ফকির-সাহেবকে। বললেন,আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন ফকির সাহেব। ইম্পিরিয়াল হোটেলে একজন আই. বি. দারোগাকে আমি ছদ্মবেশে দেখেছি। সে বোধ হয় আমাকে চিনতে পেরেছে।

—বুঝলাম। তাহলে ঐ সাহেবের বেশে কিছুতেই আর পথে বের হওয়া উচিত হবে না তোর পক্ষে। আর কোনও ছদ্মবেশ আছে স্যুটকেসে?

রাসবিহারী মাথা নাড়েন। এ. কে. রে-র বেশ যে পরিবর্তন করার প্রয়োজান হতে পারে এ কথা আশঙ্কা করেননি তিনি।

এক মুহূর্ত চিন্তা করে ফকির সাহেব বলেন, তোর কাছে ক্ষুর আছে?

—আছে।

—তাহলে বার্তানিয়ার সঙ্গে লড়াইয়ে তোকে এবার নাঙ্গা ফকিরের দান নিতে হবে। তোর সঙ্গে আমি পোশাক বদলাব। কিছু স্পিরিট-গাম কিনে নিয়ে আসি। আমার দাড়ি আর বাবরি দিয়ে তুই দিব্যি ফকির সেজে বেরিয়ে যাবি। আমি স্যুট পরে চলে যাব পাড়া ছেড়ে। জনাব আফতারুজ্জমান চৌধুরীর পরিচয়ে। বেশ্যাপল্লীতে বুড়ো মানুষ একরাত ফুর্তি করতে এসেছিলাম।

রাসবিহারী পুনরায় আভূমিনত হয়ে সেলাম করেন ওঁকে।

ফকির-সাহেব বেরিয়ে যাবার পর ঘন্টা খানেকও হয়নি, রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ পুনরায় কে যেন দরজায় টোকা দিল। ফকির সাহেবই ফিরে এসেছেন ভাবলাম। তবু দরজা না খুলে প্রশ্ন করি : কৌন?

লোকটা বিশুদ্ধ উর্দুতে যা বলল, তার মমার্থ : হে সুন্দরী! ফাল্গুন যে বৃথা বয়ে যায়। দ্বার খুলে দেখ, কোন পতঙ্গ পুড়তে এসেছে তোমার বহ্নিশিখায়!

বড়দা এক লাফে উঠে পড়েন। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে বাইরেটা দেখে নেন। ছুটে এসে আমার কানে কানে বলেন, পুলিস ইন্সপেক্টর। যতটা পারিস দেরি করে দরজা খুলিস।

নিঃশব্দে টুপি, ছড়ি আর স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে পিছনে অন্ধকার উঠোনে নেমে যান। কিন্তু কোথায় পালাবেন উনি? তিন দিকে খাড়া পাঁচিল, দোতলা বাড়ির। খিড়কির দরজা বলে কিছু নেই এ বাড়িতে।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দরজা খুলে দিতে হল। পুলিস সাহেবের কি একটা প্রশ্নের জবাব দেব না বলায় লোকটা আমাকে প্রচণ্ড চড় মারল। আতিপাতি করে সে খুঁজল সমস্ত বাড়িটা। দারোগার চেয়েও বিস্মিত হলাম আমি। বড়দা কোথায় গা ঢাকা দিলেন? পুলিস ইন্সপেক্টর বিদায় হল। গলির মোড় ছেড়ে চলে গেল দেখে আমি সদর বন্ধ করি। এবার শুরু হল আমার তল্লাসী। আশ্চর্য! জলজ্যান্ত মানুষটা কর্পূরের মত উবে গেছে—মায় তার ছড়ি টুপি, স্যুটকেস। পায়খানার নীচেও টর্চ ফেলে দেখলাম—অমৃতসরের সেই অভিজ্ঞতাটা ভুলিনি। কিন্তু কোথাও নেই তিনি। শেষে উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিতান্ত বোকার মত ঊর্দ্ধমুখে

ডাকি : বড়দা!

—উঁ!—অন্তরীক্ষ থেকেই জবাব এল বোধহয়!

—আপনি কোথায়? বেরিয়ে আসুন।

পরক্ষণেই পাতাল ভেদ করে বেরিয়ে এলেন আমার বড়দা। মাথায় কোটের কলারে লটকানো ছড়ি, কাঁধে ঝোলানো স্যুটকেস। সর্বাঙ্গ ভিজে সপ্ সপ্ করছে। পাতকুয়োর দড়ি বেয়ে উঠে এলেন যেন সার্কাসের এক ট্রপিজের খেলোয়াড়!

—আপনি কুয়োর মধ্যে নেমে পড়েছিলেন?

—উপায় কি? একটু কেরোসিন আর ন্যাকড়া দে। হাবু মিস্তিরের প্রেসেন্টেশানগুলোয় মরচে ধরে যাবে না হলে!

সুনীল দারোগা পাতকুয়োর ভিতরেও টর্চের আলো ফেলেছিল, তখন বড়দা দিলেন মাথা ডুবিয়ে। জলের তলায়।

পরদিন ভিজা স্যুট শুকিয়ে উঠতে বেশ বেলা হল। স্যুটকেস থেকে বড়দা তাঁর মালমসলা বের করে নিলেন। ফকির-সাহেব চুল-দাড়ি কেটে সেই স্যুট পরলেন। একটু ঢিলা হল—তা হোক, একেবারে বে-ঢপ হল না। টুপি মাথায় দিয়ে ছড়ি হাতে যখন তিনি টান টান হয়ে দাঁড়ালেন মনে হল তাঁর বয়স বিশ বছর কমে গেছে। কে বলবে সেই ফকির সাহেব! যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন তিনি। বড়দা সকৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর হাত দুটি ধরে বলতে গেলেন—আপনাকে যে কি বলে—

—ব্যস্! খামোশ। এক কথায় বড়দাকে থামিয়ে দিলেন ফকির সাহেব। আমার মাথায় একখানা হাত রেখে বললেন—আল্লাতালা তোর মঙ্গল করুন।

বড়দার দিকে ফিরে মিষ্টি মিষ্টি হাসলেন। একেবারে অন্য সুরে বললেন—গুডবাই ওল্ড বয়! বেস্ট উইশেস্ ফ্রম জনাব আফতারুজ্জমান চৌধুরী।

বড়দা বললেন, এমন প্রকাশ্য দিনের আলোয় না বেরিয়ে সন্ধ্যার পর—

এবারও মাঝপথে থামিয়ে দিলেন উনি; ঘাবড়াও মৎ ভাইসাব! ঠাকুরসাহেবের হাতে-গড়া হাতিয়ার আমি। ছদ্মবেশে এককালে অনেককিছু করেছি।

তারপর বড়দার মাথায় আলতো করে হাতখানা রেখে আমার দিকে ফিরে বলেন—ইংরেজ নাকি বেনিয়ার জাত! বুদ্ধু! বিলকুল বুদ্ধু! এই মাথার দাম লাখ টাকা? দূর—দূর—দূর! জহুরী হলে বুঝত; এর দাম হচ্ছে সাত পয়জার!

ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বেরিয়ে গেলেন উনি। আমি সদর দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম দিব্যি শিস্ দিতে দিতে গলিটা পার হয়ে গেলেন স্যুটেডবুটেড চৌধুরী সাহেব। গলির মোড়ে যে দুজন সাদা পোশাকের পুলিস বসে আছে তারা ভ্রূক্ষেপও করল না।

মধ্যাহ্ন আহারে বসেছেন বড়দা। আসন-পিঁড়ি হয়ে। আমি পরিবেশন করছি! আজও বানিয়েছি তাঁর প্রিয় খাদ্য—গোস্ত-রুটি, ঝিঙে পোস্ত আর অড়হড় ডাল। জিজ্ঞাসা করলাম, মাংসটা কেমন হয়েছে?

সে কথার জবাব দিলেন না। গ্রাসটা গলাধঃকরণ করে বললেন, মাঝে ভীষণ মনমরা হয়ে পড়েছিলাম, জানলি। হঠাৎ এক বন্ধুর মাধ্যমে ভাই পরমানন্দজীর একখানা চিঠি এল।

উনি বলেছেন, নিরাশ হয়ো না। ভিতর থেকে না হলে বাইরে থেকে আক্রমণ করতে হবে। তুমি ভারতবর্ষের বাইরে চলে যাও! ঐ চিঠিখানা পেয়েই উৎসাহ ফিরে এল। ঠিক করলাম —তাই যাব। আমি, পিংলে আর শিরে।

বুঝতে পারি উনি কতদূর বিচলিত হয়ে পড়েছেন। অমৃতসরে কৃপাল সিং যখন দুঃসংবাদ নিয়ে এল তখন উনি বলেছিলেন, গোস্ রুটি ছেড়ে শুকতানি খেতে উনি নারাজ। আর আজ উনি ওঁর প্রিয় খাবারও মন দিয়ে খাচ্ছেন না।

আহারান্তে কিন্তু বললেন, অনেকদিন পরে তৃপ্তি করে খেলাম, সতীন!

বলি, আমারও অনেক দিন ধরে শখ ছিল আপনাকে সামনে বসিয়ে খাওয়াব।

হাসলেন! বললেন, ঐ তোদের এক বুলি! আমার এক বোন আছে, জানলি—তার নাম সুশীলা। সেও শুধু ঐ কথা বলে। ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার আগে তার পুকুরের মাছ খেতে একবার যেতে হবে। আজ পাঁচ বছর ধরে তাল ভাঁজছি, কিছুতেই যাওয়া হচ্ছে না। এবার যাব। নিশ্চিত যাব।

দুপুরে বসলাম বড়দার শার্টটা সেলাই করতে। উনি তখন স্পিরিট গাম দিয়ে ফকির সাহেবের দাড়ি আঁটছেন। ঘন্টা-খানেকের মধ্যেই উনি রূপান্তরিত হয়ে গেলেন ষাট বছরের বুড়োয়। মাথায় কাঁচা পাকা বাবরি চুল, দু-গালে বার্ধক্যের খাঁজ, এক মুখ দাড়িগোঁফ, পরনে দরবেশের আলখাল্লা! আমিও চিনতে পারছিলাম না।

জিজ্ঞাসা করি—হঠাৎ লক্ষ্ণৌ এসেছিলেন কেন?

—কাপ্‌লেকে একটা নিরাপদ আশ্রয়ে লুকিয়ে রেখে যেতে।

—কাপ্‌লে! কাপ্‌লে আবার কে?

—বিনায়ক রাও কাপ্‌লে। তুই তো চিনিস। তোর বাড়িতে সে খেয়েও গেছে। সেই যে ফর্সা মতন, সুন্দর দেখতে মারাঠী ছেলেটা।

আমি অন্ধকারে হাতড়াতে থাকি।

হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠেন। বলেন : ওহো! আমারই ভুল। সত্যেন রে, সত্যেন। ছেলেটা বাঙালী নয়, মারাঠী!

—তাই নাকি! সত্যেনবাবু মারাঠী? বিনায়ক কাপ্‌লে নাম ওঁর! কিন্তু ওঁকে পৌঁছে দেবার জন্য আপনাকে নিজে আসতে হল কেন?

—সে অনেক কথা। এক-কাঁড়ি গল্প করতে হবে তাহলে!

—তা এক-কাঁড়ি গল্পই না হয় করলেন! আর তো কোন রাজকার্য নেই আপনার? অন্ধকার না হলে তো বের হওয়া যাবে না!

স্থির হয়েছিল রাত একটু গভীর হলে আমি দরজায় তালা দিয়ে একটা টাঙা ভাড়া করে আনব। তারপর টাঙায় চেপে আমি আর ফকিরসাহেব বেরিয়ে যাব গলি ছেড়ে। ওঁর পোশাকটা এতই বিচিত্র, আর এ-পাড়ায় এতই পরিচিত যে, মুখটা দেখতে না পেলে কেউ কোন সন্দেহ করবে না। টাঙা চেপে এভাবে আমি আর ফকির-সাহেব প্রায়ই বের হতাম। ফলে সন্ধ্যার অন্ধকারের জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। হাতে অখণ্ড অবসর। তাই বড়দাকে চেপে ধরলাম, সেই উনিশে ফেব্রুয়ারী থেকে এই তেইশ-

এ মার্চ পর্যন্ত এক মাসের মধ্যে যা যা ঘটেছে তা বলতে হবে। বড়দা আমার অনুরোধ রাখলেন—

সেই উনিশ তারিখেই বড়দা হাঁটা পথে লাহোর ত্যাগ করেন। সঙ্গে ছিলেন ঐ বিনায়ক রাও কাপ্‌লে। দুটো স্টেশন পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়ে তবে ট্রেনে ওঠেন। পরদিনই এসে উপস্থিত হন কাশীতে। শচীন সান্যালের গুপ্ত-ঘাঁটিতে। কাশী-গ্রুপের কেউই তখনও ধরা পড়েনি। পুরো একমাস উনি ছিলেন কাশীতে। বিশে মার্চ পিংলে অনেক ঘুর পথে কাশীতে এসে পৌঁছাল। সঙ্গে দ্বাদশ অশ্বারোহী বাহিনীর জমাদার নাদির খাঁ। নাদির খাঁ নাকি তার ক্যান্টনমেন্টে একটা দল পাকিয়েছে। কিছু বোমা পেলে সে ওখানে একটা খন্ড-বিপ্লব বাধাতে পারে। তবু পিংলে নাদির খাঁকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি। তার চোখ বেঁধে একটা ঘোড়ার গাড়িতে করে নিয়ে এসেছিল গুপ্ত-ঘাঁটিতে। রাসবিহারী প্রথমটায় বিশ্বাস করেননি ওকে—কিন্তু পিংলের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত রাসবিহারী এক বাক্স কালীমাইমার্কা বোমা ওদের হাতে দেন। পিংলে আর নাদির খাঁ পরদিন, অর্থাৎ একুশে মার্চ ঐ বোমার বাক্সটা নিয়ে মীরাট চলে গেছে। তেইশে অর্থাৎ আজ, মীরাট ক্যান্টনমেন্টে বিদ্রোহ হবার কথা। সেটা হয়েছে কি হয়নি, কালকের কাগজে জানা যাবে।

সব শুনে আমি বলি—এর সঙ্গে সত্যেনবাবুর কী সম্পর্ক?

—না, সেটা অন্য একটা ব্যাপার।

—তবে সেটাও বলুন।

—শুনলাম সত্যেনের ইতিহাস। অর্থাৎ বিনায়ক রাও কাপ্‌লের। কাশীতে ফিরেই কাপ্‌লের সংবাদ পেয়ে পুলিশ তার পেছনে ঘুরছে। ওকে না পেয়ে পুলিসে নাকি ওর পরিবারবর্গের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে। সেই অত্যাচারের বর্ণনা শুনে কাপ্‌লে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কোন্ পুলিস অফিসার অত্যাচারটা করেছে তাই জানবার জন্য ও পাগলের মত ছুটোছুটি করতে থাকে। আত্মগোপনের কোন চেষ্টাই সে করেনি। ফল যা হবার তাই হল। অচিরে ধরা পড়ে গেল বিনায়ক কাপ্‌লে!

খবর এল গুপ্ত-কেন্দ্রে। মর্মাহত হলেন রাসবিহারী! কিন্তু খবরের শেষ ওখানেই নয়। শোনা গেল—বিনায়ক কাপ্‌লে পুলিশের কাছে একট স্টেটমেন্ট দিয়েছে। সকলের নাম আর পরিচয় দিয়ে বসেছে। কেউ বললে—মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে তার। পরিবারস্থ সকলের উপর অমানুষিক অত্যাচারের কথা শুনে সে সাময়িকভাবে উন্মাদ হয়ে গেছে। কেউ বললে—তা নয়, ও রাজসাক্ষী হতে চায়। তাই এই স্বীকারোক্তি।

কারণ যাই হোক, অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর। কোন অবস্থাতেই বিপ্লবী অপর কারও নাম করবে না, এই ছিল প্রতিজ্ঞা। সে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করেছে বিনায়ক। বিপ্লবীর দরবারে তার বিচার চাই—না হলে সঙ্ঘকে বাঁচানো যায় না।

গভীর রাত্রে বসল বিচারসভা। আসামীর অনুপস্থিতিতেই। রুদ্ধদ্বারকক্ষে মোমবাতির আলোয় সমবেত হলেন আটজন প্রাণী। শচীন সান্যাল, মন্মথ বিশ্বাস, নলিনীবাবু, গিরিজাবাবু, প্রিয়নাথ, বিভূতি, সুশীল লাহিড়ী আর স্বয়ং রাসবিহারী।

সংক্ষিপ্ত বিচার। শচীন সান্যাল সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন অপরাধের গুরুত্ব। বিশ্লেষণ

করে একথাও বললেন—রায় দেবার আগে সকলে যেন মনে রাখেন—অপরাধী মানসিক যন্ত্রণায় ভুগেছিলেন—হয়তো সাময়িকভাবে তিনি মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন।

ভোট নেওয়া হল। আটজনের ভিতর সাতজনই বললেন : মৃত্যুদণ্ড!

অষ্টম বিচারক রাসবিহারী বললেন—তোমাদের সকলের বিচার আমি মাথা পেতে মেনে নিতে বাধ্য।

—কে এ দায়িত্ব নেবে?

রাসবিহারী বললেন, সেটা আমি স্থির করব। কে যে এ দায়িত্ব নিচ্ছে তা বাকি সাতজন জানবে না। আমরা সবাই জানব—আমাদের যৌথ সিদ্ধান্তে কাপ্‌লেকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া হল।

—লটারী?

—হ্যাঁ, তাই।

আটখণ্ড কাগজ নেওয়া হল। তার মাত্র একটিতে ঢেরা দেওয়া। আটজন চোখ বুজে তুললেন। কে যে জল্লাদরূপে নিযুক্ত হলেন তা অপর সাতজন জানল না।

রাসবিহারী বললেন, আমি একটা লোডেড রিভলভার টেবিলের উপর রেখে মোমবাতি নিবিয়ে দেব। যে এ দায়িত্ব পালনের অধিকার পেয়েছে সে ওটা তুলে নিয়ে পকেটে রাখবে! আর কেউ হাত বাড়াবে না।

এক মিনিট পরে আবার যখন আলো জ্বালা হল তখন দেখা গেল রিভলভারটা টেবিল থেকে অন্তর্হিত হয়েছে!

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠি : সে কি! আপনিও জানলেন না?

—না, আমিও নয়।

—আপনিই পিস্তলটা তোলেন নি তো?

—না। ঢেরা দেওয়া কাগজটা আমার হাতে ওঠেনি।

—তারপর?

—তার পরের ইতিহাসটাই করুণ। সত্যেনকে আমি ভীষণ ভালবাসতাম; কিন্তু কী করব? দলের সংহতি রাখতে গেলে ক্ষেত্রবিশেষে আমাকে নিষ্ঠুর হতে হবে। বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষমা নেই বিপ্লবীর অভিধানে! তবু সত্যেন! সে যে আমার হাতে গড়া! সারা রাত আমার ঘুম হল না। ভোররাত্রে একটু তন্দ্রা মত এসেছিল। অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলাম, সত্যেনকে নয়—স্বপ্নে দেখলাম বীরেন দত্তগুপ্তকে! বাঘা-যতীন নয়, আমিই বীরেনের রক্তাক্ত মুখটা দুহাতে তুলে ধরেছি, আর বলছি—কাঁদিস না বীরেন, কাঁদিস না! ক্ষুদিরাম কাঁদেনি, কানাই কাঁদেনি, চারু বোস কাঁদেনি আর আমার হাতে গড়া সত্যেন....হ্যাঁ স্বপ্নের ঘোরে সত্যেনই বললাম আমি — কারণ ঠিক তার আগেই অদেখা বীরেন দত্তগুপ্ত রূপান্তরিত হয়ে গেছে সত্যেনে! ওর ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল। অস্ফুটে বললে—কিন্তু আমি যে ট্রেইটার!....জবাবে কী একটা কথা বলতে গেলাম আমি, কিন্তু কিছুতেই বলতে পারলাম না। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে আমার কণ্ঠনালীতে; কিন্তু কথাটা মুখ ফুটে বের হল না কিছুতেই।

—অদ্ভুত স্বপ্ন তো! তারপর?

—পরদিন সকালে আমি ওদের বললাম সত্যেনের সঙ্গে দেখা করতে চাই। ওরা বললে, সেটা নিতান্ত অসম্ভব। আমি সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নই। রাজসাক্ষী হওয়ায় সত্যেন জামিন পেয়েছিল। খবর পাঠালাম ওকে। বললাম, চৌষট্টী-যোগিনী ঘাটে রাত আটটার সময় নৌকো নিয়ে আমি অপেক্ষা করব। এমন নির্দেশ সে বহুবার পেয়েছে। আমার নৌকো সে চেনে। তোমাকে কী বলব সতীন—ছেলেটা অকুতোভয়ে একা চলে এল। সে জানত বিপ্লবীরা তাকে যে-কোন মুহূর্তে হত্যা করতে পরে। অথচ আমাকে সে ভয় করল না। ....ওর সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম সে সম্পূর্ণ সুস্থমস্তিষ্ক। সাময়িকভাবে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে পুলিসের কাছে সে কী বলেছে না বলেছে তা তার মনে নেই। তবে অনেক গুপ্ত কথা যে সে বলে ফেলেছে এটুকু বোধ আছে। জিজ্ঞাসা করলাম—সত্যেন, এ অপরাধে কী শাস্তি আমরা দিয়ে থাকি তা তুমি জান? ও ম্লান হেসে বললে, ভুলিনি দাদা! আমি যে অপরাধ করেছি তাতে আমার মৃত্যুদণ্ডই তো হওয়া উচিত। কৃপাল সিং-এর যদি বিচার হয়—আমিও ঐ রায় দেব!....জিজ্ঞাসা করলাম ওর পরিবারের কথা। বললে, এখন তাঁরা ভাল আছেন। ওর স্ত্রী আছে, একটি মেয়েও আছে।....আবার জিজ্ঞাসা করলাম, ও অনুতপ্ত কিনা। জবাবে সোজাসুজি বললে : না! অনুতাপ কখন হয় দাদা? যখন বুঝতে পারি সজ্ঞানে একটা অন্যায় করেছি। আমি তো সজ্ঞানে কোন অন্যায় করিনি! আমি তো স্বপ্নের ঘোরে! হ্যাঁ আমি দুঃখিত—যা ঘটে গেছে তার জন্য মর্মান্তিক দুঃখিত। কিন্তু না। অনুতপ্ত আমি নই। শাস্তি নিতে অবশ্য আমি প্রস্তুত!

দামোদর কাপ্‌লেকে দশাশ্বমেধ ঘাটে নামিয়ে দিয়ে রাসবিহারী ফিরে এলেন ওঁদের আড্ডায়। পূর্ব-রাত্রের সাতজন সহকর্মীর তিনজন ইতিপূর্বে বিদায় হয়েছেন। বাকি চারজনকে ডেকে উনি বললেন—আমরা কাল অন্যায় সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সত্যেন ভুল করেছে, কিন্তু অন্যায় করেনি! সে সজ্ঞানে কোনো পাপ করেনি।

ওঁরা চারজন নীরব রইলেন।

—তোমরা কী বল?

শচীন সান্যালই প্রথমে কথা বললেন—আটজন সিদ্ধান্ত নিয়েছি! এখন আমরা পাঁচজন আছি মাত্র।

রাসবিহারী উত্তেজিত হয়ে বলেন : বেশ, তোমরা বল—ঢেরা দেওয়া কাগজখানা কি তোমাদের মধ্যে কেউ পেয়েছ?

কঠিনতর কণ্ঠে শচীন সান্যাল বলেন—দাদা! আপনি কিন্তু শর্ত ভাঙছেন। প্রকারান্তরে স্বীকার করলেন যে, ঢেরা দেওয়া কাগজটা আপনি পাননি! কিন্তু ও-প্রশ্নের জবাব চাওয়া কি ঠিক হচ্ছে আপনার? আমাদের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে?

স্পষ্টবক্তা শচীন সান্যাল! রাসবিহারীকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু বিপ্লবীর কোড-অব-এথিকস্ বড় নিষ্ঠুর!

রাসবিহারী অস্ফুটে বললেন : আয়াম সরি! কিন্তু ভেব না আমার আদেশ আমার চেয়েও বড়। আমি আমার আদেশ প্রত্যাহার করছি না—কিন্তু আমার বাঁ-হাত আমার ডান হাতের আক্রমণ থেকে ওকে রক্ষা করবে!

আমি সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করি : তারপর?

—আমার সাতজন বিশ্বস্ত অনুচরের হাত থেকে আমি সত্যেনকে বাঁচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। ওরা কেউ সন্ধান পায়নি তার। অথচ ওদেরই একজন আমারই আদেশে আমারই রিভলভার নিয়ে ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে! তাকে ক্ষান্ত হবার আদেশ জারি করতে পারছি না।

গল্প করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে এল। আমি মালপত্র গুছিয়ে নিলাম। বড়দা ক্লান্ত হয়ে ফরাশে চিত হয়ে পড়লেন। রাত আর একটু না বাড়লে, আর একটু গভীর না হলে বের হওয়া উচিত হবে না। জিজ্ঞাসা করলাম, কৃপাল সিং-এর কী হল?

—সে পাঞ্জাবে নেই। সম্ভবত ভারতবর্ষেই নেই। মোটা অঙ্কের পুরস্কার দিয়ে তাকে ভারতবর্ষের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইংরেজ সরকার জানে, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক চৌহদ্দির ভিতর কৃপাল সিং-এর পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব! দুর্ভাগ্য আমাদের, কানাই দত্ত আজ বেঁচে নেই—নাহলে মঙ্গল গ্রহে পালিয়েও কৃপাল সিং রক্ষা পেত না। বিশ্বাসঘাতকের চরম শাস্তি তাকে পেতে হত।

—আপনার কি মনে হয়? আজকে মীরাটে বিপ্লব হয়েছে?

দাদা উঠে বসেন। বলেন, ওসব বাজে কথা ছেড়ে একটা গান শোনা দেখি। এককালে আমারও গান-বাজনার ঝোঁক ছিল, জানলি? শোনা! একটা ভজন শোনা! দে বেহালাখানা দে!

—আপনি বাজাতে জানেন?

—তা না তো কি শুধুই বোমাবাজি করতে জানি?

উনি বেহালা নিয়ে বসলেন। আমি গান শুরু করলাম! অন্তরা পর্যন্ত পৌঁছাতেই হঠাৎ বেহালা বন্ধ হয়ে গেল। তাল কেটে যাওয়ায় বড়দার দিকে তাকাই। উনি নীরবে বেহালার ছড়টা তুলে জানালার দিকে ইঙ্গিত করলেন! সেদিকে তাকিয়েই আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। গতকালকার সেই পুলিশ ইনস্পেক্টর! জানালা দিয়ে উঁকি মারছে!

পরক্ষণেই দ্বারে করাঘাত হল। বড়দা আমার কানে কানে বলেন, বেটা আমাকে দেখে ফেলেছে। ভয় নেই, দরজা খুলে দে!

আশ্চর্য! সুনীল দারোগা বড়দাকে চিনতে পারল না। ওর জবানবন্দী পড়ে এতদিন পরে বুঝতে পারছি তার কারণটা ছেদিলালের কাছ থেকে ফকির সাহেবের নিখুঁত বর্ণনা শুনে লোকটার মনে কোন সন্দেহ জাগেনি। ছেদিলাল বলেছিল, সে চল্লিশ বছর ধরে ঐ ফকির-সাহেবকে চেনে!

আবার গান গাইতে হল। বড়দা বেহালা বাজাচ্ছিলেন। বাঁ-হাতটা মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় মীড়-গমক তুলছে বেহালার তারে। মাঝের আঙুলটাও আজ ফকির-সাহেবের ছদ্মবেশ পরেছে যেন! দৃশ্যটা মনে হলে আমার প্রচন্ড হাসি পায়। সুনীল দারোগা আজও জানে না সে স্বয়ং রাসবিহারীকে বিলাইতি মদের ফর্মাইস করেছিল।

আমার পরিবেশিত মদের মধ্যে যে ঘুমের ঔষধ ছিল তাতে অনতিবিলম্বেই ঘুমিয়েই পড়ল লোকটা। আমরা মালপত্র গুছিয়ে ইতিপূর্বেই তৈরী হয়ে ছিলাম। বড়দা একবার ঠেলা দিয়ে দেখলেন। নাঃ। অঘোরে ঘুমোচ্ছে কুম্ভকর্ণ। ওর গিলেকরা পাঞ্জাবিটা উঁচু করে ধরে

এবার মাজায় হাত দিলেন। জাদুকর যেমন টুপির ভিতর থেকে খরগোশ পয়দা করে তেমনিভাবে সওদা করে আনলেন একটা রিভলভার। ধীরে-সুস্থে এবার উল্টে দিলেন ঐ মুর্দাপ্রতিম লোকটাকে। ওদিকের গেঁজে থেকে আমদানি হল কিছু টোটা। তারপর নিজের মানিব্যাগ খুলে একটি আইভরি-ফিনিসড ভিজিটিং কার্ড বের করে ঢুকিয়ে দিলেন শূন্যগর্ভ রিভলভারের খাপে।

—ও আবার কি রসিকতা?—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি আমি।

বড়দা হেসে বলেন—রসিকতা নয় রে সতীন। ও ব্যাটা জেনে রাখুক এ কাজ এ. কে. রে, বার-অ্যট-ল-র। নাহলে খামকা জনাব অফতারুজ্জমানের পিছনে পুলিশ লাগাবে। তাঁকে উত্ত্যক্ত করে তুলবে!

বেরিয়ে এলাম পথে। ফকির-সাহেবকে নিয়ে বিনা বাধায় চলে এলাম স্টেশনে। কথা ছিল, আমরা দুজনে আপাতত যাব বেনারসে। বড়দা আমার কানে কানে বললেন : 'পথে নারী বিবর্জিতা' কথাটা একেবারে ভুল। তুই সঙ্গে থাকায় সাদা পোশাকের টিকটিকিগুলো আমাকে নজরই করল না।

বেশ খুশিয়াল হয়ে উঠ্লাম আমরা দুজনেই।

তখনও জনতাম না নেপথ্যে উদ্যত হয়ে আছে বজ্র। স্টেশনে এসে পাওয়া গেল খবর। 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'-র সান্ধ্য সংস্করণ বেরিয়েছে। বড়দা স্টেশনে এসেই একখানা কাগজ কিনলেন। পড়তে পড়তে গম্ভীর হয়ে গেলেন। নীরবে কাগজখানা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে।

প্রথম পাতাতেই বের হয়েছে দুটি মর্মান্তিক সংবাদ। ভারতের দুই প্রান্তে ঘটেছে দুটি ঘটনা। মীরাটে দ্বাদশ অশ্বারোহী বাহিনীর জমাদার নাদির খাঁর কৌশলে হাতে-নাতে ধরা পড়েছে কুখ্যাত বিপ্লবী রাসিবহারী বসুর অনুচর বিষ্ণুগণেশ পিংলে। তার কাছে পাওয়া গেছে দশটি পিক্রিক অ্যাসিড বোমা, দশটি কাচের বাল্ব এবং বোমা বানানোর প্রয়োগ কৌশল সম্বন্ধে একটি লিফ্লেট। নাদির খাঁ ছিল পুলিশের স্পাই!

শুধু তাই নয়। ঐ সঙ্গে কাগজে বের হয়েছে আরও একটি সংবাদ। ভারতের পূর্ব-প্রান্তে হাওড়া স্টেশনে বেঙ্গল পুলিশ অতর্কিতে গ্রেপ্তার করেছে আর একজন কুখ্যাত বিপ্লবীকে। তার নাম শ্রীশচন্দ্র ঘোষ। চন্দননগরে তার বাড়ি। এতদিন গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছিল। কিছুতেই তাকে এতদিন ধরা যায়নি!

একসঙ্গে পর পর দুটি বজ্র। কিন্তু মুখের মাংসপেশী একটু বিকৃত হল না তাঁর। শান্তভাবে গ্রহণ করলেন যুগল বজ্র। আমাকে জনান্তিকে সরিয়ে এনে বললেন—সমস্ত পরিকল্পনাটা বদলে ফেলতে হবে। এখন তো আর তোকে আমার কাছে রাখতে পারছি না।

বলি—আমি না হয় ফিরে যাই।

—কোথায়? ঐ মতিবিবির গলিতে? পাগল!

এক মুহূর্তে কি ভেবে নিলেন। তারপর বললেন, তুই ঐ বেঞ্চিটাতে গিয়ে বস। আমি এখনই আসছি।

একটু পরে ফিরে এলেন তিনি। আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন একখানা টিকিট আর একটা

ছোট্ট হাত-চিঠি। টিকিটখানা তৃতীয় শ্রেণীর—হৃষিকেশের। চিঠিখানা খুলে দেখলাম লেখা আছে : 'স্বামীজী, পত্রবাহিকা আমার নিজের বোনের মত। অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী। একে আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় দিন! এর কাহিনী এর মুখেই শুনবেন। ইতি—

গুণমুগ্ধ

চুচেন্দ্রনাথ দত্ত ২৩.৩.১৫

দেরাদুন এক্সপ্রেসে তুলে দিলেন আমাকে।

সেই তাঁকে শেষ দেখি। হৃষীকেশে যোগানন্দ আশ্রমে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এক কথায়। তারপর দীর্ঘ আটান্নটা বছর কেটে গেছে। আমি আজও এই আশ্রমের সন্ন্যাসিনী। এরা আমাকে মাতাজী বলে ডাকে। একুশ বছর বয়সে এসেছিলাম এখানে; এখন আমার বয়স ঊনআশী। পলিতকেশা বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী। বড়দার পরবর্তী কীর্তি কাহিনী কিছু কিছু শুনেছি। জাপানে তিনি বিবাহ করেছিলেন, আজীবন ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। লালা লাজপত, সান-ইয়াৎ সেন, রবীন্দ্রনাথ এবং শেষ-মেষ সুভাষচন্দ্র। কিন্তু সে-সব কথা বলার অধিকার আমার নেই।

যে কথা জানাবার জন্য এই জবানবন্দীর অবতারণা, আশাকরি সেটা প্রমাণ করেছি আমি। আমার পূর্ববর্তী সাক্ষী সেই মহাবিপ্লবীর বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ এনেছিলেন—তিনি পরস্ত্রীর সঙ্গে রাত্রিবাস করেছেন, তিনি নিষিদ্ধ পল্লীতে রাত কাটিয়েছেন! এ দুটি হিমালয়াস্তিক অভিযোগই যে অতলান্তিক মিথ্যা তা আশাকরি আপনারা এতক্ষণে অনুধাবন করেছেন। সেটাই ছিল আমার উদ্দেশ্য—এই কমিশনে সাক্ষী দিতে আসার।

চিতাভস্ম আনা-না-আনার বিষয়ে আমার মতামত?

আজ্ঞে না! আমার সুচিন্তিত অভিমতঃ রাসবিহারীর চিতাভস্ম স্বাধীন ভারতবর্ষে আনা অনুচিত। আমরা স্বাধীনতার বড়াই করি, সভ্যতার গুমর করি। সুতরাং আমাদের একটা দায়িত্ব আছে! রাসবিহারী বসু-মশাই যে আকাশচুম্বী অপরাধ করেছিলেন তার শাস্তি পরাধীন ভারত সরকার দিতে পারেনি। কারণ সে আমলের ভারত-গদি-আসীন তাঁর নাগালই পাননি। কিন্তু পরাধীন ভারতের সব 'অ্যাসেট' এবং 'লায়াবেলিটি' তো স্বীকার করে নিয়েছি আমরা। সুনীল ঘোষ-মশাই তাই আজও পেনশন্ পাচ্ছেন। ভারতবর্ষের সেই tradition তো সমানে চলেছে! রাসবিহারী বসুই বা কী এমন তালেবর ব্যক্তি যে তাঁর প্রাপ্য শাস্তি এড়িয়ে যাবেন? ইতিহাস খুলে দেখুন, এ জাতীয় অসভ্য বর্বরকে সভ্যতা যুগে যুগে শাস্তি দিয়েছে—তাকে হেমলক্-পানে হত্যা করেছে, নতজানু করেছে, কাঁটার মুকুট মাথায় পরিয়েছে, ক্রুশ বিদ্ধ করেছে! রাসবিহারী বসুর অপরাধ অতটা গুরুতর নয়,—তবু সেই tradition অনুযায়ী অন্তত ঐ একমুঠো ছাইয়ের প্রতি অসম্মান দেখাবার মত নৈতিক অধিকার নিশ্চয় আছে স্বাধীন ভারতবর্ষের।

নারায়ণ সান্যালের জবানবন্দী

আজ্ঞে না। রাসবিহারী বসু-মশাইকে আমি চর্মচক্ষে দেখিনি। তিনি চিরকালের মত ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যাবার নয় বছর পরে আমি ভারতবর্ষে পদার্পণ করি। তিনি চিরকালের মত জাপান ত্যাগ করে যাবার পঁচিশ বছর পরে আমি জাপানে পর্দাপণ করি। তাই আক্ষরিক অর্থে আমি প্রত্যক্ষদর্শী নই। তবু সাধ্যমত তাঁর লুপ্ত পদচিহ্ন রেখা ধরে তাঁকে খুঁজে পাবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা আমি করেছি। বিভিন্ন সাক্ষী তাঁদের জবানবন্দীতে অনেক কথা অনুক্ত রেখে গেছেন—সে-সব প্রশ্নের উত্তর তাঁরা জানতেন না। শহীদ বসন্ত বিশ্বাস তাঁর জবানবন্দীর শেষে বলেছেন 'একই দিনে ফাঁসি যাব, নাহলে বাল-মুকুন্দজীর ফাঁসির পরে দেখতাম, রামরাখী কী বলে।' বসন্ত বিশ্বাস এ প্রশ্নের জবাব জেনে যেতে পারেননি। স্বয়ং রাসবিহারী জেনে যেতে পারেননি; তাঁর নিষ্ঠুর মৃত্যুদণ্ড আর উদার ক্ষমা—কোনটা লাভ করেছিল তাঁর অনুজ-প্রতিম সহচর বিনায়ক রাও কাপ্‌লে। সেইসব অকথিত কাহিনী আপনাদের সামনে বলার জন্যই আমি এই কাঠগোড়ায় উঠে দাঁড়িয়েছি, ধর্মাবতার।

রাসবিহারীর কীর্তি-কাহিনীর প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থ লিখবার সময়। তিন বছর আগে। নেতাজীর শেষ অন্তর্ধান-রহস্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে পূর্ব-এশিয়ার কয়েকটি স্থানে গিয়েছিলাম আমি। ঐ সময়ে রাসবিহারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। জাপানে তাঁর বাড়ি, তাঁর ব্যবহৃত পোশাক, তাঁর কীর্তি-কাহিনীর কথা দেখি ও শুনি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এশিয়া কাইকানে বাস করেছি, তাঁর নাকামুরায়া রেস্তোরাঁতে মেনুকার্ড খুঁজে 'বোস-চিকিন-কারি'র রসাস্বাদন করেছি, তাঁর সহকর্মীদের কাছে অনেক গল্প শুনেছি। ধাক্কা খেলাম প্রথমে রেঙ্কোজি মন্দিরে। টোকিওর ঐ রেঙ্কোজি মন্দিরে সুরক্ষিত আছে নেতাজীর তথাকথিত চিতাভস্ম। মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত অশীতিপর বৃদ্ধ রেভারেন্ট মোচিজুকির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি ইংরাজি জানেন না, দোভাষীর কাজ করছিলেন আমার বন্ধু জাপানী সাংবাদিক য়োকোবোরি। রেভারেন্ট মোচিজুকি জানতেন—অধিকাংশ ভারতবাসী বিশেষ করে আমার মত বাঙালী বিশ্বাস করে না—ঐ চিতাভস্ম নেতাজী সুভাষচন্দ্রের। তাই আমি যখন বললাম—'ঐ চিতাভস্ম নেতাজীর হোক বা না হোক, আপনি যে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে আমাদের প্রিয় নেতাজীর উদ্দেশে প্রতি সন্ধ্যায় দীপ জ্বালচ্ছেন, ধূপ জ্বালচ্ছেন, এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আপনার জানার কথা নয় এ ভস্ম কোথা থেকে কেমন করে এল-আপনি আপনার বিশ্বাস মত তাঁকে আজ শতাব্দীর একপাদ-কাল যে সম্মান দেখিয়েছেন তাতে ভারতবাসী হিসাবে আমি আপনাকে আমার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছি।' তখন উনি হেসে বললেন : 'একটা কথা! নেতাজীর চিতাভস্ম সম্বন্ধে আপনাদের সন্দেহ আছে তাই সেটা আপনারা সসম্মানে স্বদেশে নিয়ে যাচ্ছেন না। এ কথার অর্থ বুঝি। কিন্তু 'সেনসাই'য়ের অর্থাৎ রাসবিহারী বসুর চিতাভস্ম সম্বন্ধে সন্দেহের তো কোন অবকাশ নেই? তাঁর শেষ ইচ্ছা পূরণে এত আপত্তি কেন আপনাদের? তিনি আপনাদের গান্ধীজির মত অহিংসাব্রতী

ছিলেন না বলে?'

আমি এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনি। জবাব আমি জানতাম না। আপনারা জানেন?

দেশে ফেরার সময় য়োকোবোরির সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ সময়ে উনি বললেন, 'মিস্টার সান্যাল, রাসবিহারীর ভাল জীবনী আছে? মানে উনিশ শ'পনের পর্যন্ত? তার পরের কীর্তিকাহিনী নিয়ে জাপানী ভাষায় অনেক বই আছে।'

বলেছিলাম, খোঁজ নেব। যদি না থাকে নিজেই লিখব।

ফিরে এলাম ভারতবর্ষে। শুরু হল অনুসন্ধান পর্ব। সব কিছুই কুয়াশায় ঢাকা। তাঁর জীবনী অনেকগুলি আছে, কিন্তু মন ভরল না। কাশীতে সুশীলাদেবীর সঙ্গেও দেখা করে এলাম—পর্যাপ্ত মালমসলা পেলাম না। ষাট-সত্তর বছর আগেকার কথা—পুরাতন সংবাদপত্রের পাতাগুলোও পাঁপর-ভাজা। অথচ ছাড়তেও পারছি না। মাঝে মাঝে ওরই মধ্যে বিদ্যুৎ-চমকের মত এক-একটি পঙ্‌ক্তি আমাকে সচকিত করে তোলে। যেমন, রাওলাট রিপোর্টের একটি পঙ্‌ক্তি আমাকে বিহ্বল করে তুলেছিল মনে আছে। শত্রুপক্ষের কথা : "Among the few handful of Bengal revolutionaries who made the British Govt. almost impossible in India, the name of Rash Behari Bose tops the list." সেই রাসবিহারী এভাবে হারিয়ে যাবেন অজানার অন্ধকারে? এই রাসবিহারী আবার পূর্ব-এশিয়ায় দীর্ঘ আঠার বছর পরে ১৯৪৩ সালে ৩রা জুলাইয়ে রাত পোহালে পরদিনের শারদপ্রাতে বাঁশিখানি তুলে দিয়েছিলেন নেতাজীকে। বলেছিলেন : 'Friends and Comrades in Arms! You might now ask me, what I did in Tokyo for our cause, what present I have brought for you. Well, I have brought for you this present: Srijut Subhas Chandra Bose, who needs no introduction to you...In your presence today I resign my office and appoint Deshsevak Subhas Chandra Bose as President of the I. I. L. I am old. This is the work of a younger man. India's best is represented in him.... Friends and Comrades in Arms! You know I have dedicated my life, in my own humble way, to the cause of my sacred Motherland. That is my life's mission. And as long as there is breath in my body, I shall be the soldier that I have always been—the soldier in the battle for Mother India's freedom. And, of course, I shall not spare myself in giving him all that I can give him--whole hearted co-operation, assistance and advice in the battle that is now ahead of us."

সত্যই যেন সব্যসাচীর সৈনাপত্যে, তাঁর নির্দেশে দ্রোণাচার্য যুদ্ধ করে ছিলেন অতঃপর!

কিন্তু সে তো তাঁর শেষ জীবন! তার আগের কথা?

সব নিরবচ্ছিন্ন কুয়াশায় ঢাকা! ডাক্তার যাদুগোপালের ভাষায় : "So great was Rash Behari that his height still remains unmeasured.",— ও মাপা যায় না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে ক্ষান্ত দিলাম। অন্য রচনায় হাত দিলাম। 'রাসবিহারী'-র অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি উপেক্ষিত হয়ে পড়ে রইল দেরাজে!

ইতিমধ্যে তিন বছর কেটে গেছে। এবছর ১৯৭৩- এর পঁচিশে জানুয়ারী সকালে বাড়িতে একটা টেলিফোন এল। নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর স্বনামধন্য ডাঃ শিশিরকুমার বসু ফোন

করেছেন। জিজ্ঞাসা করলেন : আচ্ছা আপনি কিয়োতো নিউস্ এজেন্সির মিস্টার ইয়োনো য়োকোবোরিকে চেনেন?

বললাম : নিশ্চয়। জাপানে আলাপ হয়েছিল। উনি আমাকে রেঙ্কোজি মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

——তিনি কলকাতায় এসেছেন, নেতাজী জন্মোৎসবে ডেলিগেটরূপে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। বিশেষ জরুরী প্রয়োজন।

তখনই চলে গেলাম আমি। দেখা হল য়োকোবোরির সঙ্গে। আরিগাতো এবং নমস্কার বিনিময়ের পর উনি বললেন—আপনার নামটা মনে ছিল, টেলিফোন নম্বরটা ভুলে গেছি। কলকাতায় এসে অনেক খোঁজ করেছি। দু-চারজন পাব্‌লিশার্স বললেন আপনাকে চেনেন কিন্তু টেলিফোন নম্বর জানেন না। শেষে মনে হল, আপনি তো নেতাজীর উপর বই লিখেছেন, তাই নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোয়—

আমি ওঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলি, আপনি যে মনে করে—

—না, না! শুধু খোশগল্প করার জন্যই আপনাকে খুঁজছি না। আমি কিছু মালমসলা এনেছি। আপনার কাজে লাগবে।

রাসবিহারীর স্বাক্ষরিত দুটি লিফ্‌লেট এবং দুখানি ছবি দিলেন আমাকে।

—ওঁর জীবনী কবে প্রকাশিত হচ্ছে? লেখা কতদূর?

মরমে মরে গেলাম। আমি রাসবিহারীর দেশের লোক, তাঁর আত্মদানের ফলশ্রুতি স্বাধীনতা ভোগ করছি, অথচ আমি আছি নির্বিকার। আর ঐ বিদেশী ছেলেটা তিন বছর অগেকার একটা কথোপকথন মনে করে রেখেছে। সমস্ত কলকাতা দাবড়ে বেড়াচ্ছে আমার হাতে দুটি সম্পদ হস্তান্তরিত করবে বলে!

—কি হল মিস্টার সান্যাল? আর কতদিন দেরি হবে?

ভেবে-চিন্তা কিছু বলিনি। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল : ছয়মাসের মধ্যেই।

—খুব আনন্দের কথা। আমি অবশ্য পড়ে বুঝতে পারব না ; কিন্তু বাঙালীরা তো বুঝবে!

ইংরেজ কবির সঙ্গে নিজেকে তুলনা করছি না, কিন্তু এ-গ্রন্থ আমার কাছে এক বিদেশীর দেওয়া 'হোম-ট্যাস্ক'!

এবার পাদপূরণের কাজে নামি :

শহীদ বসন্ত বিশ্বাস প্রশ্ন তুলেছিলেন—বালমুকুন্দের মৃত্যু সংবাদ পেয়েও কি রামরাখী বলেছিল : ইংরেজ সরকারের সাধ্য নেই আমাকে স্বামীর কাছ থেকে তফাত করে রাখে!

না। রামরাখী আর ও কথা বলেনি। কথায় নয় কাজে সে রেখেছিল প্রমাণ—তার সংকল্পচ্যুত সে হয়নি। বালমুকুন্দজীর ফাঁসি হয়েছিল বসন্ত বিশ্বাসের সঙ্গে একই দিনে—১১.৫.১৯১৫ তারিখ প্রত্যুষে, আম্বালা জেলে। ঠিক যখন রাসবিহারীকে নিয়ে জাপানী জাহাজ কলকাতা বন্দর ত্যাগ করতে যাচ্ছে। সংবাদটা পৌঁছলো রামরাখীর কাছে। গগনবিদারী আর্তনাদ করল না রামরাখী; অস্ফুটে আপন মনে বলল,—ম্যয় আভি আতি হুঁ, জী!

আহার ত্যাগ করল রামরাখী। সাতদিন অনাহারে সে কৃশ হল ঠিকই, কিন্তু বাঞ্ছিত মৃত্যু লক্ষণ ফুটে উঠল না তার যৌবনপুষ্ট তনুদেহে। তাই পানীয় ত্যাগ করল অতঃপর। অনুরোধ, উপরোধ, বল প্রয়োগ—কিন্তু কোন কিছুতেই টলানো গেল না সেই বজ্রকঠিন

কোমলাঙ্গীকে! শেষে সবাই হাল ছেড়ে দিল। তিল তিল করে এগিয়ে গেল মহাসতী তার প্রেমাস্পদের দিকে। ভিড় করে দেখতে এল গ্রাম-গ্রামান্তরের লোক। ঘিরে দাঁড়ালো সতীকে। তখন বাকরোধ হয়েছে মেয়েটির। অনাহারে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করল রামরাখী—ইংরেজ সরকারকে দেখিয়ে দিল স্বদেশকে ভালবাসার অপরাধে প্রেমাস্পদকে তার বাহুবন্ধন থেকে ছিনিয়ে নেবার ক্ষমতা নেই ব্রিটিশ সিংহের! শহীদ হল রামরাখী। শহীদ?

বিপ্লবী কালীচরণ ঘোষ-মশাই তাঁর অমর গ্রন্থ The Roll of Honour-এ লিখেছেন : "Though not quite known to the world at large the name of a silent 'Martyr' in connection with the Delhi Conspiracy Executions should be recorded with deserving respect. When the news of her husband's execution reached her home, RAMRAKHI, the devoted wife of Balmukand, in spite of all persuasions to the contrary, stopped taking food and drink and in the course of a few days she followed her husband with a cheerful mien with the blessings of all who gathered around her during the last few days of her mortal existence. Blessed be her name!"

কালীচরণবাবু বিদগ্ধ পণ্ডিত! আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন। তিনি কেন martyr বা 'শহীদ' শব্দে ক্যাপিটাল 'M' ব্যবহার করেছেন তা আমি বুঝে উঠতে পারিনি। কারণ গান্ধী জন্ম-শতবার্ষিকীতে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রক যে অফিসিয়াল "Who's Who of Indian Martyrs"—মহাগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তাতে রামরাখীর নাম নেই। কালীচরণবাবুর মত বেসরকারী পণ্ডিত উচ্ছ্বাসের বশে ক্যাপিটাল 'M' ব্যবহার করেছেন। রামরাখী স্বাধীন ভারতের সরকারীভাবে স্বীকৃত শহীদ নন।

দ্বিতীয় কথা : রাসবিহারী রামরাখীকে লাহোরে এবং যমুনা দেবীকে লক্ষ্ণৌয়ে বলেছিলেন: 'ভারতবর্ষ ছেড়ে যাবার আগে সুশীলার হাতে রান্না খেতে যাব একদিন।'

সে প্রতিশ্রুতি তিনি রাখতে পেরেছিলেন কিনা ইতিহাস সে কথা বলে না। প্রশ্নটা সরাসরি পেশ করেছিলাম অশীতিপর বৃদ্ধা সুশীলাদেবীর কাছে, ২৭/১২/৭০ তারিখে। শুনেছিলাম সে সত্য ঘটনা। এবার সে কথাই শোনাই :

কাশীতে বাঙালীটোলায় চৌষট্টি-যোগিনী মায়ের মন্দিরের সামনে একটি ছোট্ট গলিতে উনি থাকতেন। ওঁর সঙ্গে তখন থাকতেন ওঁর মাসিমা—বামাপদর বিধবা স্ত্রী। খবর পেয়ে আমি কলকাতা থেকে ছুটলাম। দাদার বিষয়ে বই লিখছি জেনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন তিনি। টক্‌টক্ করছে গায়ের রঙ। মনে হল তাহলে রাসবিহারীও বোধ হয় ফর্সা ছিলেন। বার্ধক্যে একেবারে নুয়ে পড়েছেন। দাদার চিঠি দেখালেন। বৌদি ও ছেলেমেয়ের যে ফটো দাদা জাপান থেকে পাঠিয়েছেন তা দেখালেন। বললেন, সরকার আমাকে মাসিক কুড়ি টাকা মাসোহারা দেন, তাতেই চলে যায় দু'জনার!

—চলে?—অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

—ওমা চলবে না? সাত টাকা ঘর ভাড়া, এক টাকা লাইট। বাকি বারো টাকায় দু'জন বিধবার চলে যাবে না? কী আর খরচ?

—আর কেউ কোন অর্থ সাহায্য করেন না?

—আর কে আছে আমাদের?

বাল্যজীবনের কিছু কিছু গল্প করলেন। নয় বছর বয়সে বিবাহ হয়, দশ বছর বয়সে বিধবা হয়! বিবাহ রাত্রে স্বামীকে একবার মাত্র দেখেন। নামটা পর্যন্ত মনে করতে পারলেন না। বললেন, আজকাল আর কিছুই মনে থাকে না।

আন্দুলের কাছে কোড়লা গ্রামে বিবাহ হয়েছিল কিনা প্রশ্ন করায় বলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোড়লায়। তোমার তো বাবা খুব মনে থাকে!

যেন আমি আজ সত্তর বছর ধরে ঐ নামটা মনে রেখেছি! জিজ্ঞাসা করি, আপনার দেওরের নাম ছিল মন্মথনাথ সরকার। তাঁকে মনে আছে?

—হ্যাঁ, মন্মথ, মনু-ঠাকুরপো! তাকে মনে আছে বাবা? খুব মনে আছে!

নিজের কথা বললেন কিছুটা। বিধবা হবার পর পিতৃগৃহেই ছিলেন প্রথমটা! অপয়া বউ বলে শ্বশুরবাড়িতে ঠাঁই হয়নি। তারপর ওঁর বয়স যখন বছর পনের—রাসবিহারী তখনও নিরুদ্দেশ—ওঁকে বাপের বাড়ির লোকেরা নিয়ে গেল কোড়লা গ্রামে। বর্ণনা দিলেন সে যাত্রার:

পালকি থামল একটা মেটে-ঘরের সামনে। আমাকে নামতে বলল। নেমে দাঁড়ালুম এক গলা ঘোমটা দিয়ে। নতুন বউ। সাড়া পেয়ে কারা যেন বেরিয়ে এলেন। যিনি আমাকে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে ওঁদের কি যেন কথা হল। শেষ-মেশ রাগ করে তিনি পালকি নিয়ে ফিরে গেলেন ধুলোপায়ে। এঁরাও রাগ করে সদরে খিল দিলেন। রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে রইলুম আমি—সোমত্ত বিধবা মেয়ে! হাপুস-নয়নে কাঁদছি আর মনে মনে মধুসূদনকে ডাকছি!

বিংশ শতাব্দীর শেষ যুগের মানুষ আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি। বলি : বলেন কি? মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল? আপনি না ওদের বাড়ির বউ?

মিষ্টি হাসলেন বৃদ্ধা। বললেন : পাগল ছেলে! দোর বন্ধ করবে না? আমি যে অপয়া বউ রে! যাই হোক, শেষে পাশের বাড়ির কায়েত-গিন্নি এসে আমার হাত চেপে ধরেন। বলেন, বৌমা, তুমি আমার ঘরে এসে বস! সরকাররা যদি ঘরের লক্ষ্মী ঘরে না তোলে আমি তোমাকে ঠাঁই দেব। কাঁদতে-কাঁদতে কায়েত-গিন্নির বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সুমতি হল আমার শ্বশুরবাড়ির লোকদের। ঠাঁই হল ওখানে!

জিজ্ঞাসা করলাম—জাপান যাওয়ার আগে আপনার দাদা কি আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন? কিছু মনে পড়ে আপনার?

—ওমা, মনে পড়বে না? সে দুঃখ যে আজও আমার বুকে কাঁটা হয়ে বিঁধে আছে রে! শুনবি সে গল্প? তবে শোন:

জাপান যাত্রার মাত্র এক সপ্তাহ আগে চন্দননগর থেকে সাইকেলে চেপে দুঃসাহসী রাসবিহারী এসেছিলেন আন্দুলে, কোড়লা গ্রামে। বৈশাখ মাস। খাঁ খাঁ করছে চারদিক। দুপুরে লোকজন নেই পথে। পড়ন্ত বেলায় এসে উপস্থিত হলেন রাসবিহারী। সঙ্গে আর একটি ছেলে। সে যে কে আজও জানেন না সুশীলাদেবী। সে ছেলেটি ঘরে ঢোকে না। সাইকেল নিয়ে চলে গেল জঙ্গলের দিকে।

কোড়লা গ্রামে রাসবিহারীর প্রকৃত পরিচয় কেউ জানে না। সে বাউণ্ডুলে, দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়, স্বদেশী করে, এটুকুই সবাই জানত। মন্মথ সরকারমশাই কুটুম্বকে আপ্যায়ন করতে ত্রুটি করেননি। পুকুরে জাল ফেলা হল। সুশীলাদেবী হলুদ বাটতে বসলেন। মাজায়

কাপড় বেঁধে রাঁধতে গেলেন। ওঁর শাশুড়ীও খুশী হয়ে উঠলেন। আহা! এতদিন পরে ভাইকে পেয়ে আবাগিটার মুখে তবু হাসি ফুটেছে।

মাছ পাওয়া গেল। বড় জাতের রুই। রাসবিহারী বলেন মুড়ি দিয়ে ঘন্ট, গাদা ভাজা আর পেটি দিয়ে কালিয়া। তুই না পারিস তো আমাকে বল সুশি! আমিই ঢুকি রান্নাঘরে।

—ঈশ! দিচ্ছি তোমাকে ঢুকতে! এ কী পুরুষ মানুষের কাজ নাকি?

রাসবিহারীর বলেন : গেঁয়ো ভূত কোথাকার! তুই কি জানবি? দুনিয়ার তাবৎ হোটেলে রান্না করে পুরুষমানুষ!

—এ কি হোটেলের রান্না? এ নিয্যস্ বাঙালী ভোজ!

দুর্ভাগ্য সুশীলা দেবীর! রান্না শেষ হতে এক প্রহর রাত হল। কিন্তু খাবার সুযোগ হল না রাসবিহারী। খিড়কির দরজায় হঠাৎ শোনা গেল সাইকেলের ঘন্টি। ছুটে বেরিয়ে গেলেন রাসবিহারী। মুহূর্তে ফিরে এসে বললেন, আমি চললাম রে সুশি! আর একদিন এসে খাব!

মন্মথবাবু ছুটে এসে ওঁর হাত চেপে ধরেন : কী বলছেন আপনি! এমন অভুক্ত অবস্থায় আপনাকে ছেড়ে দিলে যে সে দুঃখ—

বেদনার্ত হয়ে উঠল রাসবিহারীর মুখ। বললেন, আপনার দুঃখ? কিন্তু আমার দুঃখটা আপনাকে কেমন করে বোঝাব মন্মথবাবু? ঐ হতচ্ছাড়ির হাতের রান্না খাব বলে আজ পাঁচ-পাঁচটা বছর.....

কথাটা শেষ হল না তাঁর। বাইরে থেকে আবার শোনা গেল সাইকেলের ঘন্টি।

—কিন্তু এত মাছ কে খাবে?—নিরুপায় মন্মথ সরকার প্রশ্ন করেন।

গল্প বল্‌তে বল্‌তে অশীতিপর বৃদ্ধা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। বললেন —আমি তখন রান্নাঘরের চৌকাঠ ধরে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছি! বারকোশে সাজানো রয়েছে মাছ-ভাজা, মাছের চপ,—গামলা ভর্তি কালিয়া আর পরাৎ ভর্তি মাছের মুড়ি-ঘন্ট! দাদা উঁকি মেরে দেখলেন! ম্লান হেসে বললেন, আপনার চিন্তা নেই মন্মথবাবু! অতিথিরা এখনই আসবেন।

আমার গালটা টিপে দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন দাদা! আমার প্রণামটাও করা হল না!

সেই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ!

তখন বুঝিনি কিছুই। বুঝলাম ঘন্টাখানেক পরে। আমাদের বাড়িটা ঘিরে ফেলল লাল-পাগড়িতে। তন্ন তন্ন করে খুঁজল ওরা। রান্নাঘরে ঢুকে সব তছনছ করে দিল। পা দিয়ে উল্টে দিল রান্না খাবার—তা দিক! ও জিনিস আমি কাউকে প্রাণে ধরে দিতে পারতাম না!

এবার তৃতীয় অকথিত কাহিনী। দামোদর রাও কাপ্‌লের ইতিকথা। রাসবিহারী বিপ্লবীর কোড-অব-এথিক্স অস্বীকার করেননি। সাতজন অনুচরের মধ্যে কে যে বিনায়কের পিছনে ছায়ার মত অনুসরণ করছে তা তিনি জানতেন না, জানবার চেষ্টাও করেননি কোনদিন। কিন্তু সেই অজ্ঞাত শত্রুর হাত থেকে বিনায়ক রাও কাপ্‌লেকে নিরন্তর বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করে গেছেন। যতদিন তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন বিনায়ক কাপ্‌লের কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারেনি। তারপর ১৯১৮ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী লক্ষ্ণৌয়ের ঘশিয়াড়ী মণ্ডিতে একদিন খুন হল রাজসাক্ষী বিনায়ক। রিভলভারের গুলিতে। ধরা পড়ল হত্যাকারী—সুশীলচন্দ্র লাহিড়ী, একজন সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট।

বিচারে সুশীল কোন কথা স্বীকার করেননি—কার নির্দেশে, কেন সে এ কাজ করল তার জবাবদিহি করেননি। কালীচরণবাবু তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন (p. 326), "The accused declined to make any statement in self-defence and received the death sentence absolutely unperturbed..... He bathed in the morning in water brought from the Ganges, and parformed the morning rituals of a devout Brahmin. Then he proceeded unfalteringly and ascended the steps leading to the gallows with dignity and firmness befitting a hero who had staked everything for the independence of his country. The last words in his mouth was 'Bonde Mataram', with the noose closely tightening his throat."

চতুর্থ ঃ শ্রীশ ঘোষের গ্রেপ্তার। রাসবিহারীর মত শ্রীশচন্দ্রকেও পুলিশ কোনদিন ধরতে পারেনি। ফরাসী-চন্দননগরে ইংরেজ সরকারের এক্তিয়ার ছিল না। বিপ্লবী জীবনে শ্রীশচন্দ্র বারে বারে ইংরেজ-রাজত্বে প্রবেশ করেছেন—কলকাতা, কাশী, সাহারানপুর, মীরাট, দিল্লী, দেরদুন লক্ষ্মৌ ক্রমাগত ঘুরেছেন—অথচ তাঁর বডি ওয়ারেন্ট পকেটে নিয়ে ইংরেজ-গোয়েন্দা বারে বারে নাকাল হয়েছে। তাঁকে ধরতে পারেনি। ধরতে গেলেই দেখা গেছে তিনি ফরাসী চন্দননগরে পৌঁছে গেছেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে শ্রীশচন্দ্রের এই আগুন নিয়ে খেলার নাম ছিল—"ও কুমীর তোর জল্‌কে নেমেছি!"

তাই সেই তেইশে মার্চ লক্ষ্মৌ স্টেশনে দাঁড়িয়ে রাসবিহারী অবাক হয়ে গিয়েছেন খবরের কাগজে ঐ সংবাদটি দেখে—কলকাতায় শ্রীশচন্দ্র গ্রেপ্তার!

শ্রীশচন্দ্রের শেষ জীবন বড় করুণ। তাঁর গ্রেপ্তারের ব্যাপারটাও।

কিন্তু সেই করুণ কাহিনী বলার আগে তাঁর জীবনের এক কৌতুককর ঘটনার কথা বলি—

উনিশ শ' চৌদ্দ সালের কথা। রাসবিহারী তখন চন্দনগরে। প্রথমে ছিলেন বোড়াইচণ্ডীতলায়, তারপর এলেন ফটকগোড়ায় নিজের বাড়িতে। শ্রীশ ঐ একই বাড়ির বাসিন্দা, অপর অংশে থাকেন, কাকার অন্নে পালিত। হঠাৎ একদিন মধ্যরাত্রে রাসবিহারীর বাড়িতে রেড হল। ছাদ থেকে পিছনের নারকেল গাছ বেয়ে নেমে রাসবিহারী আশ্রয় নিলেন বাঁশবাগানে। পুলিশে তাঁর সন্ধান পেল না। নিরাশ হয়ে ফিরল তারা। রাসবিহারীও ফিরে এলেন বাঁশবাগান থেকে।

কী করে খবর পেল পুলিশ? কে সংবাদ দিচ্ছে? পরদিন সকালেই সেটা জানা গেল। পুলিশের যেমন গোয়েন্দা আছে, তেমনি শ্রীশের আছে একটা নিজস্ব গুপ্তচর-বাহিনী। তারা নির্ভুল সংবাদ এনে দিল—ইনফর্মার স্বয়ং রায়সাহেব অটলবিহারী সরকার। একই গলির বাসিন্দা! চন্দননগরের অন্যতম প্রধান ক্রিমিনাল ল-ইয়ার। সরকারী মহলে তাঁর অগাধ প্রতিপত্তি। প্রচুর রোজগার। সংসারের সে কী রব্‌রবা! বারো মাসে তের পার্বণ লেগেই আছে। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়ি। সিংদরজায় গাদা-বন্দুক হাতে ভোজপুরি দারোয়ান। দুনিয়ার কাউকে তোয়াক্কা করেন না তিনি।

রাসবিহারী বললেন, শিরে! 'শিরে হল সর্পাঘাত, কোথায় বাঁধবি তাগা?' আর তো এখানে থাকা চলে না ভাই। সরকার-মশাই স্বয়ং পিছনে লেগেছেন।

শ্রীশচন্দ্র বলেন, র'স—আমি দেখছি!

একটা কাগজে কয়েক ছত্র কী লিখে নিয়ে তখনই বেরিয়ে গেলেন।

পাড়ার মস্তান। দারোয়ান চেনে। ফটক দিয়ে ঢুকতে কোন অসুবিধা হল না শ্রীশের। হাঁটু পর্যন্ত খেটো ধুতি আর বোতামহীন হাফ-শার্ট গায়ে চটি ফট্-ফট্ করতে করতে শ্রীশ এসে উপস্থিত হলেন রায়সাহেবের বৈঠকখানায়।

ঘরে আট-দশজন উমেদার, মোক্তার, প্রার্থী। রায়সাহেব একটা চিপেগুেল টেবিলের সামনে গদি-দেওয়া চেয়ারে বসে আলবোলা টান্‌তে টান্‌তে নিমীলিতনেত্রে কেস-হিস্ট্রি শুনছিলেন। শ্রীশের চটি-ফটফটানিতে চোখ খুললেন এবং ভুরু কুঁচকোলেন। শ্রীশ ওঁর পা থেকে এক-খাব্‌লা ধুলো নিয়ে বললেন—জ্যাঠামশাই, বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি! একটু ভিতরের ঘরে উঠে যেতে হবে। ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়।

রায়সাহেব ঝানু লোক। হাড়ে হাড়ে চেনেন শ্রীশ ঘোষকে। হেসে বলেন, তোমার আবার কী বিপদ হল হে? লোকে বলে : তুমি নাকি দুনিয়ায় কাউকে ডরাও না? তা এস, তোমার ব্যাপারটাই আগে শুনি। হাজার হোক পাড়ার ছেলে তো! বিপদে-আপদে আমাকে দেখতে হবে বৈকি!

পাশের নির্জন ঘরে গিয়ে একটি ইজিচেয়ারে বসলেন। একটি টুলের দিকে নির্দেশ করলেন শ্রীশকে। শ্রীশ কাচুমাচু হয়ে বসল। পকেট থেকে বার করে দিল একটা চিঠি! বললে, আমাকে বেনামী চিঠি লিখে কেউ ভয় দেখাচ্ছে। কী করি বলুন তো জ্যাঠামশাই?

চশমা-জোড়া নাকে চড়িয়ে রায়সাহেব চিঠিখানি পড়লেন। তাতে লেখা ছিল;

"এক লক্ষ টাকা লইয়া আপনি কী করিবেন তাহা আমরা সকৌতুকে লক্ষ্য করিব। ভয় নাই, আপনাকে প্রাণে বধ করিব না। আমাদের লিস্টে নাম আছে আপনার বড় জামাইয়ের—সে এলাহাবাদে থাকে; তারপর আপনার বড় ছেলে—যে কানপুরে চাকরি করে। সর্বশেষ আপনার কনিষ্ঠ পুত্র, যে রুরকিতে পড়িতেছে। পর্যায়ক্রমে ইহারা আপনার নিকট হইতে বিদায় লইবে। আমরা দেখিতে চাই, অতঃপর লক্ষ টাকায় আপনার বৃষোৎসর্গ কে করিবে!"

ইতি—কানাইলালের প্রেতাত্মা!"

চিঠি পড়তে পড়তে মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে রায়সাহেবের।

শ্রীশ আমতা আমতা করে বলে, দেখুন জ্যাঠামশাই, আমি বে-থা করিনি, তিন কুলে আমার কেউ নেই, অথচ চিঠিতে আমার ছেলে, জামাই—! এসব কী?

—থাম তুমি! হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন রায়সাহেব।

থতমত খেয়ে শ্রীশ থেমে যায়।

সোজা হয়ে উঠে বসেন রায়সাহেব। বলেন—তুমি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ শ্রীশ! তুমি? এতবড় স্পর্ধা তোমার? তুমি রায়সাহেব অটলবিহারীকে চেন না?

ছিলে-খোলা ধনুকের মত উঠে দাঁড়ায় শ্রীশ। বলে, তাই এসেছি জ্যাঠামশাই। বড় বাড়াবাড়ি করছেন আপনি! 'শিরে ঘোষ'-কে বোধহয় আপনি চেনেন না!

—তোমাকে···তোমাকে···

হাত দুটি মাথার উপর তুলে শ্রীশ বলে—তল্লাশ করে দেখতে পারেন। আমি খালি হাতে এসেছি। ঐ তো, গেটে আপনার দারোয়ান আছে। ডেকে ধরিয়ে দিন না। কিন্তু ভুলে যাবেন না, আমার এক বন্ধু জেলের ভিতরেই নরেন গোঁসাইকে খুন করেছে, আর এক

বন্ধু দিল্লীর রাজপথে লর্ড হার্ডিঞ্জকে···

—তোমার বন্ধু?

—কেন ন্যাকা সাজছেন? জানেন না আপনি? রাসবিহারী আমার বন্ধু নয়? বিশ্বাস না হয় চলুন আমার সঙ্গে। রাসু কোথায় আছে আমি জানি! আপনাকে নিয়ে যাব তার কাছে। নিজেই মোকাবিলা করে আসবেন!

নিজের কানে বর্তমানে যা শুনেছেন তাই যে বিশ্বাস হয় না!

শ্রীশ গম্ভীর হয়ে বললে—তিন কুলে আমার কেউ নেই। আপনি নিজেই তো এখনই বললেন—দুনিয়ায় আমি কাউকে ডরাই না! কথাটা মিছে নয়। লাখ টাকা তো আপনি এমনিই কামাচ্ছেন জ্যাঠামশাই—সখ করে খামকা নির্বংশ হতে চাইছেন কেন? আপনি মানী লোক, আমি নগণ্য জীব। তবু আমার কথাটা ভেবে দেখবেন! আচ্ছা আজ চলি জ্যাঠামশাই!

রীতিমত এক-খাব্‌লা পদধূলি নিয়ে বেরিয়ে গেল শ্রীশ।

রায়সাহেব অটলবিহারী আর অটল থাকতে পারলেন না। গাড়ু আর গামছাটা নিয়ে ভিতর বাড়ির দিকে চলে গেলেন।

রাসবিহারীর ফটকগোড়ার বাড়িতে দ্বিতীয়বার 'রেড' হয়নি।

যে কথা বলছিলাম! শ্রীশচন্দ্রের গ্রেপ্তার হবার কাহিনী।

শ্রীশচন্দ্র ছিলেন নীরব কর্মী! সব কয়টি বিপ্লবীদলের বিশেষ আস্থাভাজন। উনি ছিলেন বিভিন্ন দলের যোগসূত্র। অসংখ্য বিপ্লবাত্মক কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন অথচ কখনও ধরা ছোঁয়ার মধ্যে নেই। ইংরেজ ফরাসী সরকারের অনুমতি নিয়ে ওঁর বাড়ির সামনে একটা বিশেষ পুলিসফাঁড়ি খুলেছিল। তাঁর গতিবিধি সমস্ত লেখা হত একটি নোট-বুকে। ফরাসী চন্দননগরের ভিতর তাঁকে গ্রেপ্তার করার অনুমতি নেই—ঐ চৌহদ্দির বাইরে পদার্পণমাত্র যাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা যায় তাই তাঁর 'বডি-ওয়ারেন্ট' করিয়ে রাখা হয়েছিল। সেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পকেটে নিয়ে একজন গোয়েন্দা দিবারাত্র তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ করেছে চার-পাঁচ বছর। তার ভিতর উনি বার-পঞ্চাশ লক্ষ্মণের গণ্ডীর বাইরে যান। কলকাতা, দিল্লি, কাশী, কানপুর, সাহারানপুর, দেরাদুন, লাহোর ঘুরে আসেন—কিন্তু কিছুতেই তাঁকে ধরা যায় নি। মতিলালের প্রবর্তক সঙ্ঘ আর নরেন্দ্রনাথের বান্ধব সমিতিতে তাঁর নিত্য যাতায়াত ছিল। তিনি ছিলেন নিশাচর। সমস্ত রাত্রি তিনি কাজ করতেন।

শ্রীশের কাকিমা ব্রজসুন্দরী ছিলেন মুখরা! এই অপোগণ্ড ভাইপোটিকে ভাত-কাপড়ের যোগান দিতে তাঁর বুক ফেটে যেত। শ্রীশ সংসারের কোন উপকারে নেই—বেকার, বাউণ্ডুলে। পুলিশের খাতায় তার নাম আছে। দিনান্তে ভাতের থালা ওর মুখের সামনে ধরে দিতে ব্রজসুন্দরীর হাত ওঠে না।

উনিশ শ পনের সালের মার্চ মাস। শ্রীশ নিদারুণ মনঃকষ্টে আছেন। একে একে সবাই ধরা পড়ে যাচ্ছে। বসন্ত বিশ্বাস, বালমুকুন্দ, অবোধবিহারী, আমীরচাঁদ ইত্যাদির মামলা শেষ হয়েছে। দশই ফেব্রুয়ারী রায় বের হয়েছে—চারজনেরই মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। ওদিকে লাহোরে মহাবিপ্লবের সন্ধিক্ষণে পুলিস গ্রেপ্তার করেছে পাঞ্জাবের সব কয়েকজনকে—কর্তার সিং, সুরেন সিং, জগৎগৎ সিং, রামশরণ ইত্যাদিদের। বাকী আছেন শুধু রাসবিহারী আর পিংলে। আর কাশীর ক'জন। রাসবিহারী গিরিজাবাবুর মাধ্যমে শ্রীশকে খবর পাঠিয়েছেন—এবার পালাতে হবে। ভিতর থেকে নয়, এবার বাইরে থেকে সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ

করবেন রাসবিহারী। কাবুলের পথে পারস্যে যেতে হবে অবিলম্বে। যাবেন ওঁরা তিনজন—রাসবিহারী, পিংলে আর শ্রীশ। অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে প্রতীক্ষা করছেন শ্রীশচন্দ্র।

এমনই একদিন ব্রজসুন্দরী এসে শ্রীশকে বললেন—শরতের শ্বশুর চিঠি লিখেছেন, ওকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। কাল তুমি ওকে নিয়ে যেও।

শরৎসুন্দরী ব্রজসুন্দরীর মধ্যমা কন্যা। বাপের বাড়ি থাকার মেয়াদ ফুরিয়েছে তার। কলকাতায় স্বামীর ভিটেয় তাকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

শ্রীশ অবাক হয়ে বলেন—আমি? আমি কলকাতা যাব? শরৎকে নিয়ে?

ব্রজসুন্দরী খন্‌খনে গলায় বলে ওঠেন—তারা পাঠাবার জন্য বারে-বারে তাগাদা দিচ্ছে যে শ্রীশ! একজনকে তো নিয়ে যেতে হবে?

—কিন্তু তাই বলে আমি? আমি কি চন্দননগরের বাইরে যাই?

—দেখ বাছা, আমার কাছে আর ন্যাকা সেজ না। সারা দুনিয়া দাবড়ে বেড়াচ্ছ—তা কি আর জানি না আমি? না হয় কুটোগাছটা নেড়ে একটা উব্‌গার করলে সংসারের।

শ্রীশ গম্ভীর হয়ে বলেন—ওঁদের লিখে দাও, শীঘ্রই শরৎকে আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি! আমার পক্ষে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। আমি লোকের ব্যবস্থা করছি।

কাকী অগ্নিদৃষ্টি হেনে তখনকার মত স্থানত্যাগ করলেন।—কয়েক দিনের মধ্যে শ্রীশ কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন না। সপ্তাখানেক পরে শরৎসুন্দরীর শ্বশুরবাড়ি থেকে একটা মর্মস্পর্শী কুটুম্ব-সম্ভাষণ এল! সে চিঠির ঝাঁজে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন ব্রজসুন্দরী। দুম্‌-দুম্‌ করে শ্রীশের ঘরের সামনে এসে বলেন—শ্রীশ, শরৎ আজ সকালের ট্রেনে কলকাতা যাবে। তোমাকে নিয়ে যেতে হবে।

শ্রীশ একেবারে কাঁচুমাচু হয়ে বলেন, আমার যে যাওয়া একেবারে অসম্ভব কাকিমা! লোকও পাচ্ছি না। রবিবারের মধ্যে ব্যবস্থা নিশ্চয় হয়ে যাবে।

বৈবাহিকের কাছ থেকে কুটুম্ব সম্ভাষণে ব্রজসুন্দরী একেই ক্ষিপ্ত ছিলেন, তার উপর শ্রীশের উপর ছিল জাতক্রোধ। একেবারে তার-সানাইয়ের মতো ঝংকার দিয়ে উঠলেন ব্রজসুন্দরী—সকালবিকেল এক-কাঁড়ি ভাতের থালা নিয়ে বসতে লজ্জা করে না তোর! ওরে আমার ধর্মের ষাঁড়! দেশের কাজ করতে চাস তো নিজের মুরোদে করগে যা! কাকির ভাত খেলে, কাকির চাকরিও করতে হয়! না পারিস,—দরজা খোলা আছে বেরিয়ে যা! এই আমি বলে রাখলাম শিরে,—আজ থেকে তোর এ বাড়িতে পাতপাড়া বন্ধ!

মর্মান্তিক অভিমানে শ্রীশ উঠে দাঁড়ান। মাথা নিচু করে বলেন, ঠিকই বলেছ কাকিমা! আমি অপদার্থ! বেশ, তোমার অন্নের ঋণ শোধ দেব আমি। শরৎকে তৈরী হতে বল—আমি এখনই ওকে নিয়ে যাচ্ছি।

শরৎ আল্‌তা পায়ে পান মুখে দিয়ে এসে দাঁড়াল

—দাদা, মা তোমাকে ডাকছে। খেতে এস।

শ্রীশ উদাস দৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, কাকিকে বল, ফিরে এসে খাব।

ব্রজসুন্দরী দ্বারের কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, আর আদিখ্যেতা করতে হবে না বাছা। এস, যা পার দুটি খেয়ে যাও।

শ্রীশ চটি-জোড়ায় পা গলাতে গলাতে বললেন, তোমরা খেয়ে নিও। এখন আমার

খেতে ইচ্ছে করছে না।

ব্রজসুন্দরী দ্বিতীয়বার সাধবার মত মানুষ নন।

শ্রীশ ঘোড়ার গাড়ি ডেকে নিয়ে এলেন। কি জানি কি মনে করে গাড়িতে উঠ্‌বার আগে কাকিমাকে প্রণাম করলেন। গাড়ি বেরিয়ে গেল ফটক-গোড়ার গলি ছেড়ে।

ফরাসী-চন্দননগরের সীমান্তে খোল্‌সানি থানায় কয়েকজন বসে গল্প করছিল। গাড়ির মধ্যে শ্রীশচন্দ্রকে বসে থাকতে দেখে ওরা যেন ভূত দেখল। শ্রীশ হাওড়ার টিকিট কাটলেন—প্রকাশ্য দিবালোকে। ওরা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না। দু'জন লাফিয়ে উঠ্‌ল চলন্ত গাড়িতে শ্রীশচন্দ্রের পাশের কামরায়। দু'জনে ছুটল টেলিগ্রাফ অফিসের দিকে।

গাড়িতে ছোটবোনের সঙ্গে তাঁর একটা কথাও হয়নি। চোখ বুজে তিনি চুপ করে বসেছিলেন। সব কিছুই লক্ষ্য হয়েছিল তাঁর।

গাড়ি হাওড়ায় পৌঁছাল। শরৎসুন্দরী দেখল দাদা ঘুমাচ্ছে। একটা ঠেলা দিয়ে বলে—দাদা, হাওড়া স্টেশন এসে গেছে।

শ্রীশ পকেট থেকে কলম বার করে একটা কাগজে কি যেন লিখলেন।

পরমুহূর্তেই একদল সশস্ত্র পুলিস লাফিয়ে উঠ্‌ল ওঁদের কামরায়। একজন দারোগা এগিয়ে এসে বলল : আপনার নাম কী···

কথাটা শেষ হল না তার। শ্রীশ মাঝপথে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ! আপনাকে একটা কাজ করতে হবে ইন্সপেক্টার সাহেব। এ মেয়েটি আমার বোন—একে পুলিস-এস্‌কর্ট দিয়ে এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে হবে!

হতভম্ব পুলিস-অফিসার কী বলবে ভেবে পেল না।

শ্রীশ হ্যাণ্ডকাফের জন্য হাত দুটি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। আমিই শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, চন্দননগরের বাসিন্দা। যাকে খুঁজছেন আপনারা!

দীর্ঘদিন কারাযন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন শ্রীশ। রাসবিহারী যখন জাপানে চলে যান, উনি তখন কারাপ্রাচীরের ওপারে। পরে জাপান থেকে রাসবিহারী তাঁকে অনেকগুলি চিঠি লেখেন। অনেক নির্দেশ পাঠান! কিন্তু মন ভেঙে গিয়েছিল শ্রীশের। প্রবর্তক-সঙ্ঘের শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত আমাকে বললেন উনি নাকি শেষ জীবনে মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেন। সহকর্মীরা হয় গেছে আন্দামানে, নয় ফাঁসির মঞ্চে। উনি পড়ে আছেন একা। প্রবর্তক-সঙ্ঘের বারান্দায় পায়চারি করতেন আর আপন মনে বলতেন : Is it a mistake or a mystery?—এ কোন রহস্যময়ীর নির্দেশ?

মাস্টারমশায়ের বৈঠকখানায় সেই সন্ধ্যাবেলার কথা কি মনে পড়ত তাঁর? অধ্যাপক চারুচন্দ্র প্রশ্ন করেছিলেন—পলাশীর যুদ্ধশেষে জীবিত থাকলে ওঁরা তিনজনে কে কি করতেন? কানাইলাল জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছে সে মীরজাফরকে খুন করত···রাসবিহারী দেখিয়ে গেছে সে বিশ্বাসহন্তা হবার জন্যই বিশ্বাসঘাতক সাজত। কিন্তু উনি?···উনি তো ওঁর শেষ কথা রাখেননি! মীরমদন মোহনলালেরা সবাই একে একে চলে গেল! পলাশীর প্রান্তর আজ লালে লাল হয়ে গেছে। শেষ বুলেটখানা নিয়ে শ্রীশচন্দ্র কী করবেন?—কী করতে পারেন তিনি?—কেমন করে কাজে লাগাবেন এই একটিমাত্র বুলেট?

আত্মহত্যাই করেছিলেন নীরব-বিপ্লবী শহীদ—শ্রীশচন্দ্র। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন তিনি!

শহীদ! এবার কালীচরণবাবুর মত আমিও বোধহয় উচ্ছ্বাসের বসে ভুল করলাম। না,

আত্মহত্যা করলে শহীদ হওয়া যায় না। 'Who's Who of Indian Martyrs'-গ্রন্থে রামরাখীর মত শ্রীশচন্দ্রেরও স্থান হয়নি! ভারত সরকারের মতে জেলের ভিতর অসুখে ভুগে মারা গেলেও শহীদ হওয়া যায়—তাই কস্তুরীবাঈ গান্ধী শহীদ; কিন্তু যেহেতু নাথুরাম গড়্‌সে ইংরেজ সেপাই নয় তাই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী শহীদ নন! যতীন দাস শহীদ, অথচ আমৃত্যু অনশনব্রতী রামরাখী নয়। যাঁর মৃত্যু রহস্য নিয়ে আজও অনুসন্ধান হচ্ছে সেই সুভাষচন্দ্র শহীদ, অথচ শ্রীশচন্দ্র শহীদ নন।

রাসবিহারী যে 'শহীদ' শব্দের অন্য কোন একটি সংজ্ঞা মানতেন তা জেনে এলাম টোকিও সফরকালে। রাসবিহারী-তনয়া মাদাম হিগুচির বাগানের একান্তে রক্ষিত একটা ওক-কাঠের ফলকে তাই লেখা আছে এমন অনেক নাম যাঁরা এ দেশে বিস্মৃত! শুনেছি, রাসবিহারী শেষ জীবনে ঐ কাঠের ফলকটির সামনে বসে সান্ধ্য-উপাসনা করতেন। তাই বলতে পারি, শ্রীশচন্দ্রের নাম দুনিয়া থেকে একেবারে মুছে যায়নি।

এখান থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে একটা ওক-কাঠের ফলকে তিনি বেঁচে আছেন।

পঞ্চমত—যমুনাদেবীকে রাসবিহারী দুঃখ করে বলেছিলেন, 'কানাই দত্ত বেঁচে থাকলে মঙ্গলগ্রহে পালিয়েও কৃপাল সিং রক্ষা পেত না!'

মীরজাফর যদি রক্তবীজের বংশধর হয়, তবে কানাইলালও মৃত্যুঞ্জয়ী।

বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর, যে বছর বিলাতে মাইকেল ও'ডায়ার নিহত হলেন, সেই বছর একজন বিপ্লবী কৃপাল সিংকে খুঁজে বার করেন। তৎক্ষণাৎ পথকুক্কুরের মত তাকে হত্যা করেন। কে এই বিপ্লবী, কেমন করে দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর কোথায় তাকে পেয়েছিলেন তা জানি না। এই সংবাদ সংগ্রহ করেছি শ্রীনলিনীকান্ত গুহ-মশায়ের লেখা গ্রন্থ 'বাঙলায় বিপ্লববাদ'-এর (৪র্থ সংস্করণ) ১৩৬ পৃষ্ঠায়। এ গ্রন্থের কোন পাঠক যদি এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে পারেন চিরবাধিত থাকব। যে-সময় কৃপাল সিংকে হত্যা করা হয়, হিসাব করে দেখছি সে-সময় রাসবিহারী ব্যাংককে আই. আই. লীগের কাছে দিবারাত্র কাজ করছেন। কৌতূহল হয় জানতে, এ-সংবাদ তিনি আদৌ পেয়েছিলেন কিনা। পেয়ে থাকলে বিপ্লবী হরদয়ালের মত তিনিও নিশ্চয় হাজার হাজার মাইল দূর থেকে ঐ অজ্ঞাত কৃপাল সিং-এর হত্যাকারীকে লাখো সেলাম জানিয়েছিলেন!

চন্দননগর প্রবর্তক-সঙ্ঘে গিয়েছিলাম অরুণচন্দ্র দত্ত-মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে। এ বছর (১৯৭৩) দোশরা মার্চ। অরুণচন্দ্রের বর্তমান বয়স আটাত্তর। পাকা পেয়ারাফুলি আমটির মত টুক্‌টুক করছে গায়ের রঙ। যে দেওয়ালে উনিশ শ' এগারো সনের কালীপূজার রাত্রে দিল্লি-বোমার পরীক্ষা হয়েছিল সে স্থানটা দেখালেন, যে খুপরীতে শ্রীঅরবিন্দ আত্মগোপন করেছিলেন—তা দেখালেন! তারপর অফিসঘরে এসে বের করলেন পুরাতন নথীপত্র। বললাম মণীন্দ্রনাথ নায়েক-মশাই চন্দননগরে আছেন শুনেছি, তাঁর বাড়িটা কত দূরে।

বললেন, তোমার চিঠি পেয়েই মণিদাকে খবর পাঠিয়েছি। তিনি আসবেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

ব্যস্ত হয়ে বলি, সে কি! আমিই যাব তাঁর কাছে! বৃদ্ধ মানুষকে···

বাধা দিয়ে অরুণচন্দ্র বলেন, যা বললে ভাই তা যেন ওঁর সামনে দ্বিতীয়বার ব'ল

না। মণিদা বিরাশী-বছরের তরুণ!

জিজ্ঞাসা করি, শুনেছি রাসবিহারী আপনাকে সঙ্গে করে জাপানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এ কথা কি ঠিক?

—হ্যাঁ। শ্রীশদা আর পিংলেজী দুজনেই ধরা পড়ায় রাসুদা চেয়েছিলেন আমি ওঁর সাথে যাই। রাজা পি. এন. ঠাকুরের আর্দালীর পরিচয়ে; কিন্তু সঙ্ঘগুরু (অর্থাৎ মতিলাল) অনুমতি দিলেন না।

মুখে বলিনি, মনে মনে ভাবি—ঠিকই করেছিলেন মতিলাল। এই আটাত্তর বছর বয়সেও ওঁর যা গায়ের রঙ আর বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা—বিশ বছর বয়সে ওঁকে ভৃত্য বলে পাচার করা হয়তো সত্যিই অসম্ভব ছিল।

কথা বলতে বলতেই এসে গেলেন আর একজন বৃদ্ধ। ছোট্টখাট্ট মানুষ, অবিন্যস্ত মাথার চুল, গায়ে গলাবন্ধ কোট, আর বাঙলার বাঘের অনুকরণে দিব্যি পুরুষ্টু একজোড়া গোঁফ। শুনলাম—ইনিই বিপ্লবী মণীন্দ্রনাথ নায়েক। বোমা-বিশারদ!

সসম্ভ্রমে আমি উঠে দাঁড়াই।

পুরানো দিনের অনেক কথাই শোনালেন মণীন্দ্রনাথ। বললেন, স্কটিশে আই. এ. পড়তে পড়তেই ওঁর এদিকে ঝোঁক চাপে। চন্দননগরের ডাক্তার নগেন ঘোষ-মশাই ওঁকে ফর্মুলাটা বাৎলান; কিন্তু হাতে-কলমে শেখান অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র দত্ত—রিপন কলেজের। বললেন, ওঁর শাগরেদ ছিলেন চারুচন্দ্র রক্ষিত আর মানিকলাল রক্ষিত। অরুণ সোম-মশায়ের বাড়িতে হয় প্রথম হাতেন খড়ি! পরে নিজের বাড়িতেও ল্যাবরেটরি খুলেছিলেন! সাগরকালী ঘোষ যোগান দিতে টিন আর লোহা, সত্যচরণ কর্মকার অ্যাসিড, আর নাইট্রিক অ্যাসিড কিংবা সালফার এনে দিতেন হাটখোলার আশুতোষ নিয়োগী! এঁদের অধিকাংশই গত হয়েছেন—এঁদের কথা কেউ জানেও না।

জিজ্ঞাসা করলাম, জেল খেটেছেন কত বছর?

—ওমা জেল খাটতে যাব কোন্ দুঃখে? জেল-ফেল খাটিনি বাপু।

অরুণচন্দ্র বলেন, মণিদাকে পুলিশ কোন দিনই ধরতে পারেনি। ওঁর বোমাই চট্টগ্রাম থেকে পাঞ্জাব সরগরম হয়ে উঠেছে অথচ উনি কোনদিন ধরা ছোঁয়ার মধ্যে ছিলেন না।

প্রসঙ্গত অরুণচন্দ্র একটি কৌতুককর কাহিনী শোনালেন। বছর পাঁচেক আগেকার কথা। দিল্লিতে সারা ভারত বিপ্লবীদের কী একটা সম্মেলন হচ্ছে! নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন অরুণচন্দ্র, সঙ্গে মণীন্দ্রনাথ। দিল্লির ন্যাশনাল আর্কিভ্স্-এ বিপ্লব-যুগের নানান নিদর্শন দেখানো হচ্ছে। এক জায়গায় একটা কাচের বাক্স খুলে ডিমন্স্ট্রেটার বার করলেন কতকগুলি লোহার টুকরা। বললেন, এগুলি হচ্ছে উনিশ শ'বারো সনের তেইশে ডিসেম্বর যে বোমায় বড়লাট হার্ডিঞ্জ আহত হয়েছিলেন তারই টুকরো। ব্যাপারটা কী হয়েছিল তার আনুপূর্বিক একটা বর্ণনা দিয়ে প্রদর্শক-মশাই বলেন, বোমাটির ওজন ছিল দু' পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় এক সের।

ভিড়ের ভিতর কে যেন বলে ওঠেন; না, এক পাউণ্ড এগারো আউন্স!

স্যুটেড-বুটেড প্রদর্শক-মশাই ঘুরে দাঁড়ান। সর্বভারতীয় বিপ্লবীদের ভিড়ে ঢাকা পড়ে গেছেন ছোট্ট একটি মানুষ। সংশোধনী প্রস্তাবটা তিনিই বুঝি পেশ করেছেন। প্রদর্শক-মশাই ঐ বক্তার বয়সের মর্যাদা দিতেই বোধ করি আত্মসংবরণ করলেন, বললেন—সে যাই হোক, বোমাটা ছিল একটা সিগারেটের কৌটায়। পাঁচ ইঞ্চি খাড়াই, তিন ইঞ্চি ব্যাসের।

ভিড়ের মধ্যে আবার কে যেন বলে ওঠেন : তিন ইঞ্চি নয়, ৩$\frac{৩}{১৬}$"!

এবার বোধ করি ধৈর্যচ্যুতি ঘটল প্রদর্শক-মশায়ের। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, স্যার! আপনি কে তা জানি না। কিন্তু আমি এখানে আজ বারো বছর ধরে ডিমন্‌স্ট্রেটারের কাজ করছি। যা বলছি, তা ঐতিহাসিক রেকর্ড থেকে বলছি! বিশ্বাস না হয় আপনি ফাইল নং ১/১৪ ডেটেড ৮.১.১৯১৪ দেখতে পারেন—কলকাতার লালবাজারেও রেকর্ডে আছে। ঐ তারিখে মেজর জে. ডাব্‌লু. টার্নার, ইন্সপেক্টার অফ এক্সপ্লোসিভস, ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ, তাঁর রিপোর্টে বলেছিলেন—

বাধা দিয়ে বৃদ্ধ দর্শক বলে ওঠেন—ও-সাহেব কচু জানে!

বাক্যস্ফূর্তি হয় না প্রদর্শক-মশায়ের। একটা অস্বস্তিকর নৈঃশব্দ্য ঘনিয়ে ওঠে!

অরুণচন্দ্র তখন তাড়াতাড়ি প্রদর্শক-মশায়কে বলেন, কিছু মনে করবেন না, এঁর নাম শ্রীমণীন্দ্রনাথ নায়েক। উনি ছাপ্পান্ন বছর আগে নিজ হাতে ঐ বোমাটা তৈরি করেছিলেন—দিল্লি-বম্ব-কেসের বোমাটা। ঐ উনি যা বলছেন সেই অনুসারে ডাটা-গুলি আপনি ঠিক করে লিখে নিতে পারেন।

আমি কৌতূহলী হয়ে বলি : তারপর?

মণীন্দ্রনাথ বলেন তারপর আর কী। ওরা রেগে-মেগে আমাকে কানা করে দিল। বুঝলে না ভাই?—যাতে আর কিছু দেখতে না পাই। আর কোন প্রতিবাদ না করি।

আমি হালে পানি পাই না।

অরুণচন্দ্র হাসতে হাসতে বলেন, অর্থাৎ চার-পাঁচজন প্রেস ফটোগ্রাফার ফ্ল্যাসবাল্‌ব জ্বেলে মণিদার ফটো নিল। চোখ ধাঁধিয়ে গেল মণিদার। আমাকে বললেন—ও অরুণ। আর যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আমি।

আমি হোহো করে হেসে উঠি।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বোমা কি ভাবে বানাতেন?

মণীন্দ্রনাথ গম্ভীর হয়ে বলেন, ঐ কথাটি জিজ্ঞেস কর না ভাই। আমার নাতির বারণ আছে।

নাতির বারণ! ব্যাপার কি? শুনলাম সে কথাও। বছর দুয়েক আগেকার কথা। উনিশ শ'সত্তর-একাত্তর। যে প্রশ্নটা আমি এইমাত্র পেশ করেছি, সেটাই জানতে চেয়েছিল বৃদ্ধের কাছে কয়েকটি অপরিচিত অল্পবয়সী ছোকরা।

মণীন্দ্রনাথ অবাক হয়ে বলেছিলেন, সাহেবরা তো এ-দেশ ছেড়ে চলে গেছে দাদা-ভাই। এখন আর ও-সব শিখে কি করবি?

দলের মুখপাত্র ছোকরা বলে, এমনিই শিখতে চাই দাদা। শেখাবেন? মণীন্দ্রনাথ চিন্তায় পড়েন। কিন্তু সব কথা শুনে ওঁর নাতি ওঁকে মাথার দিব্যি দিয়ে বারণ করে। বলে—দাদু জীবনের আশীটা বছর তো জেলফটকের ভিতরে মাথা গলাও নি। এই বুড়ো বয়সে কি ডোরাকাটা হাফ্‌প্যান্ট পরে তক্তি-গলায় কপি বুনতে যাবে? অমন কাজও কর না।

সেই থেকে মণীন্দ্রনাথ সাবধান হয়েছেন। তিনি সব কথা বলতে রাজী—ঐ বোমা-তৈরীর ফর্মূলা বাদে।

জনান্তিকে অরুণবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, অশীতিপর মণীন্দ্রনাথকে কি সম্মানসূচক

তাম্রপত্র দেওয়া হয়েছে?

—কিসের তাম্রপত্র?

—ঐ যে আজকাল স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সম্মানসূচক তাম্রপত্র দেওয়া হয়?

অরুণবাবু বললেন—মণিদা তো জীবনে জেল খাটেন নি।

তা-ও তো বটে। সে আমলে বিপ্লবীদের মধ্যে দু-জন কখনও ধরা পড়েননি। রাসবিহারী আর মণীন্দ্রনাথ। জেল যখন খাটেননি তখন স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ নেওয়ার প্রমাণ কোথায়? ঐ একই কারণে কি রাসবিহারীর চিতাভস্ম···তাহলে অবশ্য মণীন্দ্রনাথের দুঃখ করার কিছু নেই। তিনি রাসবিহারীর সগোত্র। এর চেয়ে বড় সম্মান ভারতীয় রাজদ্রোহীর আর কি হতে পারে?

চন্দননগরের বিপ্লবীদের উপেক্ষিত ঐ শেষ প্রদীপশিখাটির প্রতি শ্রদ্ধানম্র নমস্কার জানিয়ে ফিরে এলাম।

* * *

যমুনাদেবীকে দেরাদুন-এক্সপ্রেসে তুলে দিয়ে রাসবিহারী লক্ষ্ণৌ থেকে কাশীতে ফিরে এলেন। কাশীর বাড়িতে ইতিমধ্যে খানাতল্লাশী হয়েছে। নাদির খাঁকে চোখ বেঁধে আনা হয়েছিল বটে, কিন্তু স্টেশন থেকে দূরত্বটা সে ঠিকই আন্দাজ করেছিল। এমন কি গাড়ি কতবার কোন দিকে মোড় নিয়েছে তাও আন্দাজে বলেছিল। শচীন সান্যাল তাই আস্তানা বদলিয়ে ত্রিপুরাভৈরবী ব্রহ্মপুরীর নূতন আস্তানায় উঠে এসেছেন। সেখানেই স্থির হল—এবার রাসবিহারী ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চলে যাবেন। বছর-দেড়েক আগে গর্ডন-হত্যার পরে এ-জাতীয় সিদ্ধান্ত একবার নেওয়া হয়েছিল। সেবার টিকিট পর্যন্ত কেনা হয়েছিল। রাসবিহারী সেবার নিজেই রাজী হননি। এবার রাজী হতে হল। সেই বাসাবাড়ি থেকে শেষবারের মত রওনা হলেন রাসবিহারী, সঙ্গে নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়। মগরা স্টেশনে ওঁদের সঙ্গে দেখা করলেন জ্যোতিষ সিংহ—যাঁর ছদ্মনাম ছিল পশুপতি। চন্দননগর স্টেশনে ডাক-গাড়ি থেকে নামা নিরাপদ নয়। তাই মগরা স্টেশন থেকে লোকাল-ট্রেনে ওঁরা এলেন চন্দননগরে। এবার আর ফটকগোড়ায় নয়, এসে উঠ্‌লেন সাগরকালী ঘোষের বাড়িতে। সাগরকালী ঘোষ পাঠকের অজানা নন—মতিলাল তাঁর জবানবন্দীতে বলেছিলেন—এই সাগরকালীই 'ভেল-দিগ্‌-দিগ্‌' খেলার জন্য রূপার শীল্ড্‌টা বানিয়ে দিয়েছিলেন। সাগরকালীর গুরুদেব-রূপে রাসবিহারী আশ্রয় নিলেন। ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ, গলায় মস্ত পৈতা, মাথায় প্রকাণ্ড টিকি। রাসবিহারী অনেক পরে জাপান থেকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—"ঐ সময় সাগরকালীর একজন বৃদ্ধ আত্মীয় আমাকে প্রণাম করেন, আমি সলজ্জে তাঁকে হাত তুলে নমস্কার করি। সংস্কার যাবে কোথায়! সেই আত্মীয় সাগরকালীকে জনান্তিকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'বামুনঠাকুর আমাকে আশীর্বাদ না করে নমস্কার করলেন যে?' সাগরকালী বুদ্ধি করে বলেছিলেন "উনি অত্যন্ত বিনয়ী, বয়োজ্যেষ্ঠ হলে কায়েতেরও প্রণাম নেন না!"

কিছু দিন পরে উনি চন্দননগরে থাকা আর নিরাপদ মনে করলেন না। চলে এলেন নবদ্বীপে। ইতিহাস বলছে—তখন, অর্থাৎ নবদ্বীপে তাঁর সঙ্গে ছিল একজন সুদর্শন মারাঠি ব্রাহ্মণ। তার পরিচয় কেউ জানত না। জানতেন একমাত্র মতিলাল। অনুমান হয়—সে বিনায়ক কাপ্‌লে। অনুকূল ঠাকুর ঐ সময়ে রাসবিহারীকে কিছু অর্থসাহায্য করেন। গিরিজাবাবু তাঁর দেখাশোনা করতেন। শ্রীশ ছিলেন এতদিন ওঁর ডান হাত। এবার শ্রীশ জেলে। অবশ্য

কিছুদিনের মধ্যেই কাশী থেকে এসে গেলেন ওঁর লাট্টু—মানে শচীন সান্যাল, রাসবিহারীকে ভারতবর্ষ থেকে পাচার করতে।

গোয়েন্দা বিভাগ সংবাদ পেয়েছিল রাসবিহারী ভারতবর্ষের বাইরে চলে যাবার পরিকল্পনা করছেন। তিন বছর ধরে দিল্লি-বম্ব কেসের আসামীকে তারা ধরতে পারেনি। এ লজ্জা তারা ভোলেনি। প্রত্যেকটি স্টেশনে তাই রাসবিহারীর ফটো টাঙানো হল; লালবাজার থেকে কলকাতার প্রত্যেকটি জাহাজ কোম্পানির কাছে নির্দেশ গেল—জাহাজ ছাড়ার আগে স্পেশাল সার্চ করতে হবে। পাসপোর্ট বিভাগকে সতর্ক করে দেওয়া হল রাসবিহারীর বর্ণনা দিয়ে, ফটো দিয়ে।

প্রথমে কথা হয়েছিল উনি কাবুলের পথে পারস্যে চলে যাবেন। যে পথে পঁচিশ বছর পরে গিয়েছিলেন জিয়াউদ্দীন। ব্যবস্থাটা রাসবিহারী নিজেই নাকচ করেন। পরে কে যেন পরামর্শ দিলেন—কুলির ছদ্মবেশে তিনি আপাতত চলে যাবেন বর্মা-মুলুকে। তাতেও রাজী হলেন না উনি। বললেন, পাসপোর্ট অফিসে তোমরা কেউ যাও। বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে এসে জানাও—কে পাসপোর্ট ইস্যু করে, কার সুপারিশ প্রয়োজন, কে কে ক্লার্ক আছে, কখন অফিসার অফিসে থাকেন, তাঁর কী নাম, কত বয়স, বিবাহিত কি-না ইত্যাদি।

অনতিবিলম্বেই বিস্তারিত সংবাদ এসে গেল। পাসপোর্ট অফিসার একজন অল্পবয়সী ইংরেজ, মিস্টার লরেন্স ডেভিড। অবিবাহিত। সুদর্শন। বুদ্ধিমান। অফিসে তিন-চারজন ক্লার্ক আছে—তারা কেউই বাঙালী নয়। একজন স্টেনো-টাইপিস্ট আছেন, মিস্ লুইসি। জাতে ফরাসী। ডেভিডের বাগ্‌দত্তা বধূ। সাহেব অফিসে আসেন দশটায়। পাঁচটা পর্যন্ত থাকেন। বেলা একটা থেকে দুটো লাঞ্চ-ব্রেকে বাইরে যান। সমস্ত শুনে রাসবিহারী বলেন, আমি নিজেই যাব! ছদ্মবেশে!

—আপনি নিজে? যদি চিনে ফেলে?

—ফেলবে না!

—কিন্তু সুপারিশ যোগাড় করবেন কেমন করে? কোন অত্যন্ত পদস্থ ব্যক্তির সনাক্তিকরণ সুপারিশ ছাড়া আজকাল পাসপোর্ট ইস্যু করা হচ্ছে না।

রাসবিহারী চিন্তিত হলেন।

দুদিন পরে আবার এলেন গিরিজাবাবু। বললেন, গিরিশ নাগ (বিপ্লবী নেত্রী লীলা রায়ের পিতা) রাজী আছেন। উনি আমার আত্মীয় এবং একই জেলায় আমাদের বাড়ি। উনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আপনার কীর্তি কাহিনী উনি জানেন—তিনি সুপারিশ করতে রাজী। অবশ্য এতে ওঁর চাকরি যেতে পারে।

রাসবিহারী বললেন, চাকরি যাতে না যায় সেটা আমাকে দেখতে হবে। ওঁকে বল, কোন একটা অছিলায় দশই মে দুপুরবেলা ঠিক দুটোর সময় ঐ পাসপোর্ট-অফিসারের ঘরে ঢুকতে। আমি ঘরে থাকব। তিনি যেন আমাকে দেখে বলে ওঠেন, হ্যালো মিস্টার টেগোর! কেমন আছেন? গিরিজাবাবু অবাক হয়ে বলেন, টেগোর? মানে?

—আমি ঐ সময়ের পাঁচ মিনিট আগে পাসপোর্ট-অফিসারের সঙ্গে দেখা করব। রাজা প্রিয়নাথ ঠাকুর, এই পরিচয়ে! আমি রবীন্দ্রনাথের নিকট-আত্মীয়, কাজিন-ব্রাদার, রবীন্দ্রনাথ মাস-কতক পরে জাপান যাচ্ছেন, শুনেছ বোধহয়। আমি তার আগে যাচ্ছি অগ্রদূত হিসাবে, যাবতীয় প্রোগ্রাম তৈরী করতে।

গিরিজাবাবু একটা ঢোঁক গিলে বলেন, গিরীশবাবুকে আর কিছু করতে হবে না?

—না। কথাবার্তায় তিনি যেন বুঝিয়ে দেন আমি একজন বিশিষ্ট লোক। রাজা পি. এন. টেগোর একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি, ওঁর পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে বল। সম্ভবত লিখিতভাবে তাঁকে কিছুই স্বীকার করতে হবে না। আমি যদি ধরাও পড়ে যাই—ওঁর সুপারিশের কোন লিখিত প্রমাণ থাকবে না।

নবদ্বীপ থেকে রাসবিহারী পুনরায় চন্দননগরে আসেন। শ্রীশ নেই। মতিলালের কাছে বিদায় নিলেন। সাগরকালী ঘোষের একটি নিজস্ব নৌকা ছিল। তাতে করে রাসবিহারী সদলবলে গঙ্গা পার হয়ে কাঁকিনাড়ায় এলেন। দশই মে ঠিক বেলা একটার সময় একটি ব্রুহাম গাড়ি এসে দাঁড়াল ডালহৌসি স্কোয়ারের পশ্চিম পারে, পাসপোর্ট অফিসের সামনে। পিছনের তক্‌মা-আঁটা সহিস এসে খুলে দিল গাড়ির দরজা। ধীরপদে নেমে এলেন স্থূলকায় রাজা পি. এন. ঠাকুর। মাথায় বিরাট পাগড়ি, কস্তা-পাড় ফিনফিনে ধুতি, ঊর্ধ্বাঙ্গে কালো ওপেন-ব্রেস্ট কোট। হাতে হাতির-দাঁতের মুঠওয়ালা বাঁকা ছড়ি, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। গা দিয়ে বের হচ্ছে—না, 'নেবু ফুলের' নয়, ফরাসী-এসেন্সের সুবাস। হেলতে-দুলতে স্থূলকায় ভদ্রলোক অফিস ঘরে ঢুকলেন। সকলেই মুখ তুলে তাকায়। উনি নীলনয়না একটি তরুণীর দিকে এগিয়ে 'বাও' করে বিশুদ্ধ ফরাসী ভাষায় প্রশ্ন করেন : মঁসিয়ে দাভিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্য হতে পারে কি আমার?

মেয়েটি একটু থতমত খেয়ে যায়। প্রত্যভিবাদন করে ফরাসী ভাষাতেই বলে—মঁসিয়ে দাভিদ্ বলে তো কেউ নেই এখানে!

—সে কি! পাসপোর্ট-অফিসারের নাম মঁসিয়ে দাভিদ্ নয়?

—আজ্ঞে না। ওঁর নাম মিস্টার লরেন্স ডেভিড। উনি ফরাসী নন, ইংরেজ।

—ডিয়ার মি। আমি শুনেছিলাম উনি ফরাসী, ওঁর স্ত্রীও ফরাসী। মেয়েটি মিষ্টি হাসল। এবার ইংরেজীতে বলে, ওন্ট য়ু কাইণ্ডলি টেক য়োর সীট?

জমিয়ে বসলেন রাজা পি. এন. টেগোর। বুক-পকেট থেকে সোনার চেনে লটকানো ঘড়ির ডালাটা খুলে সময়টা দেখেন। মেয়েটি মুখ তুলে অন্যান্য সকলের দিকে তাকায়। তারপর সলজ্জে ফিস্‌ফিস্ ফরাসীভাষায় করে বলে—ওর স্ত্রী ফরাসী নন, ওঁর বাগ্‌দত্তা-বধূ ফরাসী।

ভ্রূ-যুগল ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয় রাজা-সাহেবের। একটা বিস্ময়ের অভিব্যক্তি।

মেয়েটি রহস্যটা করে ভেঙে দেয় : আমরা দুজন বাগ্‌দত্ত!

উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন রাজা-সাহেব। অভিনন্দন জানান। তখনই ডেকে পাঠান কোচম্যানকে। গাড়ি থেকে আনা হল ওঁর পোর্টমাল্টো ব্যাগ। তার ভিতর থেকে বের করলেন রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতাগুচ্ছের ফরাসী অনুবাদ। সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম পাতাটা খুলে ফেলেন, তাতে লেখা ছিল জাল হস্তাক্ষরে :

To my dearest cousin Preonath,

—Rabindranath.

অর্থাৎ "প্রিয় ভাই প্রিয়নাথকে দিলাম—রবীন্দ্রনাথ"।

কলমটা বের করে বললেন, মাদ্‌মোয়াজেল, তোমার নাম?

—লুইসি। কেন?

রাজা-সাহেব রবীন্দ্রনাথের সইয়ের নিচে লিখলেন :

"সুন্দরী মাদ্‌মোয়াজেল লুইসিকে—"

বিব্রত হয়ে লুইসি বলে, এটা কি ঠিক হল? ডক্‌টর টেগোর আপনাকে দিয়েছিলেন—

বাধা দিয়ে রাজা-সাহেব বলেন, আমি রবিদার কাছ থেকে আর একখানা আদায় করে নেব। কিন্তু এমন শুভসংবাদ শোনার পর···তা ছাড়া কি জান, মাদ্‌মোয়াজেল, ফরাসী ভাষাটা আমি ভাল জানি না। ঐ ছেলেবেলায় জ্যোতিদাদার পাল্লায় পড়ে এক-আধটু কাজ-চলা মত শিখেছি—

মেয়েটি ইতস্তত করে বললে, তবু কবি শুনলে হয়তো দুঃখিত হবেন। আফ্‌টার অল তাঁর অটোগ্রাফ্‌ড কপি...

পি. এন. ঠাকুর সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ফিস্‌ফিস্ করে বলেন, মাদ্‌মোয়াজেল, রবিদাকে তুমি চেন না। তেমন বেরসিক লোক তিনি নন। এগুলি সবই প্রেমের কবিতা। হনিমুনের উপযুক্ত! এ-বুড়োর বদলে তোমারই এগুলি বেশি কাজে লাগবে। কবিও খুশি হবেন! আমি জামিন রইলাম!

মেয়েটি রাঙিয়ে ওঠে।

ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসতে থাকেন রাজা-সাহেব, হা-হা করে!

পাসপোর্ট-অফসার লাঞ্চে গেছেন শুনে একটু বিব্রত হলেন ঠাকুর-সাহেব। মেয়েটি শুনল, রবীন্দ্রনাথ শীঘ্র জাপানে যাচ্ছেন—তাঁর অগ্রদূত হিসাবে যাবতীয় বন্দোবস্ত করতে ঠাকুর-পরিবারের এই পি. এন. টেগোর পূর্ব-এশিয়ায় যাচ্ছেন। পরশু তাঁর জাহাজ ছাড়বে। এখনও অনেক কাজ বাকি। আজই পাসপোর্ট করতে হবে। উস্‌খুস্ করতে থাকেন রাজাসাহেব। বলেন, মাদ্‌মোয়াজেল, কত দেরি হবে বলুন তো। চারটার সময় আমার একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে এস. পি. সিন্‌হার বাড়িতে!

—স্যার এস. পি. সিনহা? গভর্নমেন্ট অফ্ ইণ্ডিয়ার এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের ল-মেম্বার?

—না, উনি বর্তমানে ওয়ার-কাউন্সিলে অ্যাডভাইসারি মেম্বার। উনি এখন ভারতে নেই। স্যার জেম্‌স বেন্টন আর বিকানীরের মহারাজার সঙ্গে বিলেত গিয়েছেন। আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ওঁর ভাইয়ের সঙ্গে। এন. পি.-র সঙ্গে। তিনি আই. এম্. এস.। জাপানে তাঁর বন্ধুর কাছে কিছু উপহার পাঠাতে চান আমার হাতে। তা কখন আসবেন মঁসিয়ে দাভিদ, আই মীন মিস্টার ডেভিড?

—ঠিক দুটোর সময়। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আধঘন্টার মধ্যে আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

তাই এলেন সাহেব। একা নন, তাঁর সঙ্গে আচকান-পরা আরও একজন দেশী-সাহেব। ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে সুইং ডোর দু-জনে ঢুকে গেলেন খাসকামরায়। লুইসি পি. এন. টেগোরের ভিসিটিং-কার্ড হাতে ঢুকল পিছন পিছন। একটু পরেই ফিরে এসে বললে, পাঁচ মিনিটের ভিতরেই উনি ডাকবেন।

তাই ডাকলেন। সুইং-ডোর ঠেলে স্থূলকায় রাজা-সাহেব ঘরে ঢুকতে গিয়েই কার সঙ্গে যেন মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। ওদিক থেকে তখন বের হয়ে আসছিলেন আচকান-পরা সেই দেশী-সাহেব। দুজনেই একসঙ্গে বলে ওঠেন : সরি!

তারপর হঠাৎ সেই দেশী-সাহেব থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়েন : হ্যাল্লো! রাজা-সাহেব না?

কী ব্যাপার? আপনি এ-পাড়ায়? সাগরপাড়ি দিচ্ছেন নাকি?

—আর বলেন কেন মিস্টার নাগ! পড়েছি যবনের হাতে! রবিদা জাপান যাচ্ছেন! 'আগে গেলে বাঘে-খায়', তাই এই হতভাগাকে অগ্রদূত করে পাঠাচ্ছেন আগে-ভাগে। আমার কি এসব ঝামেলা পোষায়?

'পড়েছি যবনের হাতে' শুনে একটু আঁতকে উঠেছিলেন গিরিশচন্দ্র—ঢোঁক গিলে বলেন, পোয়েট টেগোর কেমন আছেন আজকাল?

—চলে যাচ্ছে!

—কী লিখছেন এখন?

—ছাইভস্ম! আমি কি ওসব বুঝি? আচ্ছা বাই-বাই!

—উইস্ য়ু এ হ্যাপি ভয়েজ।

—বেরিয়ে গেলেন গিরীশ নাগ, মানে মানে, চাকরি বাঁচিয়ে।

সাহেব করমর্দন করলেন। আগন্তুককে বসতে বললেন। গিরীশের সঙ্গে রাসবিহারীর কথোপকথন হয়েছিল আদ্যন্ত ইংরাজীতে। ইতিপূর্বে সাহেবের বাগ্‌দত্তা বধূ ওঁর হয়ে সুপারিশ করে গেছে। কিন্তু লোকটা জাতে ইংরেজ! লালফিতের বাইরে সে পা বাড়াবে না। বললে, আপনি কোন রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল লোকের লিখিত-সুপারিশ আনেননি?

রাজা-সাহেবের চোখ কপালে ওঠে : মাই-গড! তার প্রয়োজন আছে নাকি? তা—ইয়ে···গিরীশবাবু একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট—আই থিংক হি ইজ টলারেব্‌লি রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল—এখনও বোধ হয় তিনি চলে যাননি। আপনার আর্দালিকে যদি কাইণ্ডলি—

বেল বাজাতে হাতটা তুলেছিলেন। উদ্যত হাতটা ধরে ফেলে, লুইসি। হঠাৎ কেন যেন সে নিজেকে অপমানিতা মনে করল, তা খোদায় মালুম। বোধকরি তার ধমনীতে ফরাসী-রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল বলেই। লালফিতার প্রতি নৈর্ব্যক্তিক নতি এখনও সে স্বীকার করতে শেখেনি। বলল : স্যার! আয়াম এ রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল ফ্রেঞ্চ সিটিজেন টু! আমার মুখের কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, বলুন কোথায় সই করতে হবে?

'স্যার' একেবারে কাঁচুমাচু। কিন্তু বেচারা করেই বা কী? পাসপোর্টদুর্গের দুর্গেশ সে—দুর্গেশ দুমরাজের অবস্থা তার! একদিকে লালফিতার বন্ধন, অপরদিকে প্রেমাস্পদার অভিমান! আমতা-আমতা করে বলে, লুইসি! এই সপ্তাহেই আমি একটা কনফিডেন্সিয়াল সার্কুলার পেয়েছি....ওয়েল, সব কথা এখানে বলা যায় না.....কিন্তু আমি মিনতি করছি—দিস্ ইজ ইন্ডিয়ান পলিটিক্‌স্। তুমি বিদেশী, মানে.....

—বুঝেছি! থাক! তুমি কোন ভারতীয়ের সনাক্তিকরণ সুপারিশ চাও। এই তো? আশাকরি তুমি নোবল্-লরিয়েট কবি টেগোরের নাম শুনেছ? বাজারে গুজব আগামী-লিস্টে তিনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হবেন। কী মনে হয় তোমার? তিনি অন্তত টলারেব্‌লি রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল, ইংরেজের দৃষ্টিতে! এই তার ইন্ট্রোডাক্‌শান!

প্রেমের কবিতার বইখানির প্রথম পাতা খুলে নাকের সামনে মেলে ধরে তার হবু-স্বামীর!

পালাবার পথ খুঁজছে তখন ডেভিড! আমতা-আমতা করে বলে : কী আশ্চর্য! আমি পাসপোর্ট দেব না তা তো বলিনি! ইট'স্ জাস্ট এ ফর্মালিটি!

পাসপোর্ট পকেটে নিয়ে কোঁচা এবং ভুঁড়ি সামলিয়ে থপ্ থপ্ করতে করতে বেরিয়ে এলেন পি. এন টেগোর। লুইসিও বের হয়ে এল। রাজা-সাহেব গাড়ির পাদানিতে পা রেখে

ফরাসী ভাষায় বললেন : আপনাদের বিবাহিত জীবন মধুময় হোক।

মেয়েটি রুমাল নেড়ে বললে : বন ভয়েজ!

১২ই মে, ১৯১৫ :

সকাল দশটার মধ্যেই আহারাদি সেরে পি. এন. ঠাকুর তৈরী হয়ে নিলেন। সঙ্গে একটি মাত্র পোর্টম্যান্টো। তাতে জামাকাপড়, একখন্ড শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতা। প্রাচীরে বিলম্বিত বিবেকানন্দের ফটোর সামনে গিয়ে প্রণাম করলেন। গিরিজাবাবু আর শচীন নীরবে লক্ষ্য করেছিলেন। প্রস্তুতি পর্ব। কী মনে করে রাসবিহারী ফটোখানা পেড়ে নামালেন। ভরে নিলেন স্যুটকেসে। বিছানার তলা থেকে বের করে আনলেন দুটি 'মসার' পিস্তল। হাবু মিত্রের রডা আর্মস্ লুটের শেষ স্মৃতিচিহ্ন। চারটি ছিল—একটা গেছে পিংলের সঙ্গে, একটি রয়েছে ওঁর সাত অনুচরের যে কোন একজনের কাছে—তাঁর আদেশকে কার্যকারী করতে, বিনায়ক রাও কাপ্‌লের মৃত্যু মুখে করে। এ-দুটি এতদিন সঙ্গে ছিল। একটি দিলেন গিরিজাবাবুকে, একটি লাট্টুকে। ওঁরা দুজনেই আপত্তি করলেন। বলেন, আপনি কি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র.....

বাধা দিয়ে রাসবিহারী বলেন, পাগল। একেবারে নিরস্ত্র হতে আছে? কাল দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম। বুঝলে? মায়ের প্রসাদী ফুল নিয়ে এসেছি। একেবারে খালি হাতে অতদূর বিদেশ যাব কেন?

একটি রাঙাজবা বের করে দেখালেন বুক-পকেট থেকে।

আলিঙ্গন করলেন ওঁদের দুজনকে। রুদ্ধকণ্ঠে শচীন্দ্রনাথ বলেন, দাদা, আর যদি কখনও দেখা না হয়?

রাসবিহারী বলেন : দূর বোকা! আমি তো আবার ফিরে আসব। আর নেহাত যদি না আসি তাতেই বা কি! কত লোকই তো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরে না.....

তারপর হঠাৎ হেসে বলেন—সত্যিই যদি ফিরে না আসি, তাহলে ভারতের ছেলেমেয়েদের কী বলবি? আমার কথা?

—বলব, আপনি ছিলেন রাজদ্রোহী, বিপ্লবী মহানায়ক! বলব,—

—না! বলিস্ : আমি ছিলাম জন্মযোদ্ধা। I was a fighter–এই আমার সত্য পরিচয়।

—যোদ্ধা! শুধু যোদ্ধা? আর কিছু না?—অবাক হয়ে যান শচীন্দ্র।

—হ্যাঁ, শুধু যোদ্ধা। ব্রাউনিঙের Prospice পড়েছিস লাট্টু?

হঠাৎ খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কয়েক ছত্র আবৃত্তি করেন ঃ

"I was ever a fighter, so—one fight more
The best and the last!
I would hate that death bandaged my eyes,
and forebore,
And bade me creep past,
No! let me taste the whole of it, fare like my peers
The heroes of old,
Bear the brunt, in a minute pay glad life's arrears
Of pain, darkness and cold.

For sudden the worse turns the best to the brave,
The black minutes at end,
And the element's rage, the fiend-voices that rave,
Shall dwindle, shall blend,
Shall change, Shall become first a peace out of pain,
Then a light, then thy breast,
O thou Soul of my Soul! I shall clasp thee again,
And with God be the rest! *

* যোদ্ধা আমি আজীবন! রণক্লান্ত! ডাকিতেছে তবু
জীবনের শেষ শ্রেষ্ঠ রণ!
চক্ষুমুদি' কোন মতে নতজানু মাগিব না কভু
মরণের চরণ-শরণ।
নহে নহে। ডরিব না শহীদের পদচিহ্ন ধরি
মৃত্যু-পাত্র ওষ্ঠে তুলে নিতে,
জীবনের ঋণ যাব কড়াক্রান্তি মূল্যে শোধ করি
যন্ত্রণায়, অন্ধকারে, শীতে!
মঙ্গলের শঙ্খ বাজে মৃত্যুর অঙ্গনে, নিঃশঙ্কিতে
শেষ অঙ্কে জানায় সম্মান—
থামে ঝঞ্ঝা, দৈত্যকণ্ঠে হুঙ্কার থাকে আচম্বিতে
সর্বত্রাস হয় অবসান।
দুর্বার ঝটিকা অন্তে শান্তি নামে বেদনা-পাথারে
পড়ে আলো তোমার চরণে,
আত্মার আত্মীয় মোর! মৃত্যু তীর্থে শেষ নমস্কারে
লুটাইব অন্তিম-শরণে।।

শচীন্দ্রনাথের মনে হল—সামনে দাঁড়ানো অতিপরিচিত ঐ লোকটি ওর সম্পূর্ণ অপরিচিত। কোনদিন কোন সেন্টিমেন্টাল কথা ওঁর মুখে কখনও শোনেননি। উনি যে এতটা কবিতা মুখস্থ বলতে পারবেন তাও যেন ধারণা ছিল না শচীন্দ্রের।

গিরিজাবাবু বলেন, আমাদের ঠিকানাগুলো—

হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পান রাসবিহারী। হেসে বলেন, হ্যাঁ, কাল সারারাত সেগুলোই মুখস্থ করেছি। কোথায় কলকাতার ১৩৬/৩/১ গুরু ওস্তাগর লেন, আর কোথায় ২১১/৪-ক ঘশিয়াড়ি মন্ডি, মীনাবাজার, লক্ষ্ণৌ! পরীক্ষার পড়াও এমনভাবে মুখস্থ করিনি।

ঘোড়ার গাড়ি ডেকে আনা হল। উঠলেন ওঁরা তিনজন। স্ট্রাণ্ড রোড দিয়ে গাড়ি চলেছে। একদিকে গঙ্গা, একদিকে গড়ের মাঠ। রাজা-সাহেব নির্নিমেষ নেত্রে দেখছিলেন—ঐ গড়ের মাঠে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সৈনিকেরা কুচকাওয়াজ করছে। পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বেলুচ, নেপালী, রাজপুত, মারাঠী—না বাঙালী নেই।

খিদিরপুরের ছয়-নম্বর জেটির সামনে দাঁড়ালো গাড়িটা। গেটের বাইরে থেকে বিদায় নিলেন গিরিজাবাবু আর লাট্টু।

গিরিজাবাবু ধরা পড়েছিলেন মাত্র কয়েকমাস পরে। তিন বছর রক্ত আমাশয় ভুগে প্রায় বিনা চিকিৎসায় তিনি আগ্রা জেলে মারা যান। শচীন সান্যাল গ্রেপ্তার হল অনতিবিলম্বে। যাবজ্জীবন দীপান্তর হয়েছিল তাঁর।

দুজনে দাঁড়িয়ে রইলেন পুলিস-কর্ডনের বাইরে। টিকিট ও পাসপোর্ট দেখিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলেন পি. এন. ঠাকুর। দাঁড়িয়ে আছে জাপানী জাহাজ 'সানুকি-মারু'। দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট তাঁর। চলে গেলেন নির্দিষ্ট কামরায়। শুনলেন, জাহাজ ছাড়বে ভোরে। এখনও সাম্প্রতিক হুকুম অনুসারে স্পেশাল-পুলিশ নাকি জাহাজটি খানাতল্লাশী করেনি। তীক্ষ্ণধী রাসবিহারীর মনে হল—অভিজাত শ্রেণীর যাত্রী পি. এন.ঠাকুরকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে দেখলে সন্দেহ করবে পুলিস। গুণে দেখলেন রাহা-খরচ কত আছে। হ্যাঁ, হবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৮০টাকা, প্রথম শ্রেণীর ২১২ টাকা—কিন্তু আহার্য পাওয়া যাবে বিনামূল্যে। উনি তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন ক্যাপ্টেনের কাছে। আত্মপরিচয় দিলেন। রাজসরকারের কর্মচারীদের গালমন্দ করলেন এবং টিকিট বদলিয়ে প্রথম শ্রেণীর একটি টিকিট খরিদ করলেন। হলেন কপর্দকহীন।

প্রথম শ্রেণীতে ছিল তিনটি কেবিন—ছয়জন যাত্রীর স্থান। যাত্রী ছিলেন মাত্র চারজন। একটি কেবিনে দুইজন জাপানী, দ্বিতীয়টিতে একজন ইহুদি মহিলা—তৃতীয় কেবিনে একা রাসবিহারী। ডেক-এ শিখ ও পশ্চিমা যাত্রী। তারা চীন ও সিঙ্গাপুর যাচ্ছে।

ক্যাপ্টেন আর স্টুয়ার্ট-এর সঙ্গে আলাপ হল। ক্যাপ্টেন ওঁকে মদ্যপানে আমন্ত্রণ পর্যন্ত করল। সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন। একটু পরেই শুরু হল স্পেশাল-তল্লাশী। কে একজন হতচ্ছাড়া ডাকাত বুঝি ভারত ছেড়ে পালাতে চাইছে—তাই এই বিড়ম্বনা। ডেক-এর যাত্রীদের মালপত্র তছনছ করে দিল পুলিস। দ্বিতীয় শ্রেণীতেও হয়রানি হল যথেষ্ট। প্রথম শ্রেণীর কেবিনেও পুলিস এল। এক নম্বর, দুনম্বর কেবিন দেখে পুলিস ইন্সপেক্টর এসে নক্ করল দরজায়। দরজা খোলাই ছিল। ইজিচেয়ারে শুয়ে চুরুট মুখে খবরের কাগজ পড়ছিলেন ঠাকুর-সাহেব। শুয়ে শুয়েই বলেন, ইয়েস, কাম ইন।

দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন পুলিস ইন্সপেক্টর, জাহাজের ক্যাপ্টেন আর স্টুয়ার্ট। রাসবিহারী বলেন : ইয়া! হোয়াট্স্ আপ?

জাপানী স্টুয়ার্ট বিনয়ে বিগলিত হয়ে বললে, জাস্ত এ ফরম্যালিতি, রাজা। একজন ডাকাত এ জাহাজে করে পালাচ্ছে কিনা তাই এঁরা দেখতে এসেছেন।

মুক্তকচ্ছ স্থূলকায় রাজা-সাহেব উঠে দাঁড়ান : গুড্ হেভেন্স! ডাকাত! দেখুন, দেখুন, ভাল করে খুঁজে দেখুন। পার্টিকুলারলি আমার বাথরুমটা।

জাপানী ক্যাপ্টেন পরিচয় করিয়ে দেন : রাজা পি. এন. তেগোর। কাজিন অব দ্য নোবল-লরিয়েৎ পোয়েৎ দক্তর রবীন্দ্ররনাৎ!

ইন্সপেক্টর সসম্ভ্রমে নমস্কার করে মামুলীপ্রথায় পাসপোর্টখানা দেখতে চায়।

তল্লাশী শেষ হল! ছাড়পত্র পেল 'সানুকি-মারু'!

•

পরদিন শেষ রাত্রি। নোঙর তোলা হল জাহাজের। রাসবিহারী তখন রেলিঙে ভর দিয়ে 'ডেক'-এ দাঁড়িয়ে আছেন। মে মাস। ঝিরিঝিরি অকালবর্ষণ শুরু হয়েছে। যেন আকাশটা কাঁদছে। উত্তরদিকে তাকালেন একবার। না—দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরচূড়া দেখা গেল না।

ইঞ্জিন চালু হল। ভোঁ বাজল। তফাৎ যাও, তফাৎ যাও!

—বিদায়! শৃঙ্খলিতা মা-আমার। তোকে আমি কোনদিন ভুলব না। তোর বন্ধনমুক্তি না হলে আমারও যে মুক্তি নেই রে পাগলি! তোকে কি ভুলতে পারি?

মনে পড়ল, আম্বালা-জেলে এ সপ্তাহেই পর পর চারজনকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে ফাঁসির মঞ্চ থেকে। আমীরচাঁদ, অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ আর মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টা আগে ওঁর প্রাণের ভাই—হুঁকো-বরদার, বিশেকে! পাঞ্জাবের এক অখ্যাত গাঁয়ে প্রতিবাদে অনশন শুরু করেছে এক কুলিশকঠোর কোমলাঙ্গী!

হঠাৎ ঝুঁকে পড়লেন রেলিঙ ধরে। গঙ্গার ঘোলা জল ঢেউয়ে ঢেউয়ে আছাড় খেয়ে পড়ছে জাহাজের গায়ে। যেন আদর করছে তাকে। গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। অস্ফুটে ঐ গৈরিক-বসনা গঙ্গাকে সম্বোধন করে বললেন : কাঁদিস নে মা, কাঁদিস নে! আবার ফিরে আসব আমি। আশ্রয় নেব তোর কোলে! দেখে নিস্!

দু-হাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ ছেলেমানুষের মত ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলেন বজ্রকঠিন রাজ-বিদ্রোহী!

রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে পূর্বদিগন্তে এতক্ষণে সোনালী-সূর্যের আভাস ফুটে উঠতে শুরু করেছে।

—জবানবন্দী শেষ হল আমার!

কী বললেন? ঐ চিতাভস্ম স্বাধীন ভারতের গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়ার বিষয়ে আমার মতামত?

এত কথা তো আমিই বললাম। এবার আপনি কিছু বলুন! আপনি এবং আপনারা!

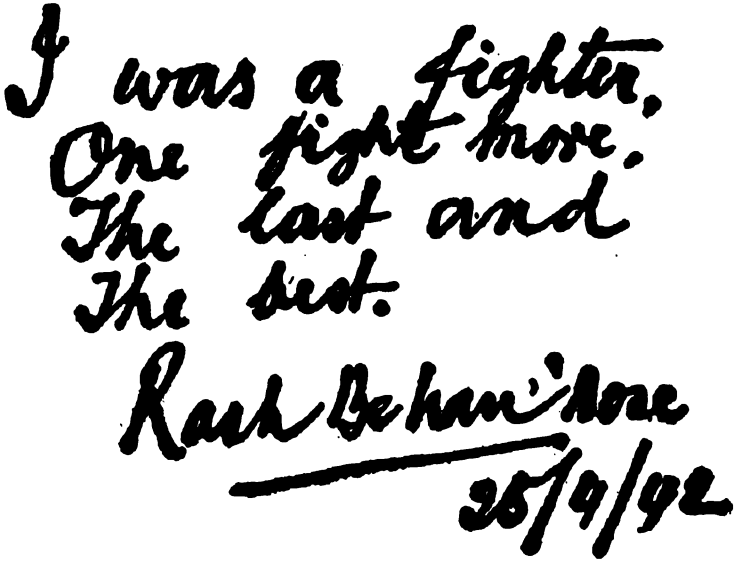

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জী

ক্রমিক সংখ্যা	গ্রন্থের নাম	লেখকের নাম (প্রকাশের তারিখ যেখানে পেয়েছি)
১।	Two Great Indian Revolutionaries	Uma Mukherjee('66)
২।	The Roll of Honour	K.C. Ghosh (Apr.'65)
৩।	Rashbehari Basu—His Struggle for India's Independence	Editted by R.Rath & S.P. Chatterjee (1962)
৪।	Sedition Committee Report	Justice Rowlatt (1918)
৫।	History of Freedom Movements in India.	Dr. R.C. Mazumdar
৬।	My Indian Years, 1910-1916	Lord Hardinge
৭।	Our Struggle & Rashbehari Bose	Motilal Roy
৮।	Revolutionaries of Bengal	H.K. Sarkar
৯।	India as I knew It	Sir Michael O'Dwyer, London (1925)
১০।	Savarkar & His Times	Dhananjoy Kher
১১।	Memoirs	M.N. Roy
১২।	The Two Great Indians in Japan	J.G. Ohsawa, (1954)
১৩।	Armed Struggle for Freedom	Kal Prakashan, ('58)
১৪।	Reminiscences	J.M. Chatterjee, ('47)
১৫।	The Gadhar & After (The HIndusthan Times)	Hanumant Sahai (18.8.1957)
১৬।	Swadhinata Sangram	V.D. Savarkar
১৭।	Mere Vichar	Bhai Parmanand
১৮।	Har Dayal & the Revol Movements of His time	Dharamvira.
১৯।	Those Who Know Him	Bhai Parmanand
২০।	The Story of My Life	Bhai Parmanand
২১।	Shri Aurobindo On Himself & On The Mother	Shri Aurobindo (1953)
২২।	Who's Who of Indian Martyrs (Vol-I)	Ministry of Edu., Govt. of India (1963)
২৩।	মহাবিপ্লবী রাসবিহারী	সুধীরকৃষ্ণ মিত্র
২৪।	বিপ্লবী রাসবিহারী	সত্যেন্দ্রনাথ বসু

২৫।	রাসবিহারী বসু	শান্তিকুমার মিত্র (১৯৬৮)
২৬।	কর্মবীর রাসবিহারী	বিজনবিহারী বসু (১৯৬৫)
২৭।	বিপ্লবী রাসবিহারী বসু	মণি বাগচি (১৯৬৬)
২৮।	বিপ্লবী রাসবিহারী বসু	নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়
২৯।	বন্দী জীবন (দুই খণ্ড)	শচীন্দ্রনাথ সান্যাল
৩০।	অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস	ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
৩১।	আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী	মতিলাল রায় (১৯৫৭)
৩২।	ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব	ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় (১৯৭০)
৩৩।	বাঙ্গলায় বিপ্লববাদ	নলিনীকিশোর গুহ
৩৪।	বাঙ্গলায় বিপ্লবপ্রচেষ্টা	হেমচন্দ্র কানুনগো
৩৫।	নির্বাসিতের আত্মকথা	উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৬।	রক্তবিপ্লবের এক অধ্যায়	নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়('৫৪)
৩৭।	সঙ্ঘগুরু মতিলাল	প্রবর্তক-সঙ্ঘ (১৯৬৬)
৩৮।	জীবনসঙ্গিনী	শ্রীমতিলাল রায় (১৯৬৮)
৩৯।	মৃত্যুঞ্জয়ী কানাইলাল	পূর্ণচন্দ্র দে (১৯৬২)
৪০।	বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল	মতিলাল রায় (১৯৬৭)
৪১।	বাঘা-যতীন	শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়
৪২।	পুরানো কথা, উপসংহার	চারুচন্দ্র দত্ত, আই. সি. এস.
৪৩।	বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি	ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়
৪৪।	ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস	অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৪৫।	রাসবিহারীর আত্মকথা (প্রবন্ধ) প্রবর্তক পত্রিকা-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১—অগ্রহায়ণ, ১৯৩১	রাসবিহারী বসু
৪৬।	বিপ্লবীর জীবনদর্শন (প্রবন্ধ) প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৬৮	প্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়